ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান প্রকাশিত
ব্যাঙাচি
সপ্তম সংখ্যা
নভেম্বর ২০২০ । কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭

জ্যোতির্বিজ্ঞান

সম্পাদকীয়

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

বাঁচতে হলে ভাবতে হবে

নভেম্বর ২০২০, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭
প্রথম বর্ষ • সংখ্যা ০৭

সম্পাদক
তানভীর রানা রাব্বি

সহ-সম্পাদক
টিম ব্যাঙাচি

ডিজাইন ও আইডিয়া
তানভীর রানা রাব্বি, সমুদ্র জিত সাহা

লেআউট
রিয়াদ

প্রচ্ছদ এঁকেছেঃ মেহরাব সাবিত সিদ্দিকী

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী, সমুদ্র জিত সাহা
তারিখ: ২/১/২১
টিম ব্যাঙাচি, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান কর্তৃক

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুনঃ
https://www.facebook.com/groups/bcb.science/
ইমেইল: info@bangachi.com
ওয়েব: https://bangachi.com
ফেইসবুক: https://facebook.com/bcb.bangachi
ব্যাঙাচি ডাউনলোড: https://download.bangachi.com

বহুকাল আগে, আমরা যখন পৃথিবীর পুরোটা জানতাম না, যখনই কোনো অজানা অচেনা জায়গার মুখোমুখি হতাম, ম্যাপে লিখে রাখতাম - এখানে ড্রাগনরা বাস করে। এখানে কি আসলেই ড্রাগন আছে? ভয়ঙ্কর কোনো দানব আছে? অজানা কোনো সোনার শহর আছে? আবে হায়াতের ঝর্ণা আছে? আমরা জানতাম না। কিন্তু তারপরও আমি নিশ্চিত 'এখানে ড্রাগন আছে' এই কথাটা যে-কোনো অভিযাত্রীর রক্তে আগুন ধরাতে যথেষ্ট।

পৃথিবীটা এখন আগের চেয়ে অনেক ছোটো হয়ে এসেছে, ম্যাপ থেকে সেদিনের সেই ড্রাগনেরা হারিয়ে গেছে। তার জায়গা নিয়েছে পরিচিত কোনো শহর, বন্দর, অথবা মরুভূমি বা বনভূমি। সেই ড্রাগনেরা এখন জায়গা নিয়েছে আকাশে।

রাতের আকাশে ঝলমল করে অযুত-নিযুত নক্ষত্র। আছে জোড়া তারার পরিবার, আছে অজানা রহস্যময় গ্রহ। কোথাও নিউট্রন তারা বনবন করে ঘুরে গামা রশ্মি ছড়াচ্ছে, কোথাও সুপারনোভার তীব্র বিস্ফোরণে ছারখার হচ্ছে জগৎ। কোথাও ঠান্ডা শীতল ব্ল্যাক হোলের তীব্র আকর্ষণে সময় থেমে আছে, ঘটনাদিগন্ত তার রহস্যময় দরজা মেলে দিয়ে ডাকছে–কে যাবি আয় আয়! কোথাও দলা পাকিয়ে আছে ডার্ক ম্যাটার, যার সত্যিকারের পরিচয় এই গ্রহের মানুষ এখনও জানে না। আর কোথাও অদ্ভুত কোনো নক্ষত্রের চারদিকে অদ্ভুত এক গ্রহে তোমার জন্য হয়তো সত্যিই ওত পেতে আছে কিম্ভুতকিমাকার ভিনগ্রহের প্রাণী। এইখানে, এই নিকষ কালো আকাশে, ওই নক্ষত্ররাজির বুকে আসলেই ড্রাগনেরা বাস করে। তাদের যদি জানতে চাও, পড়তে হবে ব্যাঙাচি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংখ্যা।

নাঈম হোসেন ফারুকী
প্রকাশক, ব্যাঙাচি

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা প্রতিমাসে দেশের প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক ফ্রি ই-ম্যাগাজিন আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারি।

সম্পাদক : তানভীর রানা রাব্বি
সহ-সম্পাদক : প্রজেশ দত্ত
সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক : সমুদ্র জিত সাহা

নির্বাচন ও তথ্য যাচাই :
তানভীর রানা রাব্বি
রওনক শাহরিয়ার

প্রুফরিডিং-এ যাঁরা ছিলেন :

মূল:
১। আবু রায়হান
২। রাকিন শাহরিয়ার
৩। এ আর মুবিন
৪। মুস্তফা কামাল জাবেদ
৫। রাহুল খান
৬। নাবিলা তাসনিম

সহযোগী যোদ্ধাগণ :
১। জাহিদুর রহমান
২। আফীফাহ্ হক মীম
৩। মুশফিকুর রহমান
৪। রাশেদা নাসরিন সুমনা
৫। রিজুফা জামান শোভা
৬। আদিন নুর
৭। নাফিউল ফেরদৌস অরণ্য
৮। রওনক শাহরিয়ার
৯। স্বপ্নীল জয়ধর
১০। সব্যসাচী দাশ নির্ঝর
১১। তাসনিম বিনতে সাইফ
১২। নিবেদিতা রায় নিতু
১৩। মুনতাসির রহমান তামিম
১৪। রাজীব সূত্রধর
১৫। ফারিয়া আরেফিন মালিহা
১৬। আজমল ফুয়াদ হামযাহ্
১৭। দিগন্ত ইসলাম
১৮। আশরাফুল ইসলাম

সূচিপত্র

মহাকাশের গান

লাবন্য তৃষ্ণা

পৃথিবীকে ঘিরে আছে
অসীম মহাকাশ;
সে আকাশে আঁকা যেন
বিস্ময় অবিনাশ।
মহাকাশের শুরু ও শেষ
পাওয়া নাকি দায়!
তার বুকেতে গ্রহ তারা
সাঁতরিয়ে বেড়ায়।

একেক তারার দূরত্বটা
কয়েক আলোকবর্ষ।
তাদের মাঝে আত্মীয়তা
ঘটায় অভিকর্ষ!
গ্রহ ভাসে নিয়মমাফিক
নির্ধারিত কক্ষে,
অবিরত ঘূর্ণি কেটে
চলে আপন অক্ষে।

যার কারণে বছর ঘুরে
পালটে ঋতুর সময়;
সূর্যালোকের আলো-ছায়ায়
দিবস-রাত্রি হয়।

প্রলয়কাণ্ড ঘটছে কারো
অগ্নিগোলক বক্ষে;
বরফ-চাদর মুড়ি দিয়ে
কেউ পেয়েছে রক্ষে।

কারো আবার ঠনঠনে কোল,
ভরা খানাখন্দে;
রাতের বেলা খালি চোখে
নাচে নানান ছন্দে।
দেখতে তারা স্নিগ্ধ হলেও
আদতে তা নয়!
নানান রকম বিস্ফোরণে
মত্ত হয়ে রয়।

আলো টেনে নিজের মুখে
গিলছে যে ব্ল্যাকহোল।
অশেষ আলো সাবাড় করেও
ভরছে না তার কোল!
পৃথিবীটাই নয় তো শুধু
বিপুল পানির আধার;
মহাকাশেও মিলতে পারে
সাগর-নদীর দিদার!

সকল পানিই নয় তো একই
ব্যবহারের যোগ্য;
দেখতে খাবার হলেই কি আর
সবকিছু হয় ভোগ্য!

ধূমকেতুর গল্প

সাইমুম ইসলাম হাসিব

আমি আমার প্রিয়কে খুঁজছি আকাশে,
সেখানে কেন তুমি নেই?
মানুষের পেখমের শামিয়ানা
মাছরাঙার নীল পতাকা
নবম স্বর্গ থেকে নেমে এসো,
শান্ত করো ধূমকেতুকে।

ধূমকেতু নামটি শুনলেই সবার প্রথমে আমাদের মনে আসে হ্যালির ধূমকেতুর কথা। ধূমকেতু, যার ইংরেজি নাম Comet, শব্দটি এসেছে গ্রিকদের কাছ থেকে যার অর্থ চুলের জন্য। জায়ারেৎসাই নামক জাতির লোকেরা একে চুলতারাও বলে।

প্রাচীনকালে ধূমকেতু নিয়ে মানুষের মনে সবসময় একটা অজানা আতঙ্ক কাজ করত। প্রাচীন বিজ্ঞানী লি চুয়ান কেং (৬০২-৬৬৭ খ্রি.পূ.) ধূমকেতু সম্পর্কে বলেন, "ধূমকেতু একটি দুষ্ট নক্ষত্র। দক্ষিণ দিক থেকে যেসব ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে তাদের কারণে পুরাতনদের পতন এবং নতুনদের উত্থান ঘটবে, তিমি মাছ মরতেই থাকবে। উত্তর দিক থেকে যেসব ধূমকেতু আসে তাদের কারণে রাজ্যের পরিবর্তন ঘটবে, বিদ্রোহ দেখা দেবে, যুদ্ধ চলবে। এটি বাটির আকার ধারণ করলে সোনা এবং রত্ন হয়ে যাবে মূল্যহীন।" বোঝা-ই যাচ্ছে প্রাচীন যুগের মানুষেরা ধূমকেতু নিয়ে কেমন ধারণা পোষণ করত।

ধূমকেতুর মূল বা প্রাথমিক কাঠামো হচ্ছে এর মাথাটা যা কিনা বরফের তৈরি। একে বলা হয় নিউক্লিয়াস। এদের প্রলম্বিত অংশ বা ধূলি-লেজে যেসব অতিক্ষুদ্র উপাদান থাকে

সেগুলো হচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা উপাদান। চার্জযুক্ত পরমাণুর এই লেজটি সৃষ্টি হয় যখন সূর্যের আলো অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং নিউক্লিয়াসের গ্যাসীয় বস্তুগুলোর বাষ্পীভবন ঘটে। ধূমকেতুতে প্রায় ২৩ প্রকারের মৌল ও যৌগ রয়েছে। তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে কার্বন অথবা জৈব যৌগ এবং হাইড্রক্সিল পরমাণু (OH)।

ধূমকেতুর জন্মটাও খুব রহস্যজনক। সূর্যের প্রায় বিশ হাজার থেকে এক লক্ষ

অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরে ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগেকার সৌরজগৎ সৃষ্টির সময় ধূলি, গ্যাস, ইত্যাদি ধ্বংসাবশেষ সমবেত হয়ে দুই স্তর বিশিষ্ট বিশাল মেঘের সৃষ্টি করেছে। এই বিশাল ধূমকেতুময় মেঘের নাম ওর্ট (Oort) মেঘ। ডাচ জ্যোতির্বিদ জ্যান ওর্ট-এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই ওর্ট মেঘের অঞ্চলই সৌরজগতের শেষ সীমানা। এখানে বরফপিণ্ডের মতো অনেক বস্তু গোলাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। কুইপার বেল্টে বৃহস্পতির মতো বড়ো কোনো গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে বা ওর্ট মেঘের নিকটবর্তী কোনো নক্ষত্রের প্রভাবে কোনো বস্তু উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের দিকে এলে তবেই নতুন ধূমকেতুর জন্ম হবে।

ধূমকেতুর কি মৃত্যু হয়? হ্যাঁ। ধূমকেতুর মৃত্যু হয়। মহাজাগতিক রশ্মির ফলে ওর্ট মেঘের অনুকূল পরিবেশে ধূমকেতুগুলো ক্রমাগত বিস্ফোরিত হতে থাকে, এর ফলে উচ্চগতির সংঘর্ষ হয় এবং ধূমকেতুর ক্ষয়সাধন হয়। ধূমকেতুর আয়ু প্রায় ১০,০০০ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে ধূমকেতুগুলোর মাত্র ১০% ৫০ বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পারে এবং মাত্র ১% প্রায় ২,০০০ বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পারে। এরপর ভেতরের উদ্বায়ী পদার্থ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। এছাড়াও সূর্যের অথবা বিভিন্ন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ধূমকেতু সেই গ্রহে আছড়ে পড়ে এবং আত্মাহুতি দেয়।

ধূমকেতু নিয়ে যেসব বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন— ডেমোক্রিটাস, অ্যারিস্টটল, সেনেকা, অ্যাপোলোনিয়াস, টাইকো ব্রাহে, প্যারালাক্স এবং জোহানস কেপলার। তবে যাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে ধূমকেতুবিদ্যা আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠেছিল, অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে রহস্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিল তিনি হলেন অ্যাডমন্ড হ্যালি। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আলাদা ঝোঁক ছিল। বাবা এডমন্ড তাঁর আগ্রহের কারণেই বেশ কিছু যন্ত্রপাতি কিনে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল একটি টেলিস্কোপ।

তিনিই প্রথম জানালেন যে ধূমকেতুরও একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ আছে। আর এটির প্রাণকেন্দ্র থাকে এই পথের ওপরেই। হ্যালি গ্রহের কক্ষপথের নানারকম হিসাব করার জন্য কৌণিক ছেদন নামে একটি নির্ভুল পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আকাশের মানচিত্র তৈরির জন্য দাপিয়ে বেড়িয়েছেন পশ্চিম আফ্রিকার সেইন্ট হেলেনায়। ধূমকেতুর কক্ষপথ নিয়ে তাঁর আগে কোনো বিজ্ঞানীই তেমন একটা মাথা ঘামাননি। হ্যালি সেই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন এবং ধূমকেতুর যাত্রাপথের নকশা বানান। হ্যালি ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালে আসা তিনটি ধূমকেতু নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন এবং আশ্চর্য হয়ে দেখেন যে তিনটি ধূমকেতুর মধ্যে অসম্ভব মিল। তিনটি ধূমকেতু আসলে একই ধূমকেতু। পরে ধূমকেতুর কক্ষপথে রাশিচক্রের তলের ছেদবিন্দু দেখে তিনি এটা বুঝতে পারেন, যাকে কেতু বলে। সবকিছুই তিনটির ক্ষেত্রে মিলে গেল। কিন্তু গন্ডগোল বাঁধল এর আবির্ভাব হওয়ার সময় নিয়ে। ১৫৩১ থেকে ১৬০৭ সময় হচ্ছে ৭৬ বছর, আবার ১৬০৭ থেকে ১৬৮২ হচ্ছে ৭৫ বছর। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? এর জন্য তাঁকে ব্যাখ্যা দিলেন স্যার আইজ্যাক নিউটন। নিউটন বললেন এরকম হচ্ছে কোনো গ্রহ বা ধূমকেতুর আকর্ষণ বলের প্রভাবে। যার ফলে ধূমকেতু তার পরিক্রমন পর্যায়ের এক সময় এক দিক থেকে কোনো বলের প্রভাবে পড়ে যাচ্ছে আবার ঠিক পরবর্তী সময়ে অন্যদিকের প্রভাব অনুভব করছে। এতে করে গতির পরিবর্তন হচ্ছে এবং আবির্ভাবের সময়ের হেরফের ঘটছে।

আবিষ্কৃত হয়ে গেল বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু। এই ধূমকেতু সর্বশেষ দেখা গিয়েছে ১৯৮৬ সালে। একে আবার দেখা যাবে ২০৬২ সালের জুলাই মাসের কোনো এক দিনে। সেদিন আবার স্রষ্টার শনি তার পুচ্ছে আগুন ধরিয়ে নেমে আসবে নরকের দরজা হতে এবং অহংকার করে বলবে, "পুচ্ছে আমার কোটি নাগ-শিশু উদ্গারে বিষ-ফুৎকার।"

দেখতে পারব কি? ভাগ্য কি সহায় হবে?

২০৬২ সালে মঙ্গল গ্রহে দাঁড়িয়ে আছে দুই জন মানুষ, হ্যালির ধূমকেতু দেখছে। দূরের সাদাটে বিন্দুটি আসলে মাটির পৃথিবী।

কলাম্বিয়া স্পেইস শাটল বিপর্যয়

অন্তু দাস

সেদিন কী হয়েছিল কল্পনা চাওলাদের সাথে?

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০৩ সালে। ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ নাসার নভোখেয়াযান বা স্পেইস শাটল কলাম্বিয়া ফিরছে পৃথিবীতে। আত্মীয়-স্বজন সবাই জড়ো হয়েছেন নভোচারীদের স্বাগত জানাতে। কিন্তু এখান থেকেই সে দুঃসংবাদটি পেতে হয় তাঁদের। নভোখেয়াযানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পরই বিস্ফোরিত হয়েছে। সাতজন নভোচারীর সবাই মারা গেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন একজন ভারতীয় নভোচারী কল্পনা চাওলা, যার আজন্ম সাধ ছিল মহাকাশে যাওয়ার। তিনি নাকি তাঁর বন্ধুদের বলতেন মহাকাশে গিয়ে যদি তাঁর মৃত্যুও হয় তাতে তাঁর দুঃখ থাকবে না।

সাতজন ক্রু ছিলেন এ মিশনে।

রিক হাসব্যান্ড, কমান্ডার

মাইকেল অ্যান্ডারসন, পেলোড কমান্ডার

ডেভিড ব্রাউন, মিশন স্পেশালিস্ট

কল্পনা চাওলা, মিশন স্পেশালিস্ট

লরেল ক্লার্ক, মিশন স্পেশালিস্ট

উইলিয়াম ম্যাককুল, পাইলট

আইলান র‍্যামন, পেলোড স্পেশালিস্ট কল্পনা চাওলা

ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম মহিলা নভোচারী হচ্ছেন কল্পনা চাওলা। ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের কারনালে বসবাস করতেন কল্পনার বাবা-মা। ১৯৬১ সালের ১লা জুলাই সেখানেই জন্ম হয় কল্পনার। মোট দুটি মহাকাশ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোটো। পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশোনা শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান। মাস্টার্স ডিগ্রি নেন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৮৮ সালে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যারোস্পেইস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। একই বছর পাওয়ার লিফট কম্পিউটেশনাল ফ্লুয়িড ডাইনামিকস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন নাসায়।

নভোচারী হিসেবে মহাকাশে যাওয়ার প্রথম সুযোগটি আসে ১৯৯৭ সালে। কলাম্বিয়া নভোখেয়াযানে চেপে STS-87 মিশনে অংশ নেন। দুই সপ্তাহে ২৫২ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন তাঁরা।

স্পেইস শাটল :

পূর্বে মহাকাশ অভিযানে ব্যবহৃত যানগুলো একবারের বেশি ব্যবহার করা যেত না। অভিযান শেষে একটি ক্যাপসুল এসে পড়ত সমুদ্রে। সেখান থেকেই নভোচারীদের উদ্ধার করা হতো। কিন্তু নাসা যে স্পেইস শাটল প্রযুক্তি নিয়ে আসে তা বার বার ব্যবহার করা যায়। রকেটের মতো ছুড়ে দিলেও বিমানের মতোই রানওয়েতে নেমে আসতে পারে এগুলো।

মহাকাশযানের বিপদ :

মহাকাশযানে পেট্রোল, ডিজেলের মতো জ্বালানি ব্যবহার করা যায় না। এখানে ব্যবহার করতে হয় তরল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। অনেকে বলেন এটা অনেকটা একটা পারমাণবিক বোমার ওপর বসে থাকার মতো।

আবার এসব জ্বালানি ট্যাংক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে এর ওপর বরফ জমে যায়। এসব ঝামেলা এড়াতে বিশেষ ধরনের তাপরোধী

ফোম ব্যবহার করতে হয়।

আবার মহাকাশযান যখন প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ুর সাথে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও চাই হিট শিল্ড।

কলাম্বিয়া মিশন :

কলাম্বিয়া শাটলের যে মিশনটি বিপর্যয় ডেকে এনেছিল সেটির নাম ছিল STS-107। ২০০৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি পৃথিবী থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় কলাম্বিয়া। তাঁদের এ অভিযানের নাম ছিল STS-107। মূলত আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের কাজ এগিয়ে নিতেই শাটল কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল নাসা। তবে STS-107 অভিযানটির মূল উদ্দেশ্য ছিল কিছু মৌলিক গবেষণা চালানো।

সবাই মিলে পালাক্রমে কাজ করে বিরতিহীনভাবে প্রায় ৮০টি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল জীবন সংক্রান্ত বিজ্ঞান, প্রবাহী পদার্থবিজ্ঞান এবং বস্তুবিজ্ঞানের নানান পরীক্ষা।

গোলমালটা উৎক্ষেপণের সময় থেকেই!

নভোযানটি উৎক্ষেপণের সময়ই হিট-শিল্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনাটি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। ঘটনাটি ঘটে নভোযান উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ৮২ সেকেন্ডের মাথায়। ইনস্যুলেটর ফোম আঘাত করে কলাম্বিয়ার বাম পাশের ডানায়। নভোযানটি মহাকাশে থাকাকালীন ১৬ দিনে এ নিয়ে আরও অনুসন্ধান চালায় নাসা। শোনা যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ মহাকাশে থাকা গোয়েন্দা ক্যামেরা ব্যবহার করে আরও ভালো ছবি তোলার মাধ্যমে নাসাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু নাসার কর্মকর্তারা সে অনুরোধ উপেক্ষা করে।

বিপর্যয় সকাল ৯টায়!

১লা ফেব্রুয়ারি স্বাভাবিকভাবেই কেনেডি স্পেইস সেন্টারে অবতরণের উদ্যোগ নেয় নভোখেয়াযান কলাম্বিয়া। স্থানীয় সময় সকাল ৯টার কাছাকাছি। এসময় মিশন কন্ট্রোল অস্বাভাবিক তথ্য পেতে শুরু করে। কলাম্বিয়ার বাম পাশের ডানা থেকে তাপমাত্রার রিডিং পাওয়া যাচ্ছিল না। বাম পাশের টায়ার থেকে চাপের রিডিংও পাওয়া যাচ্ছিল না। এ-সময় কলাম্বিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হয়। ৮:৫৯:৩২ মিনিটে কমান্ডার রিক হাজব্যান্ড কথা বলছেন এমন সময়ই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এসময় ডালাসের কাছাকাছি ছিল কলাম্বিয়া। শব্দের ১৮ গুণ বেগে চলছিল সেটি। ভূমি থেকে প্রায় ৬১,১৭০ মিটার ওপরে ছিল তখন। আরও কয়েকবার কলাম্বিয়ার সাথে যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। অথচ আর ১২ মিনিট পরেই এটির রানওয়েতে অবতরণের কথা ছিল। কিন্তু ১২ মিনিটের মাথায় মিশন কন্ট্রোলে একটি ফোন আসে। স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেল নভোখেয়াযান বা

শাটলটির ভেঙে পড়ার ভিডিয়ো সম্প্রচার করছে। দিনের আরও পরের দিকে নাসা বিষয়টি নিশ্চিত করে।

পূর্ব টেক্সাসের প্রায় পাঁচ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক সপ্তাহের অনুসন্ধান শেষে কলাম্বিয়ার প্রায় ৮৪,০০০ টুকরা বা ভগ্নাংশ উদ্ধার করে নাসা, যা ছিল কলাম্বিয়ার প্রায় ৪০%। এসবের মধ্যে নভোচারীদের দেহাবশেষও ছিল। পরে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

২০০৮ সালে এসে নাসা কলাম্বিয়া বিপর্যয়ের বিস্তারিত বিশেষ করে শেষ পাঁচ মিনিটের বিস্তারিত প্রকাশ করে। বলা হয় নভোচারীরা সম্ভবত কলাম্বিয়া ভেঙে পড়ার পরও বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন চাপ কমে গিয়ে তাঁদের কেবিনটি ভেঙে যায় তখনই তাঁরা মারা যান।

এ বিপর্যয়ের পর নাসার নভোখেয়াযান ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন তৈরি হয়। দুই বছরেরও বেশি সময় নাসার কোনো নভোখেয়াযান বা শাটল মহাকাশে যায়নি। মহাকাশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ চালু রাখতে রুশ মহাকাশযানের সাহায্য নেয় নাসা।

বিপর্যয়ের কারণ :

তদন্ত শেষে বলা হয় সমস্যাটা হিট শিল্ডে। নভোখেয়াযানটি উৎক্ষেপণের সময়ই হিট শিল্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় প্রচণ্ড উত্তাপ সামলাতে পারেনি কলাম্বিয়া। এ সমস্যাটি নাকি আগে থেকেই জানা ছিল নাসার। কিন্তু কেন নাসা কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে চুপচাপ বসে ছিল তা নিয়ে গণমাধ্যমে হৈ-চৈ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসেও এ নিয়ে বিতর্ক হয়।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় টেক্সাস এবং লুইজিয়ানার আকাশে এটি ভেঙে পড়েছিল। নভোখেয়াযানকে উচ্চ তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করতে বিশেষ ধরনের ফোম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উৎক্ষেপণের সময়ই এই ফোমের কিছুটা খসে গিয়ে বাম পাশের ডানায় আঘাত করে।

এটি যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন গরম বাতাস ডানাটির ভাঙা অংশ দিয়ে প্রবেশ করে এর কাঠামোটি নষ্ট করে দেয়। এক পর্যায়ে নভোযানটিই ভেঙে পড়ে।

ছবিতে: স্পেইস শাটল কলাম্বিয়ার নভোচারীরা যাত্রার শুরুতে।

এক্সোপ্ল্যানেট

নাঈম হোসেন ফারুকী

সৌরজগতের বাইরের প্ল্যানেটগুলোকে বলে এক্সোপ্ল্যানেট। পরপর কয়েকটা সিরিয়াস টাইপের লেখা লিখে মাথা ঝিমঝিম করছে। একটু ফ্রেশ হওয়ার জন্য আপনাদের ঘুরিয়ে আনব এক্সোপ্ল্যানেটগুলো থেকে।

ধরুন, আপনি প্রেত-সাধক। শয়তানের পূজারি। ভ্যাম্পায়ার উপাসক। গোরস্থান, শ্মশান ইত্যাদি আপনাকে চুম্বকের মতো টানে।

সেক্ষেত্রে আপনার জন্য আইডিয়াল প্ল্যানেট হবে ট্রেস 2B। কুচকুচে কালো প্ল্যানেট, কয়লার চেয়েও বেশি কালো, আপনার কাল্টের লোকজনের গোপন মিটিং এর জন্য অস্থির জায়গা। শুধু একটু গরম সহ্য করার অভ্যাস থাকতে হবে, গ্রহটা লাভার চেয়েও বেশি গরম তো তাই।

মেয়েদের জন্য খুব প্রিয় একটা জায়গা হতে পারে Gj 504B। খটমটে একটা নাম হলেও এই প্ল্যানেটটা কিন্তু সেই কিউট, একেবারে পিঙ্ক কালারের। পিঙ্ক, চেরি ব্লসম, ম্যাজেন্টা, আরও কী কী হাজারটা রং যেগুলো মেয়েরা দেখতে পায় কিন্তু ছেলেদের চোখে পড়ে না, সব পাবেন এখানে। ল্যান্ড করা একটু কষ্ট হবে অবশ্য, প্ল্যানেটটা গ্যাসের তৈরি কিনা!

আপনি কি বিজনেস মেন্টালিটির মানুষ? টাকা ছাড়া কিচ্ছু বোঝেন না? কোয়াড্রিলিওন ডলারের কোম্পানি খুলতে চান? আপনাকে যেতে হবে ৫৫ ক্যান্ক্রিতে (আর একটু সহজ নাম দেওয়া যায় না?)

Kepler – 16b

এটা ডায়মন্ড প্ল্যানেট। ডায়মন্ড, নীলা, আর যত মণিমুক্তো দরকার, সব পাবেন এখানে। আবার গরম সহ্য করারও ক্ষমতা থাকতে হবে। বেশি নয়, মাত্র ৪,০০০ ডিগ্রির মতো। আসলে গরম সহ্য না করতে পারলে ইউনিভার্সের কোথাও খুব একটা টিকতে

পারবেন না।

টাকা-পয়সাওয়ালা লোকদের শত্রু-টত্রু থাকে। শত্রুর বংশ রাখতে নেই। ক্যান্সিতে ডায়মন্ডের খোঁজে যাওয়ার আগে আপনার শত্রুটাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আমাদের ভিনাসে পাঠিয়ে দিন। প্রেমের দেবীর দেখা পাওয়া যাবে, খুবই রোমান্টিক পরিবেশ, এইসব বলে ভালো মতো বুঝ দিতে পারলেই দেখবেন সে সুড়সুড় করে রাজি হয়ে যাবে। একবার ভিনাসে নিয়ে ফেলতে পারলেই হলো। সেখানকার ৪৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তাকে ফ্রাই করবে, সালফিউরিক অ্যাসিডের বৃষ্টি তাকে ঝাঁঝরা করবে। তাতেও না মরলে ওপরের বায়ুমণ্ডল তাকে চাপে চাপে চ্যাপটা করে ফেলবে। শত্রু শেষ! হাতে আছে প্রচুর ডায়মন্ড, কোয়াড্রিলিওন ডলারের কোম্পানি একবার দাঁড় করাতে পারলে গার্লফ্রেন্ডের কোনো অভাব হবে না। তারপর কেপলার ১৬B তে গার্লফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে গিয়ে জোড়া সূর্যের মোহনীয় সূর্যাস্ত দেখতে পারেন। জায়গাটা কিন্তু খুব ঠান্ডা, প্রচুর পিকনিক ব্ল্যাঙ্কেট সাথে রাখতে হবে।
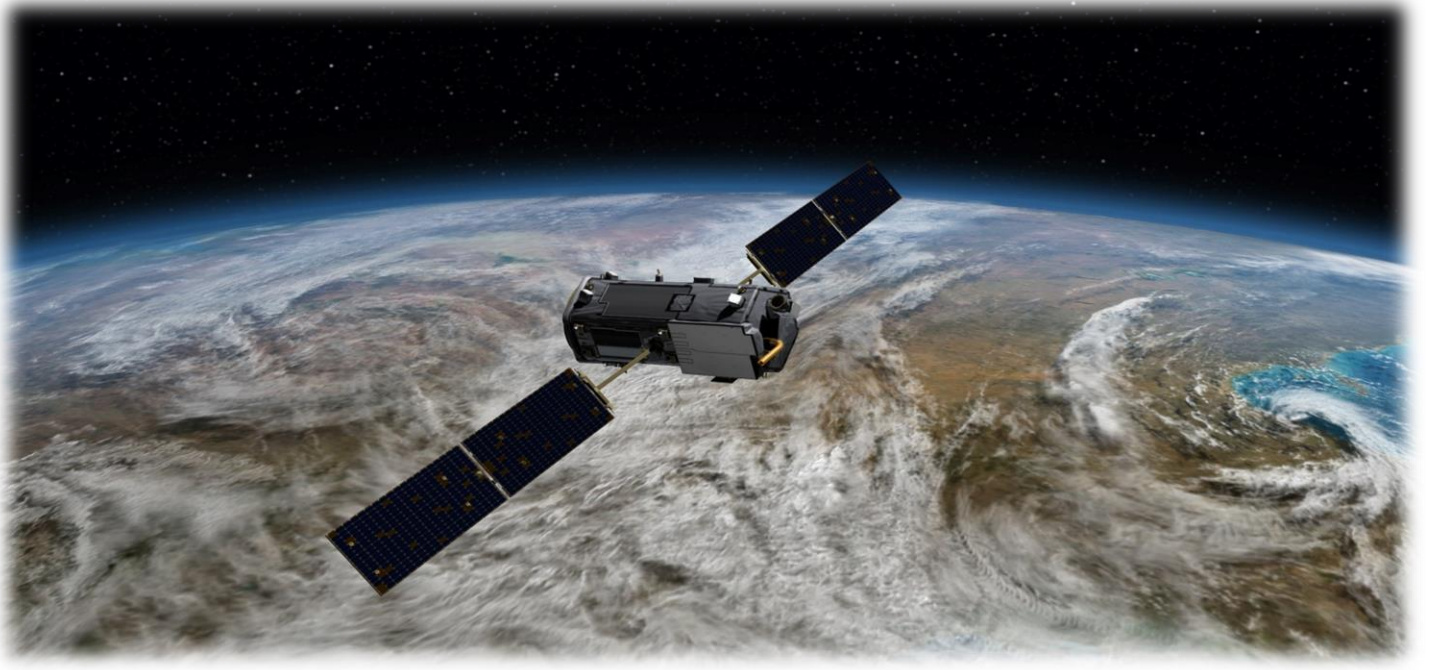
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

জাভেদ ইকবাল

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপনের সাথে জড়িত সবাইকে, বিশেষ করে বুয়েটিয়ানদের অভিনন্দন। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট নিয়ে ভাবছে জানার পরে ২০১০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আমি এটা নিয়ে সরকারের সাথে কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বিভিন্ন কারণে সফল হতে পারিনি। সায়েন্স ফিকশন এবং আর্থার সি ক্লার্কের (কেন, পরে বলছি) বিশাল ভক্ত হিসাবে আগেই স্যাটেলাইট নিয়ে পড়াশোনা ছিল এবং এই কাজের জন্য একটা ফ্রেঞ্চ কনসাল্টিং কোম্পানির সাথে কিছু কাজ করেছিলাম। তখন জানা/শেখা কিছু তথ্য শেয়ার করছি

এই লাইনের কেউ স্যাটেলাইট শব্দটা ব্যবহার করতে চায় না। সবাই বলে, 'স্পেইসক্রাফট' অথবা 'বার্ড'। এটা ছিল প্রথম শিক্ষা, যদিও আমি এটাতে অভ্যস্ত হতে পারিনি।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট একটু আগে উড়ে গেল। এটা একটা জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট। যদি জিওস্টেশনারি না হয়, তাহলে সেই স্যাটেলাইট থেকে হয় সারাদিন কাভারেজ পাওয়া যাবে না অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড স্টেশনের অ্যান্টেনা স্যাটেলাইটের সাথে সাথে ঘুরতে বা নড়তে হবে, যাতে খরচ বেড়ে যায়।

সব স্যাটেলাইট জিওস্টেশনারি হতে পারে না, দরকারও নেই। কিন্তু যেসব স্যাটেলাইট জিওস্টেশনারি, তাদের দুইটা বৈশিষ্ট্য থাকে:

১. তারা বিষুবরেখার ঠিক ওপরে অবস্থান করে। (এক ডিগ্রি কম/বেশি হতে পারে)

২. পৃথিবী যেমন নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে, এই স্যাটেলাইটগুলোও পৃথিবীর অক্ষকে কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে।

এই দুই শর্তের ফলাফল—পৃথিবীর ঘোরার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এই স্যাটেলাইটগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠের একটা নির্দিষ্ট এলাকার ওপর থেকে যায়। অর্থাৎ, জিও (পৃথিবী বা ভূ) স্টেশনারি (স্থির) হয়ে যায়। আসলে স্থির নয়; বন্দুকের গুলির চাইতেও দ্রুত চলছে তবে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে স্থির)

বিষুবরেখার ওপরে মানে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বিষুবরেখা বরাবর অসংখ্য লাইন টেনে যদি আকাশে বাড়ানো হয়, জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটগুলি সেই লাইনের ওপরে থাকবে। কিন্তু এই দূরত্ব অসীম নয়; নিউটন আর কেপলারের কয়েকশ বছর আগে আবিষ্কার করা সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি, জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৫,৮৫৭ কিলোমিটার দূরে থাকবে। এটাকে জিওস্টেশনারি অরবিট (বাংলা করলে হয় ভূস্থির কক্ষপথ) বলা হয়। এটাকে সায়েন্স ফিকশন লেখক আর্থার সি ক্লার্কের নামে ক্লার্ক অরবিটও বলা হয়, কারণ ক্লার্ক প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইটের এই ধারণা দিয়েছিলেন।

যে-কোনো স্থায়ী কক্ষপথের একটা আজব গুণ আছে—এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে মহাকর্ষ আর ঘূর্ণনের গতিতে কাটাকাটি হয়ে যায় বলে সেই কক্ষপথের যাত্রী (সেটা আমাদের পৃথিবী বা চাঁদ, যেটাই হোক না কেন) একইভাবে ঘুরতে থাকে। স্যাটেলাইটগুলিও একইভাবে ভূস্থির কক্ষপথেও ঘুরতে থাকে। কিন্তু কীভাবে সেটা পৃথিবীর সাথে তাল রাখে? (আসলে এত সূক্ষ্মভাবে গতি রাখা অসম্ভব; তাই স্যাটেলাইটে গ্যাস থাকে যা উচ্চচাপে বের করে দিয়ে রকেটের মতো অবস্থান ঠিক করে নেয় মাঝে মাঝে।)

যাদের একটু অঙ্ক এবং ফিজিক্স নিয়ে উৎসাহ আছে, তাদের জন্য কীভাবে স্যাটেলাইট পৃথিবীর সাথে তাল রাখে আর কীভাবে পড়ে যায় না বা মহাকাশে উড়ে যায় না, সেটার গাণিতিক ব্যাখ্যা মূল লেখার সবশেষে দিয়েছি। এখানে সেই দুইটা ব্যাপার অঙ্ক ছাড়া বোঝানোর চেষ্টা করি।

কেন এটি স্থির?

ধরুন, আপনি ছয় ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত আঁকলেন আর একই কেন্দ্র ধরে ৪২ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের আরেকটা বৃত্ত আঁকলেন। আপনার আঁকার গতি যদি একই থাকে, তাহলে বড়ো বৃত্তটা আঁকতে বেশি সময় লাগবে, তাই না? কিন্তু যদি বড়ো বৃত্তটা আঁকার গতি বাড়িয়ে দেন, তাহলে কোনো একটা গতিতে চললে দেখা যাবে, দুইটা বৃত্ত একই সময়ে শুরু এবং শেষ করা যাচ্ছে অর্থাৎ, ছোটো বৃত্তের পেন্সিল আর বড়ো বৃত্তের পেন্সিল একই তালে চলছে। একইভাবে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট পৃথিবীর চেয়ে দ্রুত চলে বলে মনে হয় এটি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

কেন এটি উড়ে চলে যাচ্ছে না বা পড়ে যাচ্ছে না?

প্লেন বা রকেট আকাশে উড়তে পারে জ্বালানি খরচ করে।

কিন্তু স্যাটেলাইট কীভাবে ভেসে থাকে, ইঞ্জিন না চালিয়েই? রকেটে করে প্রথমে স্যাটেলাইটটাকে সোজা ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর রকেটটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘণ্টায় প্রায় ১১,০০০ কি.মি. গতিতে চলতে শুরু করে এবং একসময় স্যাটেলাইটটাকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেওয়া স্যাটেলাইটটাও গতিজড়তার কারণে একই গতিতে চলতে থাকে। এই গতির জন্য, যদিও স্যাটেলাইট পৃথিবীর আকর্ষণে নিচের দিকে নেমে আসে কিন্তু এই নেমে আসার পরিমাণ কক্ষপথের বক্রতার সমান। তাই পৃথিবী থেকে দূরত্ব সমান থেকে যায়। যদি এই গতি কম হতো, তাহলে এক সময় পড়ে যেত, আর যদি বেশি হতো তাহলে উপবৃত্তাকার (elliptical) হয়ে যেত। এটা বুঝতে একটু অসুবিধা হয়, তাই একটা উপমা দিই। ধরুন, ঢাকার রাস্তায় জলাবদ্ধতার জন্য পানি জমে আছে। আপনি একটা ব্যাগ নিয়ে হাঁটছেন। ব্যাগটা পানি থেকে ৩৮ ইঞ্চি ওপরে। হাঁটতে হাঁটতে পানি গভীর হলো। আপনি ব্যাগটা আরেকটু ওপরে তুললেন, যাতে ব্যাগটা পানি থেকে সেই ৩৮ ইঞ্চি ওপরেই থাকে। একইভাবে স্যাটেলাইটটাও সমান উচ্চতা বজায় রাখতে পারে।

তাহলে প্রায় ৪২,০০০ কি.মি. ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি প্রায় ২,৬৪,০০০ কিলোমিটার ($2\pi r$)। এক কিলোমিটার দূরে দূরে রাখলেও ২,৬৪,০০০ স্যাটেলাইটের জায়গা আছে, তাই না? কাগজে কলমে তাই, কিন্তু বাস্তবে নয়।

এখানে গরিব দেশগুলির জন্য একটা ঝামেলা হয়েছে। সেই ঝামেলা কী সেটা বলার আগে ফুটপ্রিন্ট কী জেনে নিই। দূর থেকে টর্চের আলো যেমন একটা আলোকিত বৃত্ত তৈরি করে, তেমনি স্যাটেলাইটের রেডিয়ো সিগন্যাল শুধুমাত্র একটা এলাকা থেকে পাওয়া যায়। সেই এলাকাটাকে সেই স্যাটেলাইটের ফুটপ্রিন্ট বা পদচিহ্ন বলা হয়ে থাকে। রাতের আকাশে যেমন সূর্য পৃথিবীর আড়ালে পড়ে যায়, তেমনি আমেরিকার আকাশে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট বাংলাদেশের জন্য পৃথিবীর আড়ালে—বাংলাদেশ সেই স্যাটেলাইটের ফুটপ্রিন্টে নেই এবং সেই স্যাটেলাইট দিয়ে বাংলাদেশের কোনো কাজ হবে না। সুতরাং, বাংলাদেশের জন্য এমন জায়গায় স্যাটেলাইট স্থাপন করা লাগবে যাতে বাংলাদেশ তার ফুটপ্রিন্টে পড়ে। কোথায় স্যাটেলাইট বসবে, সেই জায়গাগুলিকে বলা হয় অরবিটাল স্লট (কক্ষঘর) এবং Internanational Telecommunication Uniton (ITU) প্রতিটি দেশকে ‘আগে এলে আগে পাবে’ এই ভিত্তিতে স্লট দিয়ে থাকে। ক্যাচালটা এইখানেই—বাংলাদেশের ওপরে বা আশেপাশের সব স্লট অন্য কিছু দেশ নিয়ে নিয়েছে (তালিকা নিচে)। বাংলাদেশ আগে চায়নি, তাই পায়নি। আবার অনেক দেশ নিজেদের স্যাটেলাইট দরকার নেই, তাই স্লট বিক্রি করেছে। যেমন: টংগা নিজেদের পাঁচটা স্লট বছরে ২ মিলিয়ন ডলার দরে ১৯৮৮ সালে নিলাম করেছে।

দক্ষিণ গোলার্ধে সমুদ্রের ওপরে অনেক জায়গা আছে, যেখানে কোনো জমি নেই, কোনো মানুষ থাকে না। সেই ফুটপ্রিন্টে স্লট পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা নিয়ে কী হবে?

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হয়ে গিয়েছে যে আপনি থাকেন চট্টগ্রামে এবং চাইলেই আপনি ৩,০০০ মাইল দূরে সমুদ্রের দখল কিনতে পারেন। কিন্তু আপনার দরকার বাসা বানিয়ে থাকা; সমুদ্রের পানির দখল নিয়ে কী করবেন? সুতরাং, আপনাকে এখন দাম দিয়ে অন্যের কাছ থেকে চট্টগ্রামেই জমি কেনা লাগবে।

স্যাটেলাইটের জন্যও জরুরি আমাদের সেই ফুটপ্রিন্টে থাকা—সমুদ্রের পানি কিনলে চলবে না। অতএব, বাংলাদেশ সেটাই করেছে। ১১৯.১ ডিগ্রি দ্রাঘিমাতে একটা স্লট লিজ নিয়েছে ১৫ বছরের জন্য রাশিয়ানদের কাছ থেকে ২৮ মিলিয়ন ডলার দিয়ে, যেটার ফুটপ্রিন্টে বাংলাদেশ পড়ে।

স্যাটেলাইট ১৫ বছর টিকবে (সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে), তারপর আবার হয়তো এই স্লট লিজ নেবে, অথবা ততদিনে টেকনোলজি আরও ছড়িয়ে যাবে, আর স্যাটেলাইট লাগবে না। সীমিত সংখ্যক জিওস্টেশনারি স্লট আছে—একটা থেকে আরেকটা বেশ দূরে যাতে ধাক্কা না লাগে এবং একটা আরেকটার রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সিতে ঝামেলা না করে। (স্লটের দাম বাড়ছে, কমছে না। আফসোস; টংগা যদি ১৯৮৮ সালে এটা নিয়ে ভাবতে পারে, আমরা কেন নিজেদের স্লট নিয়ে তখন ভাবতে পারিনি যার ফলে এখন টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে?

বাসা বানাতে গেলে যেরকম প্রথমে জমি ঠিক করা লাগে, তারপর জমি বুঝে প্ল্যান, সেই প্ল্যান রাজউক থেকে পাশ করানো লাগে, স্যাটেলাইটের জন্যও তাই। প্রথমে জমির (স্লট) আশেপাশে কী স্যাটেলাইট আছে, তারা কোন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে, সেগুলির সাথে যাতে কোনো সংঘর্ষ না হয়, সেটা হিসাব করে ITU ফ্রিকোয়েন্সি অনুমোদন দেয় (প্ল্যান পাশ)। তারপর স্যাটেলাইট (বাসা) বানানো লাগে। বাংলাদেশ জমি পেয়েছে, প্ল্যান পাশ হয়েছে এবং সব শেষে স্যাটেলাইট তৈরি হয়ে উড়ে গেছে মহাকাশে।

লঞ্চ উইন্ডো (উৎক্ষেপনের মোক্ষম সময়)

প্রথমবার উড়তে গিয়েও স্পেইস এক্সের ফ্যালকন-৯ রকেট শেষ মুহূর্তে এসে উৎক্ষেপন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে কেন আবার উৎক্ষেপন করা হলো না? কারণ এই লঞ্চ উইন্ডো। জি না, এটা ঢাকা বরিশাল লঞ্চের জানালা নয়, এটা ঠিক কখন উৎক্ষেপণ করলে সবচাইতে কম খরচে স্যাটেলাইট জায়গামতো পৌঁছানো যাবে, সেটার একটা হিসাব। ছুটন্ত কিছুর দিকে কখনো ঢিল মেরে দেখেছেন? আপনার ঢিল পৌঁছাতে পৌঁছাতে টার্গেট সরে যায়; তাই টার্গেট আর ঢিলের গতি হিসাব করে টার্গেটের সামনে ঢিল মারা লাগে। এখানেও তাই; স্লট কোথায় সেটা হিসাব করে উৎক্ষেপণ করা লাগে কারণ পৃথিবী ঘুরছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, উৎক্ষেপণস্থল যখন কক্ষপথ সমতলে (অরবিটাল প্লেইন; পুরো কক্ষপথকে একটা গোলাকার সমতল কল্পনা করলে যা পাওয়া যায়) থাকে তখন জ্বালানি কম লাগে। সেটা স্লটটা কোথায়, তার ওপরে নির্ভর করে। মহাকাশে কিছু পাঠানোর খরচ অনেক; প্রতি কেজি পাঠাতে খরচ প্রায় ২৫,০০০ ডলার বা ২০ লক্ষ টাকা। সুতরাং বাড়তি জ্বালানি পাঠাতেও অনেক খরচ। তাই খরচ কমানোর জন্য এই দুইটা হিসাব মাথায় রেখে দিনের যে সময়ে উৎক্ষেপণ করলে সবচাইতে কম খরচ হবে সেটাকে লঞ্চ উইন্ডো (উৎক্ষেপণের মোক্ষম সময়) বলা হয়।

রাত জেগে বাংলাদেশের অনেকেই দেখলেন কীভাবে রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশের দিকে ভেসে গেল আমাদের বঙ্গবন্ধু ১ স্যাটেলাইট। এই ধারাবর্ণনায় অনেকেই শুনেছেন, রকেটের স্টেইজ-২ ট্রান্সফার অরবিট-এ পৌঁছে দিল। ধরুন, প্লেনে করে বিদেশ থেকে দেশের এয়ারপোর্টে নামলেন। এবার বাসায় যাওয়ার জন্য গাড়িতে করে যেতে হবে। ট্রান্সফার অরবিট এরকম মধ্যবর্তী একটা স্থান, যেখানে রকেট থেকে স্যাটেলাইট আলাদা হয়ে যায়। এরপর স্যাটেলাইট নিজের জ্বালানি ব্যবহার করে তার নিজস্ব স্লটে পৌঁছে যাবে। এই কাজটা করবে থালিস-এর প্রকৌশলীরা; স্পেইস-এক্স এর এখানে আর কোনো ভূমিকা নেই। কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে শুরু হবে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার। দেশের দুটা উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র অন্যের স্যাটেলাইটের বদলে আমাদের নিজেদের স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ রাখবে।

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ!

১

পুনশ্চ (আরও কিছু তথ্য যোগ করে দিলাম): ১৫ বছর পরে কী হবে?

স্যাটেলাইট এমনেতেই এক জায়গায় থাকে না, আস্তে আস্তে সরতে থাকে। সেটাকে মাঝে মাঝে আবার ঠিক জায়গায় আনা লাগে। যখন আয়ু শেষ হয়ে যাবে, কিছু না করলে সেটা এমনেতেই নিচে নামতে নামতে এক সময় বায়ুমণ্ডলে ঢুকবে এবং পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু স্লটের দাম আছে, হয়তো এভাবে নিজে থেকে নামতে না দিয়ে সেটাকে ধাক্কা দিয়ে (জ্বালানি পুড়িয়ে) নামানো হবে অথবা ধাক্কা দিয়ে আরো ২০০ কি.মি. ওপরে তুলে দেওয়া হয় যেখানে সেই মৃত স্যাটেলাইট ঘুরতেই থাকে। আর পরবর্তী স্যাটেলাইট একই স্লট নিতে পারে বেশি অপেক্ষা না করেই।

মাত্র ১৫ বছর কেন?

সব ইলেকট্রনিক্সের মতোই, স্যাটেলাইটের ক্যাপাসিটি দিন দিন বাড়ছে আর দাম কমছে। ৫০ বছর টিকবে এমন স্যাটেলাইট বানানো সম্ভব, কিন্তু সেটা ১০-১৫ বছর পরে আর নতুন স্যাটেলাইটের সাথে পাল্লা দিতে পারবে না। তাই এগুলি এভাবেই ডিজাইন করা হয়, লাইসেন্সও ১৫ বছরের।

বাংলাদেশের উপরের স্লটগুলি কাদের হাতে?

বাংলাদেশের অবস্থান ৯০.৩৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাতে। ৯০ ডিগ্রির উপরের স্লটগুলি এবং মালিকানা দিলাম এখানে—

90...........CYP.....KYPROS-APHRODITE-2

90...........USA.....USGAE-3A C

90...........CHN.....GC-11B

90.5.........J...........QZSS-GS1

90.7.........J...........DRTS-90.75E

90.75.......J...........DRTS-90.75এ

প্রথম সংখ্যা হচ্ছে দ্রাঘিমাংশ (longitude), তার পরে কোনো দেশ। মনে রাখবেন যে জিওস্টেশনারি হতে হলে বিষুবরেখার ওপরে বা অতি অল্প বাইরে হতে হবে, অর্থাৎ অক্ষাংশ (latitude) ০ বা তার কাছাকাছি হতে হবে। অক্ষাংশ ৯ এর বেশি হলে সেটা আর জিওস্টেশনারি থাকতে পারে না, সেটা জিওসিনক্রোনাস, বাংলা ৪ এর মত প্যাঁচানো অবস্থান হয় আকাশে।

৫ ডিগ্রি ডানে-বামের স্যাটেলাইটের তালিকা পাবেন এখানে

এই স্যাটেলাইট দিয়ে ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যাবে?

কেউ কেউ এই কথাটা বলছেন বটে। কিন্তু রেডিয়ো দিয়ে যেমন টিভি দেখা যায় না, তেমনি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দিয়ে আবহাওয়া দেখা যায় না। আমি কোনো বর্ণনাতেই পড়িনি যে এই স্যাটেলাইটে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কোনো যন্ত্র আছে। যদি এটা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এটা দিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাবে না।

একটু অঙ্ক আর ফিজিক্স। ওপরে ব্যাখ্যা করা আছে; অঙ্ক ভালো না লাগলে বাদ দিয়ে যেতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই।

ক. আমরা জানি, পৃথিবীর সাথে তাল রাখা/ভূস্থির/জিওস্টেশনারি থাকার জন্য স্যাটেলাইটটাকে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করা লাগবে।

r ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি 2π.r

T=২৪ ঘণ্টা=৮৬,৪০০ সেকেন্ডে, এই পথ অতিক্রম করলে গতি হচ্ছে

$v=2\pi.r/T$

খ. কোনো ঘূর্ণায়মান বস্তুর ওপর কেন্দ্রমুখী বল, $F = mv^2/r$ (m স্যাটেলাইটের ভর, r দূরত্ব, v সরলরৈখিক গতি)

আর মহাকর্ষের সূত্র থেকে আমরা জানি, $F = G\,Mm/r^2$ (F বল, G মহাকর্ষ ধ্রুবক, M পৃথিবীর ভর, m স্যাটেলাইটের ভর, r দূরত্ব)। এই দুইটা সমান,

অর্থাৎ,

$mv^2/r = F = GMm/r^2$

দুই দিকে m কাটাকাটি হয়ে গেল,

বা, $v^2r = GM$

ওপরের সমীকরণে $v = 2\pi.r/T$ বসিয়ে আমরা পাই,

$(2\pi.r)^2.r/T^2 = GM$

বা, $T^2 = (2\pi)^2.r^3/(GM)$

বা, $T^2/(2\pi)^2.GM = r^2$

মহাকর্ষ ধ্রুবক, $G= 6.67(10^{-11})\ Nm^2/kg^2$

পৃথিবীর ভর, $M=5.972 \times 10^{24}$ kg

T = 24 hours = 86,400 second

মান বসিয়ে সমাধান করলে পাই,

$(86{,}400s)^2 \times 6.67(10^{-11})Nm^2/kg^2 \times 5.972 \times 10^{24}\ kg\ /\ (2\pi)^2 = 7.53205\times10^{22}\ m^3 = r^3$

এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধের কিউব। এটার কিউব রুট নিলে আমরা পাই,

$r = 4.22316\times10^7$ মিটার = 42,231.6 km.

এই ব্যাসার্ধ থেকে বিষুবরেখায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6,378 কি.মি. বিয়োগ করলে আমরা পাই, 35853.6 কি.মি.। অর্থাৎ, জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 35,853.6 কি.মি. ওপরে থাকবে (বাস্তবে আরেকটু কম/বেশি হতে পারে, উইকিপিডিয়া ৩৫,৭৮৬ কি.মি. দেখাচ্ছে। এটা অঙ্কে দশমিকের পর কয় ঘর তার ওপর বদলে যাচ্ছে)। আর আমরা যখন r পেয়ে গেলাম, তখন $v = v = 2\pi.r/T = 2\pi \times 42{,}231/86{,}400 = 3.07$ km/sec

এই কেন্দ্রমুখী বল বা মহাকর্ষের জন্য স্যাটেলাইটটা সবসময় পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে, কিন্তু শুরুর গতিজড়তা/ঘূর্ণনজড়তার জন্য সামনের দিকেও আগাতে থাকে। এই পড়ার পরিমাণ যদি কক্ষপথের বক্রতার সমান

হয়, তাহলে এটা একটা বৃত্তাকার কক্ষপথকে অনুসরণ করতে থাকবে, কখনই পড়ে যাবে না বা, মহাকাশে ছুটে যাবে না।

বঙ্গবন্ধু-১ তার কক্ষাংশ (orbital slot) ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে পৌঁছে গিয়েছে। ঔসময় ফেইসবুক জুড়ে তুফান উঠেছিলো যে, এটা খুব বাজে একটা অবস্থান। এই কারণে স্যাটেলাইট ভালো কাজ করবে না, টিভিতে ছবি ভালো আসবে না।

কথাটা কি সত্যি?

প্রথমে আমাদের তিনটা তথ্য নিয়ে আগাতে হবে।

•যে-কোনো ভূস্থির (geostationary) স্যাটেলাইট বিষুবরেখার ওপরে থাকতেই হবে এবং তার উচ্চতা হতে হবে ৩৫,৮৬০ কি.মি. বা তার কাছাকাছি।

•পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬,৩৭১ কি.মি.।

•ঢাকার অক্ষাংশ ২৩.৮১০৩ ডিগ্রি উত্তর, দ্রাঘিমাংশ ৯০.৪১২৫ পূর্ব।
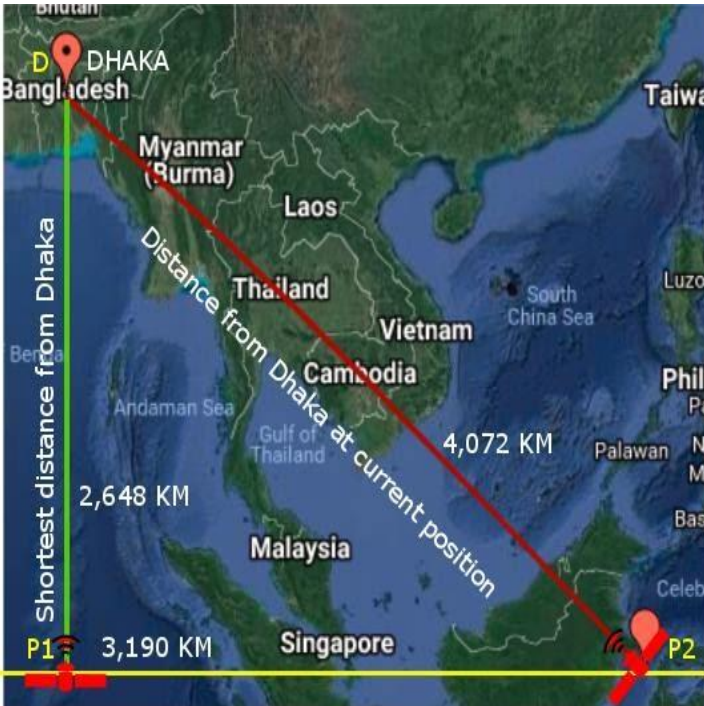
ধরি, আদর্শ অবস্থান হচ্ছে P1, যেখানে ঢাকার দ্রাঘিমাতে স্যাটেলাইটটির কক্ষাংশ পড়ত। ঢাকা (D) থেকে বিষুবরেখার (P1) ওপরে যদি একটা লম্ব আঁকা হয়, তাহলে সরাসরি দূরত্ব = ২,৬৪৮ কি.মি.; আর ঢাকা থেকে ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্বে (P2, যেখানে স্যাটেলাইটটা আছে) তার দূরত্ব ৪,০৭২ কি.মি.।

এখন বঙ্গবন্ধু-১ যদি বাংলাদেশের সবচেয়ে কাছে অর্থাৎ P1এর ওপরে থাকত, তাহলে সেটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করত; যার ভূমি DP1 (২,৬৪৮ কি.মি.) আর উচ্চতা P1S1 = ৩৫,৮৬০ কি.মি.।
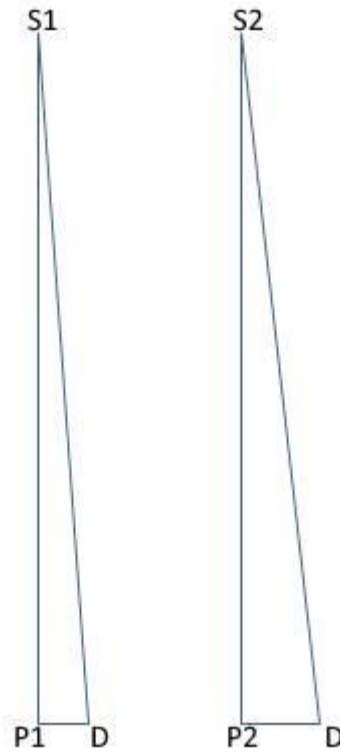
তাহলে স্যাটেলাইট থেকে ঢাকা পর্যন্ত অতিভুজের দৈর্ঘ্য (DS1), পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে আমরা পাই:

অতিভুজের বর্গ = ২৬৪৮^2+৩৫৮৬০^2 = ১,২৯২,৯৫১,৫০৪ কি.মি.

বা, অতিভুজ = ৩৫,৯৫৭.৬৩ কি.মি.

বর্তমান অবস্থান বা P2-র ওপরে থাকায় ঢাকার সাথে আরেকটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে, যার ভূমি DP2 (৪,০৭২ কি.মি.) এবং উচ্চতা, P2S2 = ৩৫,৮৬০ কি.মি.। তাহলে স্যাটেলাইট থেকে ঢাকা পর্যন্ত অতিভুজের দৈর্ঘ্য (DS2), পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে আমরা পাই :

অতিভুজের বর্গ = ৪০৭২^2+৩৫৮৬০^2 = ১,৩০২,৫২০,৭৮৪ কি.মি.^{২}

বা, অতিভুজ = ৩৬,০৯০.৪৫ কি.মি.

তাহলে বাংলাদেশের সবচেয়ে কাছের অবস্থানে না থেকে বর্তমান অবস্থানে থাকায় দূরত্ব বেড়েছে ৩৬,০৯০.৪৫ কি.মি. - ৩৫,৯৫৭.৬৩ কি.মি. = ১৩২.৮২ কি.মি. অর্থাৎ ০.৩৭% (১৩২.৮২/৩৫,৯৫৭.৬৩)। এই এক শতাংশের চেয়েও কম দূরত্ব বাড়ায় টিভির সিগন্যালের কি কোনো তারতম্য হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

পদার্থবিদ্যায় 'inverse square law' বলে একটা নিয়ম আছে, যেটাকে বাংলায় 'বিপরীত বর্গীয় সূত্র' বলা হয়। এই নিয়ম দিয়ে দূরত্বের সাথে কীভাবে চুম্বকের প্রভাব, আলোর পরিমাণ, রেডিয়ো, মোবাইলের সিগন্যাল, স্যাটেলাইটের সিগন্যাল কমে বা বাড়ে সেটার হিসাব করা যায়। ধরুন, আপনার হাতে একটা মোমবাতি আছে আর আপনার থেকে এক মিটার দূরে একটা সাদা দেওয়াল আছে। সেই দেওয়ালে এখন যে আলো পড়ছে, আপনি দুই মিটার দূরে সরে গেলে সেই আলোর পরিমাণ (১/২)২ অর্থাৎ ১/4 ভাগ হয়ে যাবে। আর যদি ১ মিটারের বদলে অর্ধেক মিটার কাছে চলে আসেন, তাহলে (১/০.৫)২ অর্থাৎ চার গুণ বেড়ে যাবে। সূত্রটা সহজ—প্রথম দূরত্বকে দ্বিতীয় দূরত্ব দিয়ে ভাগ করুন, তারপর তার বর্গ করুন। তাহলে ৩৫৯৫৭.৬৩-র বদলে ৩৬,০৯০.৪৫ ১৩২.৮২ কি.মি. হলে কী হবে? আলোরপরিমাণ (৩৫,৯৫৭.৬৩/৩৬,০৯০.৪৫)২ অর্থাৎ প্রথমে যা আলো ছিল, তার ০.৯৯২৮ হয়ে যাবে অর্থাৎ আগে যদি ১০০ হয়ে থাকে, তাহলে এখন ৯৯.২৮ হবে। আপনার কি মনে হয়, ১০০ আর ৯৯.২৮ এর ভেতরে তেমন কোনো পার্থক্য হবে? আপনি হয়তো ভাবছেন, আলো আর স্যাটেলাইটের সিগন্যাল কি এক হলো? মজার কথা, আসলে পদার্থবিদদের কাছে আলো, এক্স-রে, রেডিয়ো, মোবাইলের সিগন্যাল, স্যাটেলাইটের সিগন্যাল, সবকিছুই electromagnetic wave বা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ এবং এগুলির সব কয়টাই বিপরীত বর্গীয় সূত্র মেনে চলে।

সুতরাং, যারা বলছে এই অবস্থানে স্যাটেলাইটের সিগন্যাল দুর্বল হয়ে যাবে, তারা না-জেনে বা না-বুঝে অথবা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কথা বলছে।

পাদটিকা:

১। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিয়ে দূরত্ব কীভাবে হিসাব করা হয়?
পৃথিবী গোলক আকৃতির এবং দুই মেরুতে একটু চাপা। আমাদের হিসাবের সুবিধার জন্য পৃথিবীকে একটি সুষম গোলক ধরে নিচ্ছি। তাহলে ঢাকা এবং P1 দিয়ে যাওয়া পৃথিবীর পরিধি ২ x π x ব্যাসার্ধ = ৪০,০৩০ কি.মি.। যেহেতু অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করা হয়েছে, সেহেতু এক ডিগ্রি = ৪০,০৩০ কি.মি./৩৬০ = ১১১.৯৪ কি.মি.। তাহলে ঢাকার অক্ষাংশ যেহেতু ২৩.৮১০৩ ডিগ্রি এবং বিষুবরেখার অক্ষাংশ শূন্য, তাহলে ঢাকা থেকে বিষুবরেখার দূরত্ব = (২৩.৮১০৩ – ০) x ১১১.৯৪ কি.মি. = ২,৬৬৫ কি.মি.। খেয়াল করুন, এটা আমাদের ব্যবহৃত দূরত্বের চাইতে ১৭ কি.মি. বেশি। যেহেতু পৃথিবী আসলে সুষম গোলক নয়, তাই এই সংখ্যার তারতম্য হচ্ছে।

২। স্যাটেলাইটের বর্তমান অবস্থানের জন্য কৌণিক তফাৎ কী হবে? এটা হিসাব করার জন্য আপনাকে একটু ত্রিকোণমিতি জানতে হবে। আদর্শ অবস্থানে থাকলে অ্যান্টেনার কোণ হতো ∠P1DS1। যেহেতু P1D = ২,৬৪৮ (ভূমি) এবং P1S1 = ৩৫,৮৬০ (উচ্চতা)। তাহলে ∠P1DS1 = $\tan^{-1}$ (উচ্চতা / ভূমি) = $\tan^{-1}$ (৩৫,৮৬০/২,৬৪৮) = ৮৫.৭৭ ডিগ্রি।

একইভাবে ∠P2DS2 = $\tan^{-1}$ (৩৫,৮৬০/৪,০৭২) = ৮৩.৫২ ডিগ্রি।

অর্থাৎ, অ্যান্টেনা ২.২৫ ডিগ্রি বেশি হেলানো লাগবে।
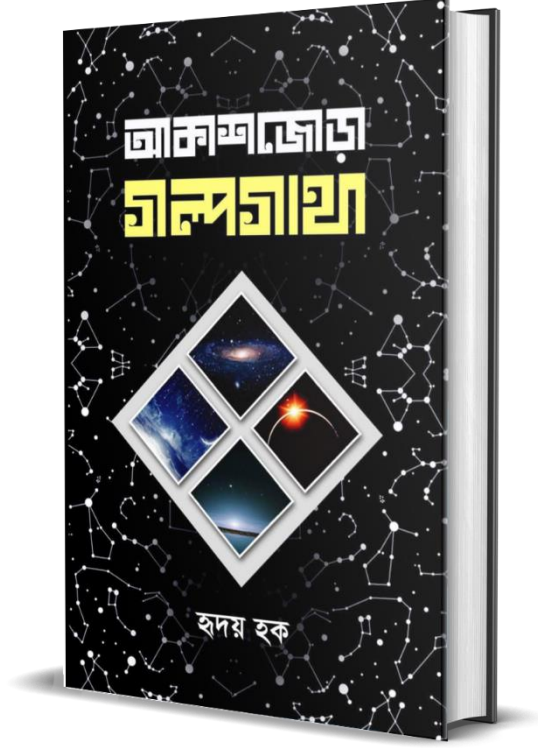
মহাকাশের মহাবিস্ময়

আমির

পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। কী অদ্ভুত আকাশ! কোটি কোটি তারা। এদের মাঝে আমি কতই না ক্ষুদ্র! হঠাৎই হাদা বলে উঠল, “আজ টিভিতে নিউজ দেখলাম, বিজ্ঞানীরা নাকি এমন একটা তারা খুঁজে পেয়েছেন যেটা একেবারেই অদ্ভুত!”

– সবকিছুই তো অদ্ভুত রে, হাদা।

– না, এটা তার চেয়েও বেশি অদ্ভুত। আশ্চর্য কী সব ঘটে। কেউ নাকি ব্যাখ্যা করতে পারছেন না।

হাদা আমার বন্ধু। ও এসব খবর ভালোই রাখে। পুরোটা সত্য না হলেও আংশিক সত্য হয়। ওকে বললাম, “চল তাহলে, আবির ভাইয়ার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সে পড়েন। একই পাড়ায় থাকি। খুবই ফ্রেন্ডলি।) কাছে গিয়ে জেনে আসি।”

তাঁর বাসায় গিয়ে দেখি সেও আকাশ দেখায় ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর আমাদেরকে খেয়াল করে বললেন, “কী খবর আমির, তন্ময় (হাদা)

– এই তো ভাইয়া, ভালো। আপনি কেমন আছেন?

– এই তো, আছি।

– ভাইয়া, আকাশে নাকি একটা তারা আছে যেটা খুবই অদ্ভুত। তার রহস্য নাকি জানা যায়নি?

– রহস্যময় তো অনেক কিছুই আছে। তোমরা কি ট্যাবির তারার কথা বলছ?

হাদা সাথে সাথে বলে উঠল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাইয়া, এটাই। এটা সম্বন্ধে জানতে চাই। কীভাবে কী হয়, সব বলুন।” আমিও তাল মেলালাম, “জি ভাইয়া, আমিও জানতে চাই।”

ওকে, বলছি। শোনো তাহলে। এটার নাম ট্যাবির তারা (Tabby's Star) বা বোয়াজিয়ানের তারা (আবিষ্কারকের নামানুসারে। প্রায় ৩০ জন বিজ্ঞানী মিলে 'Where's The Flux?' নামের একটি পেপার পাবলিশ করেন। সেখানে প্রথমেই নাম ছিল ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক ফেলো ট্যাবেথা বোয়াজিয়ানের। তাই এটি ট্যাবির তারা নাম পায়)। আর নামকরণের নিয়মানুযায়ী, KIC 8462852. একে WTF স্টার নামেও ডাকা হয়। ট্যাবির তারা আমাদের গ্যালাক্সির সবচেয়ে রহস্যময় তারা। এটি সূর্যের ভরের ১.৪৩ গুণ এবং পৃথিবী থেকে প্রায় ১৪৭০ আলোকবর্ষ দূরে সিগনাস নামক নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত। এটি একটি জি টাইপ (আলোর রং হলদেটে সাদা) তারা। এর অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড +১১.৭ এর মতো। মানে, উজ্জ্বলতা কম।

হাদা বলে উঠল, “এর মধ্যে অদ্ভুতের কী আছে, ভাইয়া?”

– এখানে অদ্ভুতের কিছু নেই। সামনে আছে। পুরোটা শোনো তো আগে। তারাটি প্রথম দেখা যায় ২০০৯ সালের মে মাসে, নাসার কেপলার মিশনে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সৌরজগতের বাইরে প্রাণের সন্ধান চালান। তারা প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার নক্ষত্রে নজর রাখেন (কেপলার স্পেইস টেলিস্কোপের সাহায্যে)। প্রতি ৩০ মিনিটে

তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। অতিক্রমণ দেখে গ্রহ বা অন্যকিছু শনাক্ত করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।
হাদা বলল, ভাইয়া অতিক্রমণ কী?
– পৃথিবী যেমন সূর্যের চারপাশে ঘোরে তেমনি অন্য গ্রহগুলোও তাদের নক্ষত্রের চারপাশে ঘোরে। একে অতিক্রমণ বলে।
– অতিক্রমণ দেখে কী হবে?
আমি বলে উঠলাম, আরে বোকা, অতিক্রমণ মানেই কোনো গ্রহ বা অন্য কিছু আছে। আর, গ্রহ থাকলেই প্রাণ থাকার সম্ভাবনা।
হাদা বুঝতে পারল। আবির ভাইয়া আবার শুরু করলেন।
মহাকাশে আমাদের দেখা সব তারা এক রকম না। কিছু তারার ঔজ্জ্বল্য ওঠানামা করে, এসব তারাকে বলে ভ্যারিয়েন স্টার। কেপলার মিশনে ট্যাবির তারা নজরে আসে এর অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ওঠানামার কারণেই। আর, কোনো তারার সামনে যখন কিছু আসে তখন এর উজ্জ্বলতা কমে যায়। কোনো গ্রহের কারণে এ উজ্জ্বলতা খুব বেশি কমে না। তাছাড়া সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা হ্রাসের জন্য গ্রহটিকে বেশ বড়ো হতে হবে এবং পৃথিবী ও তারার ঠিক মাঝখানে থাকতে হবে। আমাদের বৃহস্পতি শত চেষ্টা করেও ১% এর বেশি আলো আটকাতে পারবে না। আর বৃহস্পতির চেয়ে খুব বেশি বড়ো গ্রহ সম্ভব না।
– কেন সম্ভব না?
– কারণ, এর চেয়ে কিছুটা বড়ো হলে এরা ব্রাউন ডোয়ার্ফে পরিণত হয়। এটা নিয়ে অন্য একদিন বলব।
ট্যাবির তারার ক্ষেত্রে শুধু এর উজ্জ্বলতার যে বিরাট হেরফের হয় তা না, এর সামনে দিয়ে যে বস্তু অতিক্রম করে সেটাই অদ্ভুত ধরনের। বৃহস্পতির মতো গ্রহ হলে এর অতিক্রমণ কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতো। কিন্তু, এটি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দেখা গেল। গ্রহের অতিক্রমণের সাথে এর মিল নেই। যে জিনিসের সাথে আলো বাধা পাচ্ছে সেটিও গ্রহের মতো গোল নয়। এটি আরও কয়েকবার ঘটল। কেউ খুব একটা নজর দিলেন না।
এরপর, ২০১১ সালের মার্চে আবার দেখা যায়, তারাটির প্রায় ১৫% আলো ঢাকা পড়ে গেছে। এক সপ্তাহ আলো-আধারির খেলা চলার পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। ২০১৩ সালে এই অন্ধকার ১০০ দিনের মতো স্থায়ী হয় যা কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। আলোর বাধাও বিভিন্ন ধরনের হয়। কোনোটা তীক্ষ্ণ, কোনোটা চওড়া, কোনোটা ১-২ দিন স্থায়ী হয়, আবার কোনোটা স্থায়ী হয় ৭ দিনেরও বেশি।
কিছুদিন পর আলোর বাধা বেড়ে গিয়ে ২০ শতাংশে পৌঁছায়। মানে, যে বস্তুটা আলো আটকিয়ে রাখছে তার ক্ষেত্রফল হবে পৃথিবীর চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি। এর উজ্জ্বলতা হ্রাসের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি বছরে ০.৩৪% থেকে এখন ২.৫% পর্যন্ত হয়েছে যেটা মোটেও স্বাভাবিক না। ২০১৫ সালে এটিকে বিজ্ঞানীরা বিশেষ নজরে আনেন এবং এর রহস্য অনুসন্ধানে লেগে পড়েন।
- তারাটিতে এমন কেন হচ্ছে? এর পেছনে কি অলৌকিক কিছুর হাত আছে?
- থাকলে থাকতেও পারে। তবে সেটা নিয়ে আজ বলব না। তোমরা চিন্তা করো কী হতে পারে, যার কারণে এমন হয়।
তবে অনেকে এটাকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করে। কেউ বলে ধূমকেতুর কারণে এমন হয়, কেউ বলে এর চারপাশে ঘূর্ণায়মান মেঘ আছে বলে এমন হয়। এমনকি অনেকে এলিয়েনের ব্যাখ্যাও দেয়।
কাল আবার ভাইয়ার কাছে আসব বলে আমি আর হাদা চলে আসলাম। রহস্য উন্মোচন করতে হবে।
বাসায় এসে চিন্তায় পড়ে গেলাম। কী ব্যাখ্যা হতে পারে এই ঘটনার? অদ্ভুত সব খেয়াল এলো। একবার মনে হলো, ওটা জ্বিন বা অ্যাঞ্জেলদের বাসস্থান হবে হয়তো। তাই, উলটা-পালটা ঘটনা ঘটে। আবার মনে হলো, না, সেরকম কিছু হবে না। হতে পারে অন্য কোনো তারা এর সামনে চলে আসে। কিন্তু, তা হলে তো এই তারাই দেখা যাবে না। উজ্জ্বলতা কমা বুঝব কীভাবে? হতে পারে উল্কা, ধূমকেতু বা মেঘের জন্য এমন হয়। সেটাই বা কীভাবে সম্ভব? তবে কি সত্যিই সত্যিই এলিয়েনদের কারসাজি! আমার মাথা ঘুরতে লাগল।
পরেরদিন সকালবেলা হাদাকে সাথে নিয়ে চলে গেলাম আবির ভাইয়ার কাছে। ভাইয়া বললেন, “কী হাদা, আমির, কোনো সমাধান পেয়েছ?” হাদা বলল, “ভাইয়া, আমাকে হাদা বললেন না কি আমিরকে? ভাইয়া কিছু না বলে হাসলেন।

আমি উলটা-পালটা সব সমাধান বলে দিলাম। কিন্তু, কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। এক প্রকার আন্দাজেই বলেছি। উত্তরে তার হাসি দেখে বুঝলাম, কোনোটাই রাইট হয়নি। হাদা বলল, “ভাইয়া আপনি বলেন।”

– ওকে, বলছি শোনো। তারাটি দেখার পর বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে বারবার হিসেব করেছেন। কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না তো! যখন দেখা গেল, হিসেব ঠিকই আছে, তখন তাঁরা নিশ্চিত হলেন, আসলে মহাকাশে এমন কিছু আছে যা এর আলোকে ছড়াতে দিচ্ছে না। ট্যাবির তারা নিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্তও অনেক জল ঘোলা হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানীই সম্ভাব্য প্রায় সব ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর কয়েকটি হলো:

১) গ্রহ
২) মেঘ
৩) ধূমকেতুর ঝাঁক
৪) এলিয়েন

এগুলো দিয়ে উনারা কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, চলো জানার চেষ্টা করি।

১) গ্রহ: আগেই বলেছি, সাধারণ কোনো গ্রহ এত বিশাল পরিমাণের আলো আটকে রাখতে পারে না। এত দূর থেকে বৃহস্পতির মতো জায়ান্ট গ্রহ হলে যেখানে ১% এর বেশি আলো আটকাতে পারবে না সেখানে কোনো সাধারণ গ্রহের পক্ষেই ২২% আলো আটকে রাখা সম্ভব না। তাই তারা চিন্তা করলেন, এমন একটা গ্রহ যেটা সাইজে প্রায় বৃহস্পতিরই সমান বা সামান্য বড়ো এবং এর চারপাশে আসে অসংখ্য গ্রহাণু, উল্কা, ধুলাবালি (যদিও এদের ভাঙাচোরা চাঁদ বলা উচিত)। এগুলো আমাদের সৌরজগতের মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে থাকা গ্রহাণুগুলোর মতো এত দূরে অবস্থান করছে না। বরং যথেষ্ট কাছে এবং গ্রহের চারপাশে ঘুরছে। অনেকটা শনির বলয়ের মতো। কিন্তু আরো বেশি পরিমাণে এবং বিশাল পরিধি জুড়ে। এই গ্রহ সামনে আসলেই তারার আলো বাঁধা পায়। এটা অনেকে মেনে নিলেও বেশিরভাগ বিজ্ঞানী মেনে নিতে পারলেন না। একটা গ্রহের সাথে এত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন বস্তু থাকতে পারে না যা দিয়ে এটি এর ব্যাসার্ধের কয়েকশগুণ বেড়ে যাবে। তাছাড়া, আলো যে বৃত্তাকার পথে আটকাচ্ছে না সেটা আগে থেকেই জানা ছিল। তাই এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে, কোনো সাধারণ গ্রহের কারণে এই ভৌতিক ঘটনা ঘটছে না।

২) মেঘঃ হ্যাঁ, মেঘ। তবে আমাদের আকাশের মেঘ নয়, ধুলাবালির মেঘ। তোমরা কি জানো তারা কীভাবে তৈরি হয়? হাদা বলল, “না, ভাইয়া জানি না। কীভাবে তৈরি হয়?”

– তারা তৈরি হয় নীহারিকা থেকে। নীহারিকা হলো, বিশাল পরিমাণ ধুলাবালির মেঘ এবং গ্যাসের সমাহার। এগুলো আস্তে আস্তে নিজেদের মহাকর্ষের প্রভাবে ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়ে একে অপরের কাছে চলে আসে এবং বিশাল বড়ো বলে পরিণত হয়।

– তাহলে জ্বলে কীভাবে?

– ভেতরে প্রচণ্ড চাপে লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফিউশান বিক্রিয়া হয়ে তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। গ্যাস আর ধুলাবালি থেকে তারা হয়–এই পর্যন্ত বুঝেছ?

– জি, ভাইয়া, বুঝেছি।

– আপাতত এই পর্যন্ত বুঝলেই হবে। বিস্তারিত অন্য কোনো একদিন বোঝানো যাবে।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন তারাটি বেশি পুরোনো না। সম্ভবত খুবই নতুন এবং যে ঘূর্ণায়মান মেঘ থেকে এটি সৃষ্টি হয়েছে তা এখনো এর চারপাশে বিদ্যমান আছে। আর এই মেঘের কারণেই তারাটির আলো আমাদের কাছে আসতে পারে না। ঢাকা পড়ে যায়।

ব্যাখ্যা ভালো হলেও দুর্ভাগ্যের (বা সৌভাগ্যের বা কিছু যায় আসে না) ব্যাপার বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এটি মেনে নিলেন না। তারা মনে করেন তারাটি এত নতুনও নয় যে এর চারপাশে এখনো মেঘ থাকবে। তাছাড়া এত নতুন তারার কাছে যা-ই থাকুক না কেন তা জ্বলে উঠবে। তাই, আলো ব্লক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। ফলে এ সমাধানও মাঠেই মারা গেল। তাঁরা খুঁজতে লাগলেন অন্য কোনো ব্যাখ্যা।

৩) ধূমকেতুর ঝাঁক : বেশ কিছু বিজ্ঞানী এই ঘটনার জন্য ধূমকেতুকে দায়ী করেন এবং এটি বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

মাঝেই হাদা বলে উঠল, "গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল! মানে এখন গ্রহণযোগ্য না?"

– অনেকটা সেরকমই। ট্যাবি মনে করেন, এককালে এর চারপাশে অনেক অনেক ধূমকেতু ছিল। তারাটির কাছাকাছি অন্য একটি তারা চলে আসে এবং ধূমকেতুগুলো একজোট হয়ে একে অপরকে ধ্বংস করে। এগুলো তারার চারপাশে ঘোরায় আলো ব্লক হয়ে উজ্জ্বলতার হেরফের করছে। এমনিতেই ধূমকেতুর কক্ষপথ অনেক গোলমেলে ব্যাপার। তার ওপর ধাক্কাধাক্কিতে ভেঙে আরও এলোমেলো হয়ে গেছে। তাই ধূমকেতুর কারণে এটা হতেই পারে। ২০৬৫ সাল থেকে ২০৬৭ সাল পর্যন্ত বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এটাই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু যারা মেনে নেননি তাঁরা এই দুই বছর বসে থাকেননি।

আমি বললাম, কেন, ভাইয়া? মেনে নেননি কেন? এটা তো ঠিকই ছিল, কোনো ভুলই তো নেই।

– এটাই বিজ্ঞানের সৌন্দর্য, এজন্যই বিজ্ঞান এত বিশ্বাসযোগ্য। যে কারণগুলোর কথা বললাম তার সবগুলোই হাইপোথিসিস। মানে কোনোটাই প্রমাণিত নয়। সন্দেহ এবং অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। একটা সন্দেহ এবং অনুমানের জিনিসকে সত্য ধরে নিয়ে বসে থাকলে বিজ্ঞান কোনোদিনই আজকের এই অবস্থানে আসত না। যাহোক, সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎই ২০৬৭ সালে লুইসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্র্যাডলি শেফার ধূমকেতুর সাহায্যে দেওয়া ব্যাখ্যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সন্দেহ থেকেই তিনি প্রমাণ করে দেন, ধূমকেতুর কারণেও এ ঘটনা ঘটছে না। তিনি হিসেব করে দেখান যে, তারাটির ২২% আলো আটকাতে ৬,৪৮,০০০ টি দৈত্যাকার ধূমকেতুর প্রয়োজন। যেগুলোর প্রতিটির ব্যাস হবে কমপক্ষে ২০০ কিলোমিটার করে। ধূমকেতুর এই সংখ্যাটা, মানে সবগুলো ধূমকেতু একসাথে তারা ও আমাদের সামনে আসলে এত পরিমাণ আলো ব্লক করতে পারবে। তার মানে তারাটির মোট ধূমকেতু হতে হবে মিলিয়ন মিলিয়ন।

আমাদের সৌরজগতে ছোটো বড়ো ৬,৬৬৯ টি জানা ধূমকেতু আছে। এর হিসেবে মিলিয়ন মিলিয়ন ধূমকেতু বিশাল সংখ্যা এবং এটি আদৌ সম্ভব কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেল। তাই, ধূমকেতুর ব্যাখ্যাটি কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা হলো না। ফলে বিজ্ঞানীরা এটি থেকেও পিছিয়ে এলেন।

তিনটা ব্যাখ্যার একটাও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এতক্ষণে আমি অনেক এক্সাইটেড। তার মানে এলিয়েন আছে! ব্যাটা এলিয়েনই এসব করাচ্ছে? আবির ভাইয়া বললেন, ইয়েল ইউনিভার্সিটির অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট, রিচার্ড লারসন ট্যাবির তারা সম্বন্ধে বলেন, "এর ব্যাখ্যায় দেওয়া বেশিরভাগ থিয়োরিই আমার কাছে কল্পিত মনে হয়।"

যখন প্রকৃতির কোনো কিছু দিয়ে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না তখন বিজ্ঞানীরা নিয়ে আসেন অতিপ্রাকৃত কিছু। আবির ভাইয়া মুচকি হেসে বললেন, "You know what I mean."

.

.

.

Alien!

আমাদের কাছে সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে গেল। তাহলে এলিয়েনই এসব করছে? কিন্তু এরা কতই বা উন্নত এবং ক্ষমতাশালী হতে পারে যে একটা তারাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে! যার ভর কিনা সূর্যেরও দেড় গুণ। কীভাবে আলো ব্লক করে রাখবে? অনিয়মিতভাবে আবার আলো ছড়াতেও দেবে? নিজেদের ইচ্ছামতো? কোনো কিছুই মাথায় এলো না।

ভাইয়া বলা শুরু করলেন, "ওয়েল, এলিয়েন নিয়ে ২টা ধারণা আছে। সবসময় দেখানো হয়, এলিয়েন মানুষের চেয়ে উন্নত, বেশি শক্তিশালী, তারা অনেক কিছু করতে পারে যা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। এখানেও এলিয়েন সেরকমই। প্রথমত, হতে পারে আমরা মহাকাশের একটি মহাযুদ্ধের সাক্ষী হয়েছি, যেখানে যুদ্ধে একটি গ্রহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অনেক অনেক ধূলিকণা সৃষ্টি হবার কথা। এই ধূলিকণাই তারাটির চারপাশে ঘুরছে এবং যখন তা আমাদের সামনে আসছে তখন আলো ব্লক করে দিচ্ছে।

আমি বললাম, আমরা যদি এলিয়েনের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেই নিই, যারা গ্রহ ধ্বংস করেছে তাহলে, এটা ভাবতে অসুবিধা কোথায় যে, তারা সব ধূলিকণা পরিষ্কারও করে ফেলেছে! তারা তো অনেক উন্নত, গ্রহ ধ্বংস করতে পারলে পরিষ্কারও করতে পারবে।

- হুম, ভাবতেই পার। কল্পনার ঘোড়া বেশ দ্রুত বেগেই চলছে! তাহলে, এটি আপাতত সাইডে রাখ। এলিয়েন নিয়ে আরেকটি ধারণা আছে। সেটা হলো, এলিয়েন মেগাস্ট্রাকচার।

– এলিয়েন মেগাস্ট্রাকচার?

– হ্যাঁ, এলিয়েনদের তৈরি বিরাট কোনো স্থাপনাকে এলিয়েন মেগাস্ট্রাকচার বলে।

– কী ধরনের স্থাপনা, যা স্পেইসে থাকতে পারে এবং এসব আজব কাণ্ডকারখানা ঘটাতে পারে?

– আচ্ছা, মনে করো একটি সভ্যতা, যারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত–এক্ষেত্রে এরা অবশ্যই এদের নিজেদের গ্রহের সব শক্তি শেষ করে ফেলবে। তারপর এরা শক্তি পাবে কোথায়? আমাদের সূর্যের মতো তাদের গ্রহটিও একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে পাক খাচ্ছে। এখন এরা যদি এই নক্ষত্র থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে তাহলেই কিন্তু শক্তির চাহিদা মিটে যায়। অতএব, তারা বিশাল স্থাপনা তৈরি করবে। দৈত্যাকার সোলার প্যানেলের সাইজের এই বিশাল স্থাপনাগুলোকে বলা হয় ডাইসন স্ফিয়ার।

ধারণা করা হয়, যখন কোনো একটি সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত হবে, দ্বিতীয় পর্যায় বা তার ওপরে চলে যাবে তখন তারা তাদের সোলার সিস্টেমের সমস্ত শক্তি নিজেদের কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। আর, এই কাজটি করার একটি উপায় হচ্ছে 'ডাইসন স্ফিয়ার' বা 'ডাইসন গোলক'।

হাদা বলল, "সভ্যতা! দ্বিতীয় পর্যায়! বুঝলাম না।"

– কার্দাশেভ স্কেলে শক্তি ব্যবহারের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সভ্যতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে (চতুর্থ ভাগ এখনো কল্পিত)।

সভ্যতা ১ : নিজেদের গ্রহের সব শক্তি ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে।

সভ্যতা ২ : নিজেদের সোলার সিস্টেমের সব শক্তি ব্যবহার করতে পারে।

সভ্যতা ৩ : নিজেদের গ্যালাক্সির সব শক্তি ব্যবহার করতে পারে।

আমি বললাম, "ভাইয়া, মানুষ কি তাহলে এখন ১ম সভ্যতায় আছে?"

– না, মানুষ এখনো ১ম সভ্যতায় পৌঁছাতে পারেনি। আমরা নিজের গ্রহের সব শক্তি ব্যবহার করতে পারি না। আমরা শূন্য সভ্যতার প্রাণী।

আচ্ছা, আমরা কোথায় ছিলাম যেন?

– ভাইয়া, ডাইসন স্ফিয়ার।

– হ্যাঁ, ডাইসন স্ফিয়ার। ১৯৬০ সালে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন সর্বপ্রথম এ ধরনের গোলকের ধারণা দেন এবং ব্যাখ্যা করেন কীভাবে এটি দিয়ে প্রচুর শক্তি পাওয়া সম্ভব। তবে, বিখ্যাত দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক ওলাফ স্ট্যাপলডনের ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'স্টার মেকার' নামক ফিকশন উপন্যাসে ডাইসন স্ফিয়ারের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি তারার চারপাশে প্রায় সমস্ত তারা জুড়ে সোলার প্যানেলযুক্ত স্পেইস স্টেশনের মতো কল্পনা করতে পারো। রিং এর মতো বলয়ও চিন্তা করতে পার। এটিও বেশ পপুলার। কিন্তু, সেটা বাস্তবে সম্ভব কি না সেটা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। তাই, আমাদের স্পেইস স্টেশন যেমনটা রয়েছে, সেরকম ভাবাই ভালো। তবে, এটি এত অল্প পরিমাণে নয়, কোটি কোটি স্পেইস স্টেশন! একটির মোটামুটি বেশ কাছেই আরেকটি। এটি পৃথিবীর চেয়ে ৫৫০ মিলিয়ন গুণ বড়ো হতে পারে। এই কাঠামোতে সূর্য থেকে অনেক অনেক পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ফিজিক্সের সূত্র অনুযায়ী, যে-কোনো কিছুই নক্ষত্রের এই বিশাল শক্তি নিতে চাইবে তাকে তাপ এবং অবলোহিত রশ্মিও গ্রহণ করতে হবে। এগুলো বিকিরিত হবে। তবে হতেও পারে এসব আমাদের পৃথিবীর দিকে আসছে না।

এই স্ট্রাকচার থেকে এরা শক্তি গ্রহণ করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। আর, এটি প্রতিনিয়ত ঘুরছে এবং গ্রহের তুলনায় ভিন্ন আকৃতির এবং ভিন্ন গতিসম্পন্ন হওয়ায় আলো এভাবে ব্লক হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানীই এই ব্যাখ্যার পক্ষে ছিলেন।

এমনকি ধূমকেতুর ব্যাখ্যায় জল ঢেলে দেওয়া ব্র্যাডলি শেফারও এলিয়েনের ব্যাখ্যায় ঝুঁকে পড়েন।

হাদা বলল, "তাহলে কি ব্যাখ্যার শেষ ভরসা এলিয়েনই?"
– মোটেও তা নয়। দেখো, এলিয়েন কিন্তু একেবারেই অপ্রমাণিত জিনিস। তাই, এটি দ্বারা ব্যাখ্যা করলে মেনে নেওয়া কষ্টকর হবেই। আসলে, এটিই সবগুলো ব্যাখ্যার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল এবং হাস্যকর ব্যাখ্যা। এলিয়েন নাম শুনলেই পাবলিক খায়। তাই, ইউটিউবের ভালো ভালো চ্যানেলগুলোতেও দেখলাম এটাকেই সবার ওপরে তুলে রেখেছে। তাছাড়া, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রেডিয়ো টেলিস্কোপ গ্রিন ব্যাংকের সাহায্যে কোনো এককোষী জীবেরও চিহ্ন বা সন্দেহজনক সিগন্যাল পর্যন্ত পাওয়া যায়নি (কিছু গুজব রটেছে)। অতিপ্রাকৃত কিছু হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়; এটুকু বিশ্বাস রেখো। 'চা কফি আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স' বইয়ে লেখক দেখিয়েছেন এলিয়েন থাকার সম্ভাবনা কতটা ক্ষীণ। তার ওপর এত উন্নত এলিয়েন পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোটায়। তারা এত উন্নত হলে আমাদের দেখতে পেত। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করত; যেটা মোটেও হচ্ছে না। অনেকে বলেছেন, এলিয়েনের হাত থাকতেও পারে। তাঁরা কতটুকু চিন্তা করে বলেছেন, তা তারাই ভালো জানেন। আমি অবশ্যই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার পক্ষে। তবে, এলিয়েন পেলে ব্যাপারটা মন্দ হতো না, কী বলো?
আমরা চুপ!

সবশেষে সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০১৯ সালে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ব্রায়ান মেজগারসহ আরও কয়েকজন মিলে এলিয়েনদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে নতুন একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন; যেটিই আসলে প্রকৃত ব্যাখ্যা।

তারাটি মোটেও নতুন নয়। বরং, বেশ পুরোনো এবং এতে অলরেডি গ্রহ উপগ্রহেরও জন্ম হয়ে গেছে। গ্রহটি একটি গ্যাস জায়ান্ট। মানে বৃহস্পতির মতো বলতে পার। গ্রহটির বেশ কয়েকটি উপগ্রহ আছে; যেগুলো কঠিন পদার্থের তৈরি। উপগ্রহ থাকাটা সমস্যা না। কিন্তু, অন্য কোথাও থেকে একটি উপগ্রহের মতো কঠিন পদার্থের (বরফের আসলে) বিশাল বস্তু গ্রহটির মহাকর্ষ টানের কারণে আস্তে আস্তে এসে এর ওপর সজোরে আছড়ে পড়ে। ফলে গ্রহটি গ্যাসীয় হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ছুটে আসা উপগ্রহটিও (গ্রহও বলতে পারো) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পাথর, ধুলাবালি, বরফ, গ্যাস সব একসাথে গ্র্যাভিটির প্রভাবে তারার চারপাশে ঘুরতে থাকে। গ্যাসীয় গ্রহ এবং উপগ্রহ মিলে যে বিশাল পরিমাণ আবর্জনার সৃষ্টি করে তা থেকে ২২% আলো ব্লক হওয়া সম্ভব এবং এটি অনিয়মিতভাবেও হতে পারে। তাই প্রায় সব বিজ্ঞানীই এলিয়েনের ধারণাকে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তাঁদের মতে, এটাই একমাত্র এবং প্রকৃত কারণ।

কিন্তু এরপরও বিজ্ঞানীরা থেমে নেই। তাঁরা অনবরত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তারাটিকে নিয়ে। তোমরাও বসে থেকো না। সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলীর দুটো উজ্জ্বল তারা ডেনেব ও ডেল্টা সিগনির প্রায় মাঝে ট্যাবির তারা অবস্থিত। তবে একে খালি চোখে দেখা যাবে না। নক্ষত্রের আপাত উজ্জ্বলতার মান +৬ এর বেশি হলে তাকে খালি চোখে দেখা যায় না। তাই একটা ভালো মানের টেলিস্কোপ জোগাড় করে নজরদারি চালিয়ে যাও। বিজ্ঞান কখনো থেমে থাকে না।

যেভাবে পৃথিবী খোঁজা হয়

মশিউর রহমান আনন্দ

আজমান: মামা, দেখ, মেয়েটা সুন্দর না?
রেজা: কী! কই?
আজমান: ওই যে, ক্যাসিওপিয়া।
এটা শুনে রেজার মেজাজ গরম হয়ে গেল।
একেবারে খোলা জায়গা। দিগন্ত পর্যন্ত কোনো উঁচু গাছ নেই। শুধু ছোটো ছোটো দূর্বা ঘাস। রেজা আর আজমান খোলা ময়দানের বুকে চাদর বিছিয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে। তাদের পেছনে তাঁবু। সামনে দূরে কোথাও দুটো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তাদের সামনেই বন ফায়ারটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল। বেশ কিছুক্ষণ হলো নিভে গেছে। তবে কিছু কাঠ গাঢ় লাল হয়ে আছে। আকাশে প্রচুর তারা। চাঁদ নেই। তারাগুলোর আলোয় সবকিছু আলোকিত। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। এই নরম বাতাস বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসে তাদের হৃদয়ের দোলনাকে আলতো করে দোল খাওয়াচ্ছে।
আর এরকম একটা জনশূন্য স্থানে "দেখ, মেয়েটা সুন্দর না?" শুনে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল রেজা। রেজা গাঁজাখোর দেখেছে, বিড়িখোর দেখেছে কিন্তু 'স্পেইস-খোর' জীবনেও দেখেনি।
ওহ, স্পেইস-খোর থেকে একটা কথা মনে পড়ল
রেজা: কীরে, তুই Kepler-452b-এর সম্পর্কে জানিস? দেখতে নাকি পুরো পৃথিবীর মতো?

আজমান: হুম। এটাকে 'পৃথিবী ২.০' নামেও ডাকা হয়। তবে এটা ছাড়াও পৃথিবীর মতো অসংখ্য গ্রহ আছে এই মহাবিশ্বে।

রেজা: আমাদের গ্রহ কোনোভাবেই স্পেশাল নয়।

আজমান: ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, এইসব গ্রহ তো অনেক আলোকবর্ষ দূরে, আর আমরা যতই শক্তিশালী টেলিস্কোপ ব্যবহার করি না কেন এই গ্রহ ও তারাগুলো একেকটা বিন্দুই দেখাবে, তাই না?

– হু, ঠিক।

– তাহলে আমরা এদের সম্পর্কে জানলাম কীভাবে? মানে এই যে Kepler 452b গ্রহটার অস্তিত্ব আছে, এটায় পানি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি জানা গেল কীভাবে?

আজমান মুচকি হাসল। কেউ তাকে কখনো "কীভাবে গ্রহগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি" জিজ্ঞেস করেনি।

রেজা যে নিজেও জ্ঞান-খোর সেটা সে কখনো অনুভব করেনি।

– এইসব জানতে হলে তোকে আগে জানতে হবে কেপলার কী, কীভাবে কাজ করে, এটা খায় না খেলে?

– ওকে, বল তাহলে... আহ!

আজমান তার লাল আলোর টর্চটা জ্বালিয়ে রেজার চোখের দিকে আলো ফেলে।

রেজার প্রচণ্ড রাগ হতে থাকে।

– একটা তারা থেকে আলো আমাদের চোখে আসে বা কেপলারের লেন্সে আসে। আমাদের ক্ষেত্রে ধরে নে তুই কেপলার স্যাটেলাইট আর টর্চটা একটা তারা।

– (রাগ সামলাতে সামলাতে) আচ্ছা, তারপর কী?

এরপর আজমান তার বাম হাতের তর্জনী টর্চটার আলোর মাঝ দিয়ে বামদিক থেকে ডানদিকে ধীরে ধীরে নিতে শুরু করে।

– এই যে তোর ওপর আমার হাতের যে ছায়া পড়ছে, সেটার কারণে তুই জানতে পেরেছিস টর্চের সামনে কিছু একটা আছে। এখন আমার আঙুলের ছায়াটা ধরে নে গোল। তাহলে তুই যদি কেপলার স্যাটেলাইট হয়ে থাকিস, আর একটা তারার ওপর নজর রাখার সময় যখন তুই দেখিস যে এর উজ্জ্বলতা হঠাৎ কমে যায়; কম উজ্জ্বলতা কিছু দিন স্থায়ী হয়, তারপর উজ্জ্বলতা আবার আগের জায়গায় ফিরে যায়। আর এই পুরো ব্যাপারটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ঘটে, তাহলে তুই কী বুঝবি?

– তোর ছাতা বুঝমু! টর্চ বন্ধ কর!

– ওকে! ওকে! ঠিক আছে। (টর্চ বন্ধ করল)

এখন বল, কী বুঝবি?

– ওই তারাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান একটা গ্রহ আছে?

– রাইট। সেটাই। কেপলার স্যাটেলাইট এমনভাবে কাজ করে।

– আচ্ছা, সেটা বুঝলাম, কিন্তু গ্রহ সম্পর্কে জানার জন্য তার অভিভাবক তারা সম্পর্কেও তো জানতে হবে। সেটা কীভাবে?

– অভিভাবক তারার উজ্জ্বলতা আর রং দেখে। ব্যাখ্যা করছি। একটা তারা যত শক্তি বিকিরণ করবে সেটা হবে তার লুমিনোসিটি (Luminosity) বা ঔজ্জ্বল্য। আর সেই তারা যত আলো বিকিরণ করবে তার উজ্জ্বলতা তত বেশি হবে। আর এটা আমরা পরিচিত কিছুর সাথে তুলনা করি, যেমন–সুয্যিমামার সাথে। আর এই লুমিনোসিটি আমাদের তাপমাত্রা জানিয়ে দেবে। এটার সূত্র হলো :

$L = 4\pi\sigma T^4 4R^2$

যেখানে, L = Luminosity of the Star (তারার ঔজ্জ্বল্য)

σ(গ্রিক অক্ষর সিগমা, এখানে স্টিফেন–বোল্টজম্যান কন্সটেন্ট)

$= 5.67\times10^{-8}\ W/m^2K^{-4}$

T = Temperature of the Star (তারার তাপমাত্রা)

R = Radius of the Star (তারার ব্যাসার্ধ)

– থাম থাম। লুমিনোসিটি কেমনে পাইমু?

– হু, বলছি। তার আগে তারার তাপমাত্রার কথাটা বলি। একটা তারার তাপমাত্রা তুই রং দেখে বুঝবি।

"তারা তোমার তাপমাত্রা কত? রঙে পরিচয়।"

– ওহ। এটা আমি জানি। তারা যত নীল তত বেশি তাপমাত্রা, আর যত লাল তত কম তাপমাত্রা।

– রাইট। আমরা উজ্জ্বলতা ছাঁকনি (Magnitude Filters) ব্যবহার করে বলতে পারি একটা তারা কতটা নীল আর কতটা লাল। যেটাকে আমরা B–V Magnitude বলি। এটার একটা মান আসবে। সেই মান দিয়ে তুই তারাটার তাপমাত্রা বের করতে পারবি। B–V Mag দিয়ে তাপমাত্রা বের করার অনেক সূত্র আছে। তবে তোর সূত্র বসিয়ে কষ্ট করতে হবে নাহ, বরং এই মান একটা রং সূচক (Colour Index) এর সাথে মিলিয়ে তাপমাত্রা মেপে নিস। উপ্স... তোর মতো হাবা তো আবার এগুলো পারবে না।

রেজা রাগে গজগজ করতে করতে বলল, "তাড়াতাড়ি কথা শেষ কর... আর্টিকেলটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। মানুষ পরে পড়বে না।"

– রাইট। আরেকটু বাকি আছে। সেগুলো শেষ করে নিই।

– ওকে, তারপর বল।

– এই জায়গাটা ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন। খেয়াল রাখিস। লুমিনোসিটি মানে কী মনে আছে তো?

– আবার ক্লিয়ার করে দে।
– একটা তারা কত শক্তি বিকিরণ করে তার পরিমাপ। এর একক Watts। এখন একটা তারার লুমিনোসিটি কত সেটা আগেই বলেছি যে সুয্যিমামার সাথে তুলনা করে বোঝা বা পড়া বা লেখা হয়। সূর্যের লুমিনোসিটি 1L⊙ (one luminous)। কোনো একটা তারার লুমিনোসিটি বোলোমিটারের মাধ্যমে মাপা যায়। এটা দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ ও শোষণের মাধ্যমে অল্প কিছু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর পরিমাপ নির্ণয় করা হয় যা দিয়ে পুরো বর্ণালি (স্পেকট্রাম) অনুমান করে তৈরি করা হয়। অর্থাৎ, কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো কী পরিমাণে বিকিরিত করে তা বের করা হয় (ভিন্ন ভিন্ন তারা একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে নির্গত করে)। এখানে লক্ষণীয় যে বোলোমিটার পরিমাপ করার জন্য থেকে থাকলেও তারা পুরো স্পেকট্রাম জুড়ে সংবেদনশীল নয়। একটা তারার সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় না। তাই ওই তারার বিকিরিত আলোর স্পেকট্রাম অনুমানের মাধ্যমে তৈরি করা হয়, যা বোলোমিটারে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়। এসব জুকিবুকির পর যে মান পাব তা লেখা হয় 2L⊙, 3L⊙... এরকমভাবে। অর্থাৎ একটা তারার ঔজ্জ্বল্য 65L⊙ হলে সেটা সূর্য থেকে 65 গুণ বেশি উজ্জ্বল হবে। এই হচ্ছে কঠিনের শেষ।
– যাক। তারপর বল।
– এখন আমরা সব পেয়ে গিয়েছি। এখন একটা তারার ব্যাসার্ধ আমরা বের করতে পারব। আগের সূত্রটা মনে আছে?
– আবার বল, মনে নেই।
– না থাকলে ওপরে লেখা আছে, গিয়ে দেখে আয়।

রেজা রাগে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল।

– যাহোক, যেটা বলছিলাম–এখন আমাদের একটা তারার তাপমাত্রা (T) আর ঔজ্জ্বল্য(L) আছে।
তো, ব্যাসার্ধ (R) = $\sqrt{(L/4\pi\sigma T^4)}$
এখন মান বসালেই কাহিনি শেষ। আচ্ছা, একটা অঙ্ক দিই। করে দেখা। একটা তারা, কাপেলা (Capella), এর L= 78L⊙, T = 4940K হলে সেটার ব্যাসার্ধ নির্ণয় করে দেখা। তাহলে বুঝব যে ঘিলুতে কিছু ঢুকেছে।
– আমি পারব না। যারা আর্টিকেল পড়ছে তাদের বল। আর বাকি গল্প শুরু কর।
– করব, করব। ৫টা মিনিট বিরতি নিয়ে নিই আগে।
(বেশ কিছুক্ষণ পর)
রেজা: কীরে? ঘুমিয়ে পড়েছিস?
আজমান: না। চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম।
রেজা: গল্প শুরু কর।
– করছি। তার আগে আগুনটা জ্বালিয়ে নিলে ভালো হয়। একটু শীত শীত লাগছে।
রেজা আর আজমান অল্প করে আগুন জ্বালালো। আগুনের আঁচটা কম। আগুনের সামনে তারা দুজন বসে আছে।
রেজা: এখন শুরু কর।
আজমান: তো ৯ম পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম কীভাবে কেপলার উপগ্রহ কাজ করে। আর আমরা, দুঃখিত, আমি মাথার ঘিলু ব্যবহার করে একটা তারার তাপমাত্রা, ঔজ্জ্বল্য এবং তার ব্যাসার্ধ বের করেছিলাম। ওসব মনে আছে?
– আছে।
– এখন একটা গ্রহ বসবাস উপযোগী হবে যদি তার অবস্থান হয় ওই সৌরজগতের বাসযোগ্য বলয়ে (Habitable Zone)। এই বাসযোগ্য বলয়ের দূরত্ব...
– থাম থাম। আগে বল বাসযোগ্য বলয়টা কী? আর এই বলয়েই গ্রহটাকে থাকতে হবে কেন?
– বাসযোগ্য বলয় বলতে ওই সৌরজগতে এমন একটা বলয় বোঝায় যেখানে কোনো গ্রহ থাকলে তার তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে এবং ওই গ্রহে পানি থাকলে তা তরল অবস্থায় থাকবে (চাপের হিসাব বাদে)। পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয় পানিতে। পানি থেকে পৃথিবীর সকল প্রাণীর আগমন। পানি বেঁচে থাকার বহু উপাদান সরবরাহ করে। তাই বাসযোগ্য বলয়ে থাকা গ্রহ যেমন আমাদের বসবাস উপযোগী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে, তেমনই পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্বের ধারক হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। তবে এই বাসযোগ্য বলয়ে থাকার মানেই এই না যে তার তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ের হবে। আবহাওয়াও এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন: আমাদের সৌরজগতের বাসযোগ্য বলয়ে শুক্র (Venus) পড়ে। কিন্তু ওই গ্রহে গ্রিনহাউজ গ্যাস বেশি হওয়ায় গ্রিনহাউজ ইফেক্ট অত্যধিক। তাই সহনীয় তাপমাত্রার বদলে ওই গ্রহ হয়ে ওঠে সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ। তবে বাসযোগ্য বলয়ে নেই, এমন গ্রহ বসবাস উপযোগী নয়; এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।
– শনির চাঁদ, টাইটানের কথা কী বলবি?
– ওই ব্যাটা ভিন্ন জিনিস। সেটা নিয়ে অন্য কোনো দিন বলব।

– আচ্ছা, তারপর বল।

– একটা সৌরজগতের বাসযোগ্য বলয় জানার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব, কোনো গ্রহ ওই বলয়ের মধ্যে থাকলে তা বাসযোগ্য হয়ে থাকতে পারে। এখন একটা তারা থেকে বাসযোগ্য বলয়ের ভেতরের এবং বাইরের সীমানা জানতে হলে আমাদের জানতে হবে ওই তারার ঔজ্জ্বল্য বা লুমিনোসিটি। আমরা আগে তারার ঔজ্জ্বল্য কীভাবে বের করা হয় সেটা জেনেছিলাম। এখন এই ঔজ্জ্বল্য ব্যবহার করে একটা সহজ সূত্রের মাধ্যমে বলয়ের আনুমানিক দূরত্ব নির্ণয় করা যাবে। একটা তারার ঔজ্জ্বল্য L, তারা থেকে বলয়ের ভিতরের সীমানার দূরত্ব r এবং বাইরের সীমানার দূরত্ব R হলে,

$r = \sqrt{(L/1.1)}$

এবং

$R = \sqrt{(L/0.53)}$

এখানে দূরত্ব পাওয়া যাবে AU–তে।

– AU কী ?

– AU হলো দূরত্বের একটা একক। এর পূর্ণরূপ হলো Astronomical Unit। 1 AU হলো পৃথিবী আর সূর্যের দূরত্বের সমান।

– ওকে, গট ইট।

– এখন আমাদের জানতে হবে, আমাদের গ্রহটা ওই বাসযোগ্য বলয়ে পড়ে কি না অর্থাৎ গ্রহের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ। আর সেটা নির্ণয় করতে হলে আমাদের জানতে হবে, ওই গ্রহের অভিভাবক তারার ভর আর ওই গ্রহের একবছর হতে কত সময় লাগে। প্রথমে আমরা তারার ভর বের করি। একটা তারার ভর আর তার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে। আর সেটা দিয়ে খুবই সহজভাবে আমরা একটা তারার ভর বের করে ফেলতে পারি। এখন ধরে নে একটা তারার ঔজ্জ্বল্য = L, সূর্যের ঔজ্জ্বল্য = L⊙, তারার ভর = M এবং সূর্যের ভর m। তাহলে,

$L/L_\odot = (M/m)^{3.5}$

আর এভাবেই আমরা তারার ভর পেয়ে গেলাম।

– কী ব্যাপার? আজকের সূত্রগুলো বেশ সহজ সহজ লাগছে।

– কেন? সহজ সূত্র দেখলে মনে লাড্ডু ফাটে? দাঁড়া, সামনেই একটা বড়ো সূত্র আসছে।

রেজার মেজাজ বিগড়ে গেছে।

এই লোকটার সাথে প্যাঁচাল করলেই ঝামেলা বাড়ে।

– তারপর বল।

– দ্বিতীয় ধাপে আমরা বের করব ওই গ্রহের এক বছরে কয়দিন। ৯ম পর্বে কেপলার কীভাবে গ্রহ বের করে মনে আছে?

– ওই যে, একটা তারার সামনে দিয়ে একটা গ্রহ গেলে তারার উজ্জ্বলতা একটু কমে।

– রাইট। প্রথম তারার উজ্জ্বলতা একটু কমার কত দিন পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে সেটা জানলেই আমরা পেয়ে যাব ওই গ্রহের এক বছরে কত সময়। তাহলে আমরা তারার ভরও পেলাম আর গ্রহের এক বছরের সময়টুকুও পেলাম।

– হু, পেলাম।

হঠাৎ আজমান, ঠাকুরমার ঝুলির শাকচুন্নির মতো হেসে বলল, “এবার আসছে বড়ো সূত্র।”

আবারও অট্টহাসি দিলো আজমান।

রেজার বিরক্তির সীমা রইল না।

– হয়েছে। এখন কন্টিনিউ কর।

– আমরা সব উপকরণ পেয়েছি। এখন আমরা বের করতে পারব সূর্য থেকে গ্রহটার দূরত্ব বা কক্ষপথের ব্যাসার্ধ। তো, ধরে নে–

তারার ভর = M

গ্রহের এক বছরে সময় = T

গ্রহের ভর = m

কক্ষপথের ব্যাসার্ধ = R

তাহলে, $T^2 = 4\pi^2/G(Mm) \times R^3$

এখানে সময়টা কিন্তু সেকেন্ডে নিতে হবে। অতঃপর একটু কষ্ট করলেই আমরা কক্ষপথের ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব।

– কিন্তু তোর কাছে তো গ্রহের ভর নেই।

– এটাই মজার ব্যাপার। এই সূত্রে গ্রহের ভর আমাদের জানার দরকারই নেই। কারণ তারার ভরের তুলনায় গ্রহের ভর খুবই নগণ্য । তাই গ্রহের ভরকে অগ্রাহ্য করলে কোনো সমস্যা হবে না।

যেমন : সূর্যের ভর 1.98×10^{30} kg আর পৃথিবীর ভর 6×10^{24}kg। এখন তাদের যোগফল

$1.98\times10^{30} 6\times10^{24} = 1.980006\times10^{30}$

দেখতেই পারছিস, সূর্যের ভর আর প্রাপ্ত যোগফলের পার্থক্য নেই বললেই চলে।

– কিন্তু গ্রহের ভর বের করে কীভাবে ?

– সেটা পরে বলব। এই অঙ্ক কষতে সেটা লাগবে না।

– ওকে । কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন ছিল।

– বলে ফেল।

– কোনো গ্রহের কক্ষপথ তো সম্পূর্ণ গোলাকার হয় না। কিন্তু তুই কক্ষপথকে গোলাকার ধরে ব্যাসার্ধ বের করলি যে?
– রাইট। গ্রহের কক্ষপথ বৃত্তাকার হয় না, হয় উপবৃত্তাকার। আমরা যেটা বের করেছি সেটা আসলে semi major-axis। অর্থাৎ উপবৃত্তের ব্যাসার্ধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়োটা।
– ও, ওকে, বুঝলাম।
– যেহেতু আমরা ওই গ্রহ তার তারা থেকে কত দূর জানতে পেরেছি, সেহেতু আমরা বলে দিতে পারব গ্রহটা বাসযোগ্য বলয়ে পড়ে কি না।
তাহলে এখন পর্যন্ত কী কী শিখলি?

– বাসযোগ্য বলয়ের পরিচয় পেলাম, এর গুরুত্ব বুঝলাম, এর উচ্চতা মাপলাম, তারা মিয়ার ভর মাপলাম, একটা বল তারা মিয়ার চারপাশে ঘুরতে কত সময় লাগে বের করলাম, বলটা তারা মিয়ার সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে কত দূর দিয়ে ঘোরে সেটা মাপলাম।
– গুড বয়। যা, ললিপপ খা।
রেজা চরম বিরক্তি নিয়ে বলল, "আর কিছু বলবি?"
– আর একটা জিনিসই বের করতে হবে। তারপর এই পর্ব শেষ করে দেওয়া যায়।
– গ্রহের আকৃতি?
– অরেহ! ঠিক ধরেছিস। গ্রহের আকৃতি।
– আমি মনে হয় ধারণা করতে পারি, কীভাবে বের করবি সেটা।
– বল দেখি।
– গ্রহ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন অভিভাবক তারার সামনে আসে তখন উজ্জ্বলতা সামান্য কমে যায়। সেটা থেকে।
– রাইট। উজ্জ্বলতা কতটুকু কমে সেটা দিয়ে আমরা গ্রহের ব্যাসার্ধ পাব। প্রথমে আমরা পেয়েছিলাম তারার ব্যাসার্ধ। এখন ধরে নে যে:
তারার ব্যাসার্ধ = R
গ্রহের ব্যাসার্ধ = r
তাহলে, Reduction in brightness = $(r/R)^2$
উজ্জ্বলতা কতটুকু কমে তা গ্রাফ দেখে বোঝা যাবে।

– কিন্তু গ্রহও তো উপবৃত্তাকার।
– ঠিক। কিন্তু বৃত্তাকার ধরে নিলে তেমন একটা অসুবিধা হয় না।
– ওকে, বুঝলাম।
– তো গোলকের আয়তন মাপার সূত্র প্রয়োগ করলেই আমরা পেয়ে যাব আমাদের গ্রহটার আয়তন।

আমাদের গ্রহের ব্যাসার্ধ r এবং আয়তন V হলে,
$V = 4\pi r^3/3$
টাডা! আমরা বুঝে গেলাম আমাদের গ্রহটা আসলে কত বড়ো !
রেজা: তোর গল্প কবে শেষ হবে?
আজমান: দেরি হবে।
– আমার ঘুমাতে ইচ্ছা করছে।
– এখন ঘুমানো যাবে না। গল্প শুরু যখন করেছি তখন শেষ করেই যাব। তার আগে তুই ঘুমালে সকালে তোর জুতা পাবি না।
রেজার মেজাজ বিগড়ে গেছে।
– শুরু কর তাহলে।
– এখন আমাদের গ্রহের ভর বের করতে হবে। তাহলে গ্রহের ঘনত্ব জানা যাবে আর গ্রহটার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
– গ্রহের ভর বের করবি কীভাবে?
– গ্রহের ভর জানতে হলে আমাদের আগে অভিভাবক তারার চারপাশে গ্রহ কত বেগে ঘোরে তা জানতে হবে।
আগে আমরা জেনেছিলাম কীভাবে গ্রহটার কক্ষপথের semi major-axis এর মান নির্ণয় করতে হয়। একে আমরা r ধরব। আর তারার ভরকে ধরব M। তাহলে গ্রহের বেগ,
$V_p = \sqrt{(GM/r)}$
আর....
– আর?
– ওয়েট। আরেকটা জিনিস বের করতে হবে গ্রহের ভর জানার আগে। আর সেটা হলো গ্রহের অভিভাবক তারার বেগ।
– সেটা কীভাবে বের করবি?
– তার আগে বল, তুই ডপলার ইফেক্ট বা রেডশিফটের ব্যাপারে জানিস তো?
– হ্যাঁ। কোনো বস্তু আমাদের থেকে দূরে যেতে থাকলে তার থেকে উৎপন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আমাদের সাপেক্ষে বেড়ে যাবে অর্থাৎ কম্পাঙ্ক কমে যাবে। আর কাছে আসতে থাকা বস্তুর ক্ষেত্রে হবে উলটোটা।
– রাইট। এখন ধর, আমাদের থেকে গ্রহের অভিভাবক তারা দূরে সরে যাচ্ছে। তাহলে ওই তারা থেকে আগত একটা তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য, ধর λd nm, পরিমাণ বেড়ে গেল। তাহলে আসল তরঙ্গদৈর্ঘ্য λt nm আর রেডশিফটেড তরঙ্গদৈর্ঘ্যে, λr nm এর পার্থক্য হলো, $\lambda r - \lambda t = \lambda d$। এখন ওই তারার বেগ,
$V_s = c \times (\lambda d/\lambda t)$
– এখন তাহলে গ্রহের ভর?
– হু। এখন গ্রহের ভর,

$m = M \times Vs/Vp$
– ওয়াও!
– এখন ঘনত্ব,
$\rho = m/V$
পৃথিবীর ঘনত্ব 5.51gm/cc। গ্যাস দানব, বৃহস্পতি, এর ঘনত্ব 1.33 gm/cc। এর মাধ্যমে গ্রহটা কত পাতলা বা শক্ত সেটা তুই বলে দিতে পারবি। অর্থাৎ গ্রহটা পাথুরে নাকি গ্যাসীয়।

– আচ্ছা, তো এই পর্যন্ত তো বেশ কিছু বের করলি। কিন্তু গ্রহটায় কী কী গ্যাস আছে বা থাকতে পারে সেটা কীভাবে বের করবি?
– এইটাই সবচেয়ে মজার জায়গা। আমি পুরো বিষয়টার এই অংশে পৌঁছে সবচেয়ে বেশি এক্সাইটেড হয়েছিলাম। গ্রহটায় কী কী গ্যাস আছে জানা যাবে Spectroscopy এর মাধ্যমে!
– Spectroscopy?
– লম্বা কাহিনি। শুরু থেকে শুরু করি। মনোযোগ দিয়ে শোন।

পর্যায় সারণিতে মৌল আছে 118টা। এসব মৌলের পরমাণু থাকে। এক একটা মৌলের পরমাণুর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য থাকে।
পরমাণুতে আলো ফেলা হলে কিছু আলো শোষিত হয়। এই শোষিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মৌলভেদে ভিন্ন হয়। অর্থাৎ, এক একটা মৌলের পরমাণু এক এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে।
আরও সহজভাবে বলতে হলে, ধর, সাদা আলোতে a,b,c,d,e... তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আছে। অক্সিজেন শুধু c আর d তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে। তাহলে অক্সিজেন গ্যাসে সাদা আলো ফেলতে হবে। তারপর ওই আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে একটা পর্দায় ফেললে নামও জানিস না এমন হাজারো রং দেখা যাবে, শুধু কয়েকটা বাদে। যে রং বাদ পড়বে সেগুলো বর্ণালিতে কালো এবং সূক্ষ্ম রেখার মতো দেখাবে। কোন রং, কয়টা রং বাদ পড়েছে সেটা দেখে বলে দেওয়া যাবে ওই পরমাণুর নাম কী। আমাদের ক্ষেত্রে c ও d তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বাদ যাবে। আর সেটা দেখে আমরা বলে দিতে পারব যে এই গ্যাস হলো অক্সিজেন গ্যাস।
অনুরূপভাবে অন্য মৌলের গ্যাসেও এই পরীক্ষা করে বলা যাবে সেটা কোন গ্যাস।
– ওকে, বুঝলাম।

– এই জিনিসটাকে বলে Spectroscopy। আর এটা ব্যবহার করে গ্রহ থেকে আসা আলো পরীক্ষা করে আমরা জানতে পারব, গ্রহের আবহাওয়া কেমন।
গ্রহ থেকে প্রতিফলিত, প্রতিসরিত এবং তাপীয় বিকিরণের (Thermal Radiation) মাধ্যমে আলো নির্গত হয় এবং আমাদের কাছে পৌঁছায়।

– আরেকটু ব্যাখ্যা কর।
– আচ্ছা, মনোযোগ দিয়ে শোন।
১। একটা গ্রহ যখন তারার পেছন থেকে আসতে থাকে (গৌণগ্রহণ), তখন ওই তারার কিছু আলো শোষিত হয় আর কিছু প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলিত কিছু আলো পৃথিবীর দিকে আসে। অর্থাৎ, প্রতিফলনের মাধ্যমে গ্রহ থেকে প্রাপ্ত আলো। (চিত্র দ্রষ্টব্য)

২। ওই গ্রহ যখন আমাদের আর ওই গ্রহের অভিভাবক তারার মাঝ বরাবর থাকে, (প্রাথমিক গ্রহণ) তখন ওই গ্রহের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণ আলো প্রতিসরিত হয়ে আমাদের কাছে আসে। অর্থাৎ, প্রতিসরণের মাধ্যমে গ্রহ থেকে প্রাপ্ত আলো। (চিত্র দ্রষ্টব্য)

৩। যদি গ্রহের তাপমাত্রা অধিক হয়, তাহলে সেটা বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো (বেশিরভাগ ইনফ্রারেড আলো) বিকিরণ করে তাপশক্তি কমায়। এর মাধ্যমে 1nm থেকে 1000nm পর্যন্ত আলো বিকিরিত হতে পারে। এই তাপীয় বিকিরণের মাধ্যমে আমরা গ্রহ থেকে আলো পাই।
বুঝেছিস?
– বুঝেছি। কন্টিনিউ কর।
– গ্রহ থেকে প্রাপ্ত আলোতে কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো মিসিং সেটা জেনে বলে দেওয়া যাবে ওই গ্রহের আবহাওয়ার বা বায়ুর মূল উপাদান কোনটি। এখন যদি আমরা দেখি বাতাসে অক্সিজেন আছে, পানি আছে তাহলে বুঝব গ্রহটা বসবাসের উপযোগী।
– গ্রহের তাপমাত্রা কত সেটা কীভাবে জানবি?
– গ্রহের অন্ধকার অংশ থেকে বিকিরিত ইনফ্রারেড আলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।
– ও...বুঝলাম। আর বায়ুচাপ?
– বায়ুচাপ আমরা সঠিকভাবে জানতে পারব না। তবে গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতাভেদে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব। তবে সেটার জন্য

অনেক তথ্য দরকার। যেমন: বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা, পৃষ্ঠ কোথায়, তাপমাত্রা ইত্যাদি। আর এসব জানলে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ (Po) এবং h উচ্চতায় বায়ুচাপ (Ph) এর মধ্যকার সম্পর্ক,

$Ph = Po \times ex^{-(mgh/kT)}$

যেখানে m = এক বায়বীয় অণুর ভর

g = অভিকর্ষজ ত্বরণ

k = Botzmann's constant

T = তাপমাত্রা

– কঠিন জিনিস।

– রাইট। আসলে এই পুরো প্রক্রিয়াটাই কঠিন এবং জটিল। আমার অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে এই সব কিছু জানতে এবং বুঝতে।

– টাডা! আমরা জেনে গিয়েছি আমাদের গ্রহ বসবাসের উপযোগী কি না !

রেজা – তুই সূত্র দিলি, কিন্তু উদাহরণ দিয়ে বোঝালি না কেন?

আজমান: কারণ এসব অঙ্ক খুবই ক্রিটিক্যাল। দশমিকের পর দু ঘর নিয়ে আমরা যেরকমভাবে অঙ্ক করি, সেই নিয়ম এখানে প্রয়োগ করলে সব লণ্ডভণ্ড হবে। তাছাড়া অঙ্কগুলো অনেক বড়ো এবং জটিল। এসব অঙ্ক সাধারণত কম্পিউটার সামলায়। এসব অঙ্ক আমরা করলে আসল জিনিসের সাথে অনেক বেশি পার্থক্য দেখা দেবে। তাই কম্পিউটারের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো।

– এই ক'টা সূত্র আমি মুখস্ত করলে তো আমি চ্যালচ্যালাইয়া নাসায় যাব, তাই না?

– না। আমি অনেক সংক্ষিপ্ত এবং সবচেয়ে সহজ সহজ সূত্র খুঁজে খুঁজে বের করে এনেছি। এগুলো কোথা থেকে এলো, কেন এটাই করা লাগবে, সেসব কিছু বলিনি। তাছাড়া আমি যে তথ্য নিয়ে অঙ্ক করেছি সেগুলোতে বিভিন্ন রকম জটিলতা থাকে। যেমন: গ্রহ থেকে প্রাপ্ত আলো পরিমাণে খুবই কম থাকে। কোনো কারণে আমার বলা পদ্ধতিতে সমাধান না করা গেলে তুই চাকরি হারাবি। তাই জ্যোতির্বিদ্যার একটা মান নির্ণয় করার সাধারণত বহু সূত্র থাকে।

By the way, নাসার চিন্তা বাদ দিয়ে আঙুল চোষ।

রেজার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

আজমান: প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে পারিস।

– শুরু থেকে প্রশ্নগুলো করি।

– বেশ।

– শুরুর ওই উজ্জ্বলতা ছাঁকনি (Magnitude Filters) বিষয়টা আরও ভালো করে বোঝা।

– ওকে। উজ্জ্বলতা ছাঁকনি হিসেবে আমি B−V Magnitude এর কথা বলেছিলাম। এটা আসলে UBV সিস্টেম বা জনসন সিস্টেম নামেও পরিচিত। UBV মানে হলো Ultraviolet, Blue, Visual। এই ফিল্টারগুলো ব্যবহার করে আলোর Blue Magnitude আর Visual Magnitude এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা যায় যা হলো B−V Magnitude এর মান।

– Magnitude কী জিনিস?

– Magnitude হলো কোনো জিনিস এর উজ্জ্বলতা। এটা দুরকম। যথা Apparent Magnitude আর Absolute Magnitude। Apparent Mag হলো পৃথিবী থেকে দেখতে একটা জিনিসের উজ্জ্বলতা আর Absolute Mag হলো জিনিসটার সত্যিকার উজ্জ্বলতা যার মান Apparent Mag এর সমান হবে, যখন সেই বস্তু আমাদের থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, একটা তারার Absolute Mag আর Apparent Mag সমান হবে যখন তারাটা পৃথিবী থেকে 10 parsecs দূরে হবে। 1 parsec = 3.086×10^{13} km।

– বাসযোগ্য বলয়েই কি একমাত্র এলিয়েন লাইফ বা বাসযোগ্য পরিবেশ থাকতে পারে?

– না। বাসযোগ্য বলয়ের বাইরেও থাকতে পারে। তবে বাসযোগ্য বলয়ে থাকার সম্ভাবনা বেশি।

– অনেক গ্রহের তো অনেক বেশি সময় লাগে পুরো একবার তার অভিভাবক তারার চারপাশে ঘুরতে। তখন কীভাবে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ পাবি?

– কেপলারের তৃতীয় ল এর মাধ্যমে। অথবা একটা গ্রহ অন্য গ্রহ এর গতিকে কূটনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করছে সেটার ওপর নির্ভর করে।

– গ্রহের আয়তন দিয়ে ঘনত্ব ছাড়া আর কী বোঝা যায়?

– সিরিয়াসলি? তুই এটা বের করতে পারিস না? এমন লেইম প্রশ্ন কেন?

রেজার মেজাজ আবারও বিগড়ে গেল।

– গ্রহটা কত বড়ো, গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠে আকর্ষণ বল, গ্রহের অভিকর্ষজ ত্বরণ, সেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণের ওপর ওই গ্রহের প্রাণী কেমন হতে পারে, জলবায়ু কেমন হতে পারে, ভূ-স্তর কেমন হবে, গ্রহের কক্ষপথ কেমন হবে...

– আচ্ছা থাম। হয়েছে। আমার পয়েন্ট ছিল একটা ছোটো তথ্য ব্যবহার করে অনেক বেশি তথ্য পাওয়া যায় এইসব বিষয়ে। এর

সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ তো আমাদের মূল বিষয়টাই। কীভাবে শুধু তারার আলো থেকে আমরা এত কিছু বের করলাম।

– রাইট। আচ্ছা, ওই সৌরজগৎ আমাদের থেকে কত দূর সেটা কীভাবে জানব?
– প্যারালাক্স (Parallax)-এর মাধ্যমে।
– প্যারালাক্স?
আজমান: হু। প্যারালাক্স হলো একটা সহজ পদ্ধতি যার মাধ্যমে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এর সাহায্যে 9-10 এর জ্যামিতি ব্যবহার করে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। তুই তোর একচোখ খোলা রেখে অন্য চোখ বন্ধ রেখে একটা বস্তু দেখ। তারপর খোলা চোখ বন্ধ করে এবং বন্ধ চোখ খুলে আবার ওই বস্তুটাকে দেখ। লক্ষ করবি যে তার অবস্থান তোর সাপেক্ষে পরিবর্তন হয়। দেখবি, ডান চোখ দিয়ে বস্তুটা দেখার পর বাম চোখ দিয়ে দেখলে বস্তুটা একটু ডানে সরে যায়। এখন অঙ্ক করে তুই তোর আর ওই বস্তুর মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয় করতে পারবি। এর জন্য তোর দরকার দুটা তথ্য। প্রথমত, তোর দুচোখের মধ্যবর্তী দূরত্ব, আর দ্বিতীয়ত, তোর দুচোখ আর ওই বস্তুর মধ্যবর্তী কোণ। আমাদের মস্তিষ্ক কিন্তু এই প্যারালাক্স পদ্ধতিতে দুই চোখ ব্যবহার করে বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করে বা অনুভব করে।
– ওয়াও! জোস তো। কিন্তু কোণ কীভাবে পাবি?
– তোর চোখের অবস্থান, মূল বস্তু আর ব্যাকগ্রাউন্ডের জিনিসপত্র দিয়ে।
– ওহ।
আজমান তার ব্যাগ থেকে একটা কাঠি বের করে মাটিতে একটা চিত্র আঁকতে লাগল।
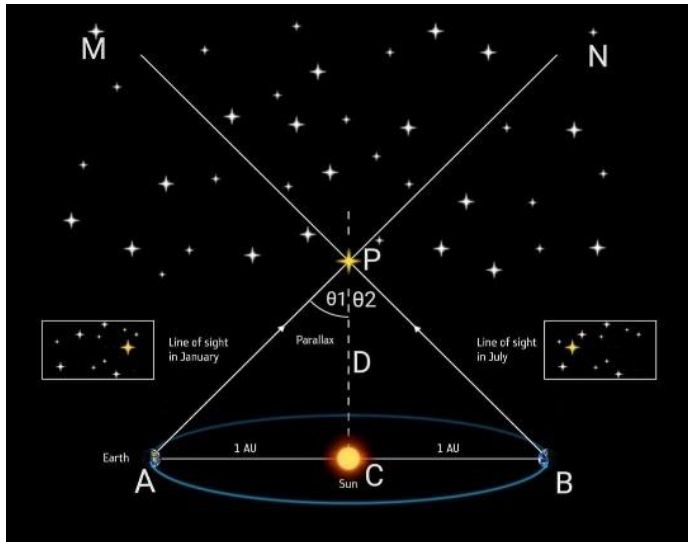
– নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের পৃথিবীর অবস্থান এবং মূল নক্ষত্রের পেছনের নক্ষত্রের মাধ্যমে আমাদের অবস্থান, সূর্য ও ওই তারার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করতে পারব। লক্ষ কর, আমাদের পৃথিবী জানুয়ারি মাসে কক্ষপথের যেখানে অবস্থান করে, জুলাই মাসে অবস্থান করে ঠিক তার বিপরীতে। আমরা আমাদের দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব জানি। আর মূল নক্ষত্রের পেছনে অবস্থিত নক্ষত্র এবং আমাদের অবস্থানের মাধ্যমে কোণ নির্ণয় করতে পারি। এখন তুই মূল নক্ষত্র এবং আমাদের সূর্যের মধ্যে একটা রেখা কল্পনা কর। সেই সাথে পৃথিবীর দুই অবস্থান থেকে ওই তারা পর্যন্ত দুটো রেখা কল্পনা কর যেন এগুলো বর্ধিত করলে ব্যাকগ্রাউন্ড তারা দুটোকে রেখা দুটো ছেদ করে। এখন এই অবস্থানগুলোর নাম দিই। (আবারও নিচের চিত্র দ্রষ্টব্য)
তাহলে, পৃথিবীর দুই অবস্থানের মধ্যে দূরত্ব AB (যা আমরা জানি), দূরবর্তী তারার অবস্থান P, সূর্যের অবস্থান C এবং PC = D। মূল তারার পেছনের তারা M ও N এবং আমাদের অবস্থান A ও B এর মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অবস্থান, সূর্য এবং তারার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করতে পারি। A, P, C এবং N এর মাধ্যমে $<APC = \theta1$ এবং B, P ,C এবং M এর মাধ্যমে $<BPC = \theta2$ নির্ণয় করতে পারব।
তাহলে
$<APB, \theta = \theta1\theta2$
তাহলে, ত্রিভুজ ABP এ, আমরা জানি,
$\theta = AB/AP$
কিন্তু $AP \approx D$
সুতরাং, $\theta = AB/D$
বা, $D = AB/\theta$
– ওয়াহ! এটা আসলেই চমৎকার ছিল।
– প্যারালাক্সের মাধ্যমে সবচেয়ে সহজে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়, তাই এটা তোকে বললাম। এছাড়া আরও অনেক পদ্ধতি আছে। তবে প্যারালাক্সের মাধ্যমে কয়েকশ আলোকবর্ষ পর্যন্ত বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা গেলেও তার বেশি হলে অঙ্ক করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
আর সেই সাথে আমাদের গল্প শেষ।
– ওয়াও! থ্যাঙ্কস ম্যান!

– উফ, অনেক জ্ঞান ঝাড়লাম। বিদায় বন্ধু। আমাদের আর দেখা হচ্ছে না। তোর সাথে সময়টা দারুণ কেটেছে।

– মানে? কী বলতে চাচ্ছিস ...

রেজা ঘুম থেকে ওঠে। গত ৯ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন তার স্বপ্নে আজমান নামক সমবয়সী এক ছেলে এসে যত্তসব জ্ঞান ঝাড়ছে। জ্ঞানার্জন করতে মন্দ লাগে না ওর। কিন্তু ঘুম থেকে উঠলেই আজমানের চেহারা মনে করতে পারে না রেজা। শুধু মনে থাকে সে সমবয়সী।

তাই রেজার মেজাজ বিগড়ে গেছে।

রেজা দাঁত ব্রাশ করতে করতে টিভির সামনে এসে বসে। টিভিতে আজকে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। সে দাবি করছে সে একটা UFO দেখেছে। ৯২ দিন আগে একবার দেখেছিল এবং আজকেও নাকি ভোর ৪:০০ টায় দেখেছে।

'যত্তসব ছাগল' বলে পুরো জিনিসটাকে উড়িয়ে দিয়ে রেজা উঠে পড়ল মুখ ধুতে।

ধূমকেতুতে অবতরণ

মাশরুর মুহিত

ধূমকেতু পৃথিবীর আকাশের অতিথি। আমাদের চৌকাঠে এদের কালেভদ্রে দেখা যায়। এদের নিয়ে কতই না জল্পনা-কল্পনা। এর যে বেয়াড়া ছেলের ঝাঁকড়া চুলের মতো লেজ সেটা নিয়ে মানুষের কী অসীম কৌতূহলই না ছিল। শেষমেশ কিনা এই মহাজাগতিক অতিথির নামই দিয়ে দিলো 'ঝাঁকড়া-চুলো'। ধূমকেতুর ইংরেজি comet যা কিনা গ্রিক শব্দ κομήτης থেকে উদ্ভূত। আর গ্রিক κομήτης অর্থ ঝাঁকড়া-চুলো। ধূমকেতু নিয়ে কৌতূহল বিজ্ঞানীদের বরাবরই। এমনকি পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির অনেকগুলো মডেলের মধ্যেও আছে যে ধূমকেতু দিয়ে বয়ে আনা বহির্জাগতিক কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড-ই (প্রোটিনের মূল উপাদান) হয়তো প্রাণ সূচনা করে এই আমাদের গ্রহে। আবার ধারণা করা হয়, পৃথিবীর এত পানিও হয়তো ধূমকেতুদেরই অবদান। তাই ধূমকেতুকে জানা প্রয়োজন। ধূমকেতুর রাসায়নিক গঠন, তার পানির গঠন ইত্যাদি।

এর জন্যই প্রয়োজন 'ধূমকেতু'তে নেমে পর্যবেক্ষণ করা।

সাল ২০০৪।

এর আগে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পিছিয়ে গেছে রকেট নিক্ষেপণ। অবশেষে মার্চের ২ তারিখে ইউরোপিয়ান স্পেইস এজেন্সি (ESA) এর ফ্রান্সের গুয়েনা স্পেইস সেন্টার থেকে সফলভাবে নিক্ষেপ করা হয় Ariane 5 রকেট। রকেটে পাঠানো হয় রোজেটা নামক স্পেইসপ্রোব। লক্ষ্য একটি ধূমকেতু।

Rosetta নিক্ষেপণ করা হয় যে ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণের জন্য, তার নাম Churyumov–Gerasimenko। ধূমকেতুটির এরকম

নামকরণ করা হয় ১৯৬৯ সালে এই ধূমকেতুটির আবিষ্কারকগণ, দুই রুশ জ্যোতির্বিদের নামে। এই ধূমকেতুটিকে ছোটো করে ডাকতে চাইলে বলতে পারেন 67P। এটি একটি স্বল্পমেয়াদি ধূমকেতু। যেসকল ধূমকেতু সূর্যকে একটি ফোকাসে রেখে স্বল্প পর্যায়কালে প্রদক্ষিণ করে তাদেরকে স্বল্পমেয়াদি ধূমকেতু বলে। সাধারণত এদের পর্যায়কাল ২০ বছরের কম। ধূমকেতু 67P একটি স্বল্পমেয়াদি ধূমকেতু, এর পর্যায়কাল ৬.৫৯ বছর।

রোজেটা (Rosetta) শুধু একা যায়নি, সাথে করে নিয়ে গিয়েছে ল্যান্ডার 'ফাইলি' (Philae)। ফাইলির মাতৃযান রোজেটা এটিকে ১০ বছর বহন করেছিল নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত। এদের নামের দিকে তাকান। এদের নামকরণটা বেশ ইন্টারেস্টিং। ESA এই মিশনের প্রায় প্রতিটা নাম নিয়েছে প্রাচীন মিশর থেকে। Rosetta মিশরের একটা শহরের নাম (বর্তমানে রশিদ) যেখান থেকেই প্রথম প্রাচীন মিশরের হায়ারোগ্লিফিক লিখন, গ্রিক ভাষায় লিখিত পাথর ও ডেমোটিক নামে আরেকটি লেখা পাওয়া যায়। আর এসব লেখার তুলনা করেই হায়ারোগ্লিফিকের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঠিক তেমনইভাবে এই মিশনের উদ্দেশ্যও ধূমকেতুর অর্থ উদ্ধার। তাই এহেন নামকরণ।

আর ধূমকেতুর পৃষ্ঠে অবতরণকারী ফাইলির নামকরণেও জড়িয়ে আছে মিশরের ইতিহাস। ফাইলি (Philae) শব্দটি বহুবচন। ফাইলি হলো মিশরের নীল নদের একটি বা দুটি ছোটো দ্বীপ যেখানে প্রাচীন মিশরের বেশ কিছু মন্দির ছিল।

'ফাইলি' কমেট 67P এর যে স্থানে নামবে বলে প্ল্যান করা হয়েছিল সেটির নাম 'আগিলিকি'। আগিলিকি মিশরের আরেকটি দ্বীপ যেখানে ফাইলি দ্বীপের স্থাপনাগুলোকে নীল নদের ওপর বাঁধ দেওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

এসব নামকরণ করার উদ্দেশ্য একটাই : ধূমকেতুর ভেতর সেই সৌরজগৎ সৃষ্টিরও আগের উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের দ্বার উন্মোচন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ধূমকেতু গঠনকারী পদার্থ সৌরজগতের সবচেয়ে আদিম পদার্থ (primordial material) যা কিনা দূরের ওই ধূমকেতুর মাঝে এখনও সংরক্ষিত আছে।

পরবর্তীতে আমরা দেখব কতটুকু সফল হয়েছিল এই মিশন।

নভেম্বর ১২, ২০১৪। সকাল ৮টা ৩৫ মিনিট GMT (Greenwich Mean Time)। বাংলাদেশের ঘড়িতে দুপুর ২টা ৩৫ মিনিট। ল্যান্ডার ফাইলিকে মাতৃযান রোজেটা থেকে মুক্ত করা হয় ল্যান্ডিংয়ের জন্য। রোজেটা বহনকারী রকেট নিক্ষেপ করা হয় ২০০৪ সালে। আর ফাইলিকে রোজেটা থেকে প্রায় ১০ বছর পর মুক্ত করা হয় ধূমকেতুতে অবতরণের জন্য। এই ১০ বছর সময়ে রোজেটা বেশ কয়েকবার ফ্লাইবাই করে ধূমকেতুর কাছাকাছি পৌঁছে।

ধূমকেতু 67P এর অবস্থান পৃথিবী থেকে মঙ্গলের কক্ষপথ ছাড়িয়ে প্রায় 500 মিলিয়ন কিলোমিটার। ২০০৪ এর ২ মার্চ নিক্ষেপণের পর পৃথিবীর গ্র্যাভিটির অ্যাসিস্টে ২০০৫ সালের ৪ মার্চ প্রথম ফ্লাইবাই করে। এরপর ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারিতে মঙ্গলকে এবং নভেম্বরে আবার পৃথিবীকে ফ্লাইবাই করে। এর ৫ বছর পর রোজেটা অ্যাস্টরয়েড বেল্ট অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় স্পিড অর্জন করে এবং ২০১২ সালে এটি হাইবারনেশনে চলে যায়। এটি পাওয়ার ডাউন করে দেয় এনার্জি বাঁচানোর জন্য। প্রসঙ্গত, রোজেটার পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে এর ফোল্ডেড সোলার প্যানেল যেটা প্রায় ৬৯০ বর্গফুট। দুই বছর হাইবারনেশনে থেকে অবশেষে প্রি-প্রোগ্রামড অ্যালার্ম ক্লক জাগিয়ে তোলে রোজেটাকে। ২০১৪ সালে রোজেটা জার্মানির ডার্মাস্টাডে সিগন্যাল পাঠায়। এই স্মরণীয় ঘটনা @ESA_Rosetta এই টুইটার অ্যাকাউন্টে টুইট করে জানিয়ে দেয় বিশ্ববাসীকে: "Hello, World!" অবশেষে সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে রোজেটা ধূমকেতুর চারপাশের নির্দিষ্ট কক্ষপথে যায়। নভেম্বরের ১২ তারিখে নিক্ষেপ করা হয়।

ধূমকেতুতে ফাইলির অবতরণ:

আগিলিকি। এখানেই নামবে ফাইলি। সেই উদ্দেশ্যে মুক্ত করে দেওয়া হয় ফাইলিকে রোজেটা থেকে। ফাইলিকে প্রায় ২২ কিলোমিটার ওপর থেকে ছাড়া হয়। আর ফাইলি 67P ধূমকেতুতে

অবতরণ করেছে তা জানতে সময় লাগে ৭ ঘণ্টারও বেশি; যা কিনা প্রয়োজনীয় সময়ের থেকে অনেক বেশি।

ফাইলি ধূমকেতুতে যখন অবতরণ করে, একদম যখন ধূমকেতুর বুকে অবতরণের মুহূর্তে থাকে, তখন ফাইলির বেগ কমিয়ে ৩.৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় আনা হয়েছিল। অর্থাৎ, ফাইলি সেকেন্ডে মাত্র ১ মিটার বেগে ধূমকেতুর বুকে আছড়ে পরে। এরকম বেগ কমানোর কারণ আছে। 67P ধূমকেতুটি দেখতে অনিয়তাকার, অনেকটা রাবারের খেলনা হাঁসগুলোর মতো। আকারে আগা-মাথা মিলিয়ে প্রায় ৬ কিলোমিটার। যার কারণে এর পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক অনেক কম। পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১০,০০০ গুণ কম। তাই অনেক বেশি বেগে কোনো বস্তু আঘাত করলে সেটার ওই ধূমকেতুর মাধ্যাকর্ষণকে কাঁচকলা দেখিয়ে আবার মহাকাশে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যেই কথা সেই কাজ।

সেকেন্ডে মাত্র ১ মিটার বেগে ল্যান্ডিং করেও সফল হলো না ফাইলি। যদিও ফাইলির সাথে হারপুন ছিল যেটা দিয়ে কিনা ফাইলিকে বেঁধে রাখা যাবে 67P ধূমকেতুতে। কিন্তু হারপুন কাজ করল না। ফলে ফাইলি আবার মহাকাশে যেতে লাগল। কিন্তু ধূমকেতুর অল্প হলেও যে আকর্ষণ, সেটার টানেই আবার ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসে ফাইলি ধূমকেতুর ওপর । পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কোনো বস্তু অবতরণ করল ধূমকেতুর ওপর।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। ফাইলি ল্যান্ডিং করল এমন এক জায়গায় যেখানে কিনা সূর্যের আলো খুব অল্প সময়ের জন্য পড়ে। ফলে ফাইলি নীরব হয়ে যায়। সোলার প্যানেলগুলো আলো না পেয়ে ফাইলির ব্যাটারিগুলোর রিচার্জ হচ্ছিল না। যে পরিমাণ চার্জ ছিল, তা দিয়ে বড়োজোর 48 ঘণ্টা সচল থাকতে পারে ফাইলি।

ফাইলির কাজ ছিল ধূমকেতুটির ধুলা, পানি ইত্যাদির রাসায়নিক গঠন বের করা এবং 'CONSERT' (Comet Nucleus Sounding Experiment by Radioactive Transmission) দিয়ে স্ক্যান করা।

তবে কি মিশন আনসাকসেসফুল?

– না।

এর মধ্যে ধূমকেতু এর পেরিহেলিওন (perihelion)-এ পৌঁছায়। ধূমকেতু যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে তখনকার অবস্থানকে পেরিহেলিওন বা অনুসূর বলে। ২০১৫ সালের আগস্টে পেরিহেলিওনে পৌঁছানোর আগেই জুনের মাঝামাঝিতে ফাইলি কিছুটা সূর্যের আলো পায় এবং জেগে ওঠে। এটি তখন স্ক্যান করে তথ্য রোজেটাকে পাঠানো শুরু করে। জুলাইয়ের প্রথম দিকে এটি আবার নীরব হয়ে পড়ে।

আগস্টে পেরিহেলিওনে পৌঁছানোর পর থেকে রোজেটার সোলার প্যানেল ক্রমশ কম আলো পেতে থাকে। অবশেষে রোজেটাকে নির্দেশ দেওয়া হয় তার অন্তিম পরিণতির। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে নিয়ন্ত্রিত ক্র্যাশ-ল্যান্ডিং করতে বলা হয় রোজেটাকে। রোজেটা মারা যাওয়ার আগ-মুহূর্ত অবধি তথ্য প্রেরণ করে গেছে, এমনকি সংঘর্ষের সময়কার তথ্যও প্রেরণ করেছে।

এরই মধ্যে ভাগ্যক্রমে ২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর, OSIRIS ক্যামেরাতে ধরা পরে ফাইলি। এর ফলে বিজ্ঞানীরা একদম নিশ্চিতভাবে জানতে পারল, কোথা থেকে ফাইলি তাদের তথ্যগুলো প্রেরণ করেছে।

মিশনের ফলাফল:
ফাইলির পাঠানো তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, ধূমকেতুর পৃথিবীতে জীবন বয়ে আনার সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও অনেক কার্বন-সমৃদ্ধ যৌগ পাওয়া গেছে কিন্তু প্রাণের প্রাণ-ভোমরা যে অ্যামিনো অ্যাসিড সেটি মাত্র একটি পাওয়া গেছে, কোনো প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA/RNA) পাওয়া যায়নি।

আর পৃথিবীর এত পানির কথা যদি বলতে হয় তাহলে ধূমকেতুকে দায়ী করে লাভ হবে না। কেননা ধূমকেতুর পানি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে ধূমকেতুর পানিতে ভারী হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি। পানিতে ডিউটেরিয়ামের উপস্থিতি প্রমাণ করে পৃথিবীর পানি ওইসব ধূমকেতু থেকে আসেনি। এই প্রথম বিজ্ঞানীরা একদম নিশ্চিতভাবে বলতে পারলেন এসব।

ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ টাইমলাইন:
•১৯৭৮ সালে এক্সপ্লোরার-৩ (ISEE-3) নামক প্রথম একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় সূর্যকে মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য। কিন্তু ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক এক্সপ্লোরার মিশন পাল্টে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সালে এই উপগ্রহকে ধূমকেতু গিয়াকোবিনি-জিনিয়ারকে পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়।
•১৯৮৬ সালে ইউরোপীয় স্পেইস এজেন্সি গিয়ত্তো (Giotto) মিশন পরিচালনা করেছিল একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্য।
•১৯৯৯ সালে স্টার ডাস্ট মিশন। শুরুতে এ নাম না থাকলেও ২০০৬ সালে এই স্টার ডাস্ট নাম দেওয়া হয়।
•২০০৪ এ পর্যবেক্ষণ করা হয় ধূমকেতু ওয়াইল্ড-২ -কে এবং দুই বছর পরে এই ধূমকেতু থেকে প্রাপ্ত নমুনা নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
•২০০৫ এর মধ্যভাগে মহাকাশযান ডিপ ইম্প্যাক্ট থেকে একটি গোলাকার ধাতব বস্তু প্রচণ্ড জোরে ছুড়ে মারা হয় ধূমকেতু টেম্পেল-১ এর কোমায় (ধূমকেতু যখন সূর্যের খুব কাছে চলে আসে তখন এর নিউক্লিয়াসের পানি ও উদ্বায়ী পদার্থগুলো বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এর ফলে একটা গ্যাসীয় আবরণের সৃষ্টি হয়। এটিকে কোমা বলে।)
এইভাবে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ মিশনের শুরু এবং এগিয়ে চলা।
অবশেষে রোজেটা মিশনের মাধ্যমে আমরা ধূমকেতুর ওপর নামতে সক্ষম হয়েছি।
মানুষ যদি মহাকাশ জয় করার স্বপ্ন না দেখত, ধূমকেতুর ওপর অবতরণ করার স্বপ্ন না দেখত, তাহলে এসব কিছুই সম্ভব হতো না। অনেক অজানা রয়ে যেত অজানাই।
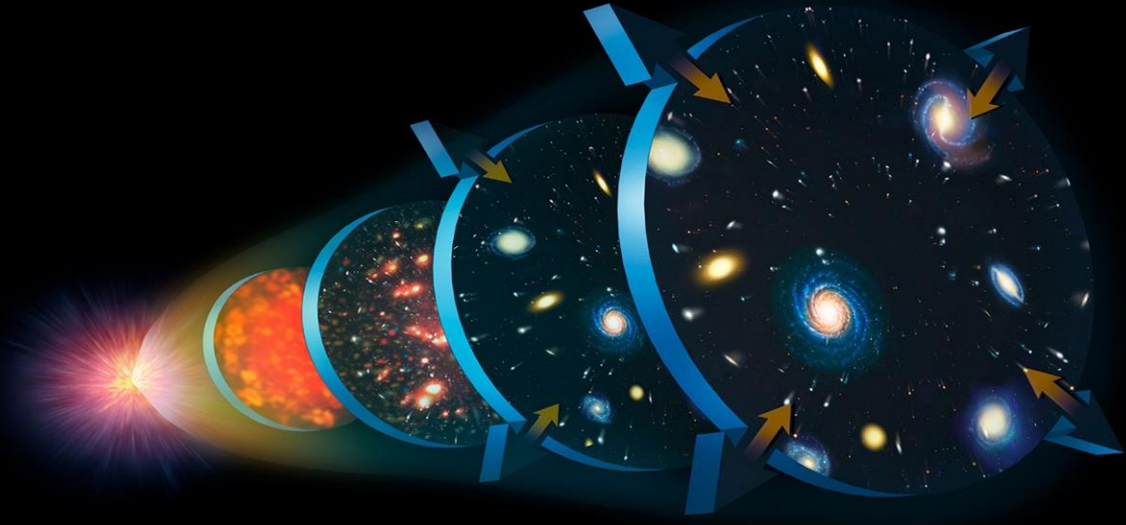
মহাবিশ্বের বয়স

মুস্তফা কামাল জাবেদ

মহাবিশ্বের বয়স মূলত দুইভাবে নির্ণয় করা হয়।
১.সবচেয়ে পুরোনো তারার বয়স নির্ধারণের মাধ্যমে।
২.মহাবিশ্ব প্রসারণের গতি ব্যবহার করে।

তো আমরা আজকে দুটো নিয়েই আলোচনা করবো।

তারার মাধ্যমে:
এক্ষেত্রে গ্লবিউলার ক্লাস্টারকে ধন্যবাদ দিতে হয়।
গ্লবিউলার ক্লাস্টার কী?

গ্লবিউলার ক্লাস্টার হলো একই জায়গায় মিলেমিশে সুখী পরিবারের মতো বাস করা অনেকগুলো তারা। অনেকগুলো বলতে কি ১০-১২টা?
না, মিলিয়নের মতো তারা নিয়ে একেকটা ক্লাস্টার গঠিত হয়। ১০-১২ এই নাম্বারটা তাদের কাছে নগন্য!
মনে করুন, আমরা ক্লাস্টারের সেন্টারে আছি। আমাদের সবচেয়ে কাছের তারা কোনটা? (সূর্য বাদে!)
প্রক্সিমা সেন্টোরাই।
তো, তখন এই প্রক্সিমা সেন্টোরাই চেয়েও অনেক কাছে আরও হাজারটা তারা থাকত।

থাক সে কথা, তারাদের কথায় আসি। তারার আয়ু মূলত তার ভরের ওপর নির্ভর করে।
যত বেশি ভর, তত আয়ু কম।
মোটাসোটা, ভুঁড়ি বেশি, খায়ও বেশি, তাই জ্বালানি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।
সূর্যের অর্ধেক ভুঁড়ির তারা ২০ বিলিয়ন বছর বাঁচবে।
সূর্যের মতো একটা তারা প্রায় ৯ বিলিয়ন, এর দ্বিগুণ হলে ৮০০ মিলিয়ন। আর দশগুণ হলে?
কী মনে হয়?
কমতে কমতে একেবারে ২০ মিলিয়ন।
ইশ! মোটা তারাদের জীবনটা বড়োই দুঃখের।
থাক, আফসোস করতে হবে না। আয়ু কম হলেও তারা যত ভারী হবে, তাদের উজ্জ্বলতাও তাল মিলিয়ে বাড়বে, তাদের জীবন তত বৈচিত্র্যময় হবে।
একটা ক্লাস্টারের সবগুলো তারা প্রায় একই সময়ে ফর্ম করে। আর তারার উজ্জ্বলতা, ভর এইসব সূর্যের সাথে তুলনা করে তারাগুলোর বয়স নির্ধারণ করা হয়।
একটা ক্লাস্টারের তারা যদি সূর্যের চেয়ে প্রায় ৬,০০০ গুণ উজ্জ্বল হয় তাহলে এর ভর হবে প্রায় ১০ গুণ। এর সাথে বয়স প্রায় ২০ মিলিয়ন।
তো, সবচেয়ে পুরোনো যে ক্লাস্টার, তার তারার ভর সূর্যের ০.৭ গুণ।
ক্যুল! তাহলে এর বয়স হবে ১১ থেকে ১৪ বিলিয়ন বছর।
WMAP এর তথ্য অনুযায়ী, এই তারাগুলো তৈরি হয়েছিল মহাবিশ্ব তৈরির প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর পর।
তাহলে বলুন তো মহাবিশ্বের বয়স কত?

মহাবিশ্বেরর প্রসারণের হিসাব থেকে:

১৯২৫ সাল।
পাইপমুখে জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল পায়চারি করছেন। তাঁর মাথায় ঘূর্ণিঝড় বয়ে চলেছে। মহাবিশ্ব আসলেই প্রসারিত হচ্ছে। আইনস্টাইন আঙ্কেলকে আবার সূত্র ঠিক করতে হবে!
মহাবিশ্বের এই প্রসারণটা কত দ্রুত সেটাকেই বলে হাবল কনস্ট্যান্ট। এইটাকে প্রকাশ করা হয় H_0 দিয়ে।
মহাবিশ্ব যখন গঠিত হচ্ছিল, তখন যে মুক্ত ফোটনগুলো ছিল মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে এগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা পেনসিল ঠুকে হিসেব কষে দেখেছেন, এগুলো এখন মাইক্রোওয়েভে পরিণত হয়েছে । এইটাকে বলা হয় কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, সংক্ষেপে CMBR।
COBE, WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), ইউরোপিয়ান স্পেইস এজেন্সির Planck আওতাধীন প্রজেক্টগুলোর মাধ্যমে CMBR ডিটেক্ট করে মহাবিশ্ব কত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে সেটা বের করা যায়। যাক সে কথা। তো তারপর বিজ্ঞানীরা ঘড়িটাকে উলটা দিকে চালাতে শুরু করেন। অনেকক্ষণ রোলার ঘোরানোর পর আসে বিগ ব্যাং!
২০১২ সালের WMAP এর হিসাব অনুযায়ী, মহাবিশ্বের বয়স হলো ১৩.৭৭২ বিলিয়ন বছর।
আর ২০১৩ সালের Planck মহাকাশ মানমন্দিরের মতে, এই সংখ্যা ১৩.৮২ বিলিয়ন। আর এইটাই এখন পর্যন্ত পাওয়া সঠিক হিসাব।
হাবল কনস্ট্যান্টকে আরও পারফেক্ট করা নাসার

স্পিটজার স্পেইস-টেলিস্কোপ এর প্রধান Wendy Freedman এর ভাষায়,
"কয়েক দশক আগেও একই বাক্যে 'precision' আর 'cosmology' ব্যবহার অসম্ভব ছিলো, এবং মহাবিশ্বের আকার ও বয়সের ক্ষেত্রে দু-একই ব্যাপার ব্যাতীত ভাল ভাবে জানা ছিলো না। আর এখন আমরা কয়েক শতাংশের নির্ভলতার হিসাব করছি। এটা বেশ অসাধারণ একটি ব্যাপার"
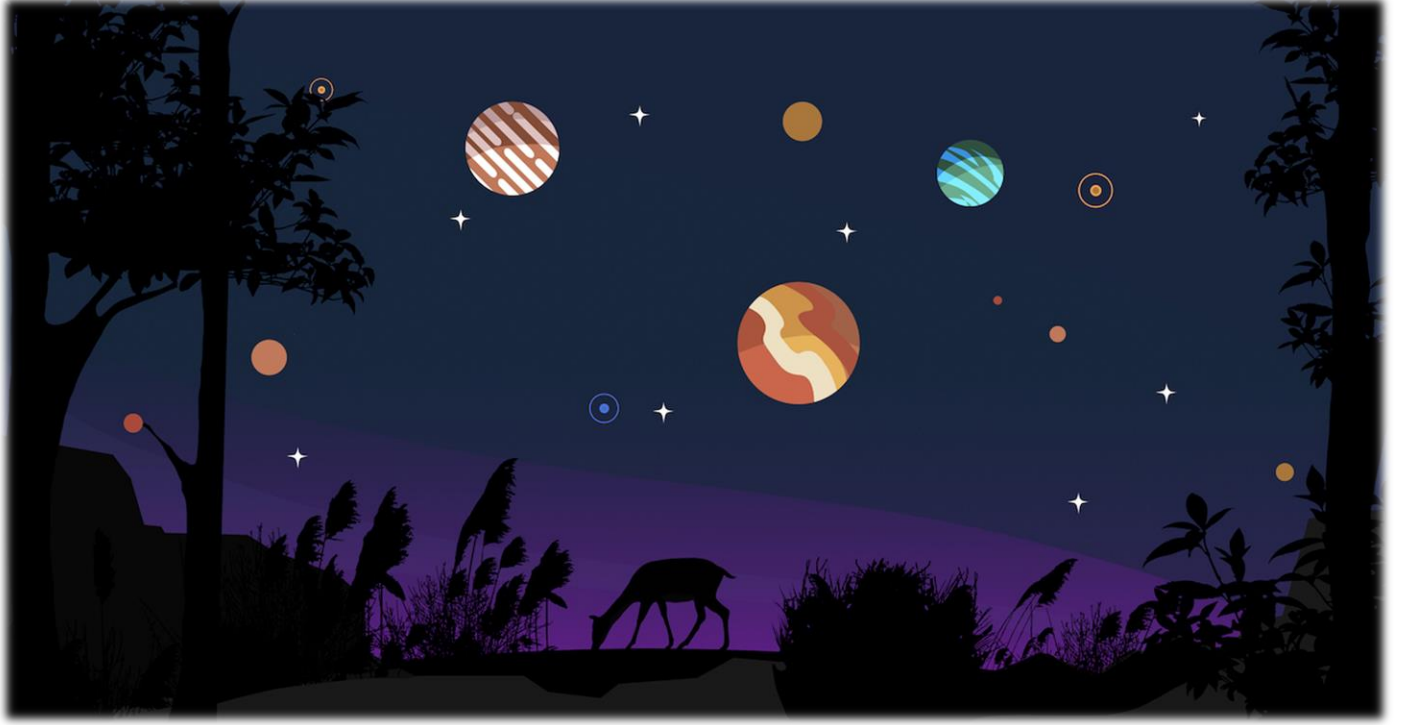
অভিযাত্রা: জীবনের খোঁজে

মনিফ শাহ চৌধুরী

১.

ও হ্যালো!

গোলাপি আলোর মাঝে টানা চার মাস খাটুনির পর *Oryza sativa* চারা ভর্তি বীজ নিয়ে হাসি দিলে আমার অন্তরে যেমন প্রশান্তি আসে, ঠিক তেমন প্রশান্তির হাওয়া বয়ে যাক আপনার অন্তরেও।

আমার কথা মনে আছে? চাষার ছেলে, মহাশূন্যে চাষবাস করি, ঠিক চিনেছেন। আমি অভি এবং এই মুহূর্তে চাষবাস থেকে অনেক দূরে।

ছয়টি X5 Ion Engine আমার স্পেইসশিপকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে ঘণ্টায় নয় লাখ কিলোমিটার গতিতে বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পুরো ভ্রমণে সময় লাগার কথা ৩৬ দিন।

রেফ্রিজারেটর ভর্তি কয়েকশ কেজি Algae নিয়ে আমার এবারের মিশন ইউরোপাতে গিয়ে এগুলো বাঁচতে পারে কি না তা দেখা এবং একটা বেইজ তৈরি করে ফেলা যেখানে চাষ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে সেখানে কিছু ডিনামাইট সেট করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসা।

ভাবছেন বোমার প্রয়োজন পড়ছে কেন? ব্যাপারটা আমারও পছন্দ না, কিন্তু একদল নীরস বিজ্ঞানীর মতে ইউরোপার বরফের

আস্তরণের নিচে প্রাণ থাকতেও পারে। সেটা দেখতেই আমাকে পাঠানো। হাতের কাছে চাঁদ পেয়ে গেলে কার ধৈর্য সয়?

এই যে পৃথিবীর বাইরে প্রাণ থাকতে পারে, এই চিন্তাটা কেমন লাগে আপনার কাছে? বা কখনো কি ভেবেছেন বিজ্ঞানীরা কী করে ঠিক করে যে কোন গ্রহে প্রাণ থাকতে পারে? আসলে প্রাণের সংজ্ঞাটাই-বা কী?

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব প্রাণ হলো এমন এক বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা কোনো কিছু নিজের প্রায় নিখুঁত রেপ্লিকা তৈরি করে। হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা খাদ্য গ্রহণ করবে, বর্জ্য নিষ্কাশন করবে বা নড়াচড়া করবে। কিন্তু এ সবই মূলত নিজের রেপ্লিকা তৈরি করার জন্য অপরিহার্য কিছু বিষয়।

সবচেয়ে সাধারণ প্রাণ তৈরি হওয়ার জন্য যেসব উপাদান বা আবহাওয়া প্রয়োজন সেগুলো আমাদের পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও কি থাকতে পারে না? স্রেফ আমাদের আকাশগঙ্গাতেই তো একশ বিলিয়ন গ্রহ থাকার কথা। এর মাঝে মাত্র কয়েক হাজারটার মাঝে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে এমন ধারণা করা কি ভুল?

আমি যখন নীরস, নিষ্প্রাণ মঙ্গলের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছি, আমি এর মরিচারঙা মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবি একসময় এই গ্রহেও পানি ছিল, হয়তো নিজস্ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড ছিল। যে গ্রহে প্রাণ প্রস্ফুটিত হতে পারত তা এমন নির্জন কেন?
প্রিয় সহযাত্রী, আমার জীবনের খোঁজে অভিযাত্রার একঘেয়েমি কাটাতে মহাকাশে প্রাণের সন্ধান কীভাবে করা হয় তা নিয়েই বকবক করে যাব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুরোটা শুনতে হচ্ছে আপনাকে, নয়তো যে-কোনো সময়ই এয়ারলক উইন্ডো থেকে লাফ দিতে পারেন। ইয়োর চয়েজ!

শুরু করা যাক।

২.
একটা গ্রহে প্রাণ থাকবে কী থাকবে না তা নির্ভর করে এর অবস্থানের ওপর। তার নক্ষত্র থেকে এটা কতটুকু দূরে, বা এর গতি কীরকম ইত্যাদি বিষয়। আমাদের গ্রহ হ্যাবিটেবল জোনে রয়েছে। অর্থাৎ, সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবী এতটাও কাছে নয় যে তরল পানি তৈরিই হবে না, আবার এতটাও দূরে নয় যে সব পানি বরফ হয়ে থাকবে। একটা আরামদায়ক, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে থাকার কারণে এর উপরিভাগে তরল পানি টিকে রয়েছে।
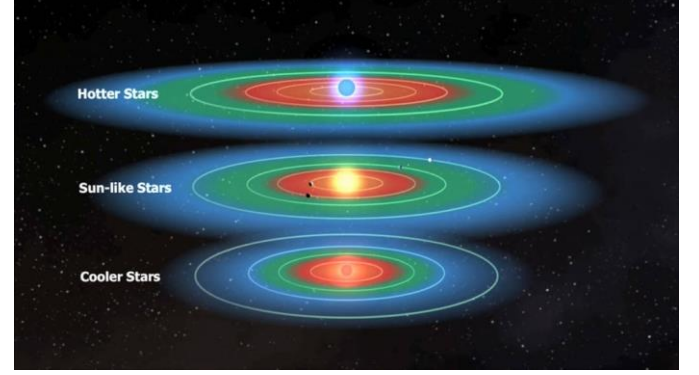
আমাদের সৌরজগৎ-এর হ্যাবিটেবল জোনে কিন্তু মঙ্গল গ্রহও আছে। তাই এর উপরিভাগে যে পানি তৈরি হতে পারে তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। নাসার তরফ থেকে হওয়া বিভিন্ন মিশনে মঙ্গলে একসময় নদী, খাল এমনকি সমুদ্র থাকার প্রমাণও মিলেছে।

হ্যাবিটেবল জোন একেক নক্ষত্রের জন্য আলাদা। আমাদের সূর্যের থেকে বিশাল বড়ো নক্ষত্রগুলোর হ্যাবিটেবল জোন সেই নক্ষত্র থেকে অনেক দূরে। এসব নক্ষত্র থেকে পাওয়া এনার্জির তীব্রতা অনেক বেশি হয়। আর জীবন ধারণের জন্য অবশ্যই এনার্জি প্রয়োজন। সমস্যা হলো, এসব নক্ষত্রের বয়স অনেক অল্প হয়ে থাকে। এত বেশি পরিমাণে এনার্জি ছেড়ে কিছু দিন গর্জন করে মাত্র কয়েকশ মিলিয়ন বছর পরেই জ্বালানি শেষ করে বসে থাকে। কয়েকশ মিলিয়ন বছর আপনার কাছে অনেক মনে হলেও জীবন সৃষ্টি এবং বিবর্তনের জন্য খুবই নগণ্য একটা পরিমাণ অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্টদের কাছে।

পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। বয়স কত হবে? সাড়ে চার বিলিয়ন বছর। আর মাল্টিসেলুলার বা বহুকোষী প্রাণ কবে এসেছে? মাত্র ছয়শ মিলিয়ন বছর আগে। যদিও কিছু প্রমাণ রয়েছে যে দেড় বিলিয়ন বছর আগেও বহুকোষী প্রাণ ছিল, সেসব সত্য ধরে নিলেও পৃথিবীর সাড়ে তিন বিলিয়ন বছরের মতো সময় লেগেছে উল্লেখযোগ্য বহুকোষী প্রাণ বিবর্তিত করতে।

তাহলে এত সময় কোন গ্রহ পাচ্ছে?

কম ভরের যে নক্ষত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল বেশি। তার অন্যতম কারণ হলো এসব নক্ষত্রের এনার্জি এমিশন যদিও অনেক অনেক কম, তাও সেগুলোর বয়স অনেক হয়ে থাকে। এদের জ্বালানি ফুরোতে ট্রিলিয়ন বছরও লাগতে পারে। অর্থাৎ, এদের গ্রহ, যেগুলো হ্যাবিটেবল জোনে আছে, সেগুলো অনেক সময় পায় প্রাণ সৃষ্টি ও বিবর্তনের জন্য।
এ ধরনের গ্রহের অবস্থান নক্ষত্রের অনেক কাছে হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময়ই এরা টাইডাল লক-এ আটকে পড়ে। অর্থাৎ, এদের একপাশ সবসময় নক্ষত্রের দিকে থাকে, আরেক পাশ অন্ধকারের পানে। সেই হিসেবে এক পাশ অত্যধিক গরম, আরেকপাশ অত্যধিক ঠান্ডা হওয়ার কথা। কিন্তু পানি কিছুটা বাষ্পীভূত হয়ে পুরো গ্রহে ছড়িয়ে পড়লে একটা গ্যাসীয় আবরণ তৈরি করবে। আর পানির গ্রিনহাউজ বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রহের ঠান্ডা অংশেও তাপ ধরে রাখা সম্ভব হবে। তাই অত্যধিক ঠান্ডা অঞ্চল এতটাও ঠান্ডা হবে না। আর গরম অংশেও সরাসরি বামন সূর্যের আলো পড়বে না। আর গ্যাসীয় আবরণ থাকার ফলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যথেষ্ট থাকবে পানিকে তরলাবস্থায় রাখার জন্য। চাপ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলেই আবার ফিরে তাকান। ওখানে এখন পানি রাখলে সাথে সাথে বাষ্পীভূত হবে। এর বায়ুমণ্ডল এতটাই পাতলা। তাই ঘন বায়ুমণ্ডল থাকলে জীবন ধারণের প্রথম চেকলিস্টে এসব গ্রহ উত্তীর্ণ হয়ে যায় সহজেই।

বায়ুমণ্ডল তো স্রেফ তৈরি হলেই হবে না। গ্রহের ভর এমন হতে হবে যাতে এর মাধ্যাকর্ষণ এটাকে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল আগে বেশ ঘন ছিল, তাই এর উপরিভাগে তরল পানি ছিল। কিন্তু এর কম ভর হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়।

তাই কোনো গ্রহে প্রাণ থাকতে পারে কী পারে না, সেটা বোঝার জন্য গ্রহের অবস্থান এবং ভর জানা খুব প্রয়োজন।

কী ভাবছেন, বকবকানি শেষ? শুরুই তো করলাম না।

৩.

আমার পাইলট সিটের ডান পাশে সপ্তর্ষীমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো পৃথিবী থেকে আমি কখনও এটা দেখিনি। আলোকদূষণকে দুষে লাভ নেই, বরং আমারই আগ্রহ ছিল না কখনো। আমার চিন্তা-ভাবনা সব ছিল নিজ গ্রহকে আরও বাসযোগ্য করে তোলা নিয়ে। ISS এ বোটানিস্ট হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্য আমার কখনোই এটা ছিল না যে, একসময় মঙ্গলের বুকে সূর্যমুখীর হাসি দেখব কিংবা অ্যান্ড্রোমিডার কোনো গ্রহের বাতাসে ভাসবে কাশফুলের বীজ। না, বরং আমার চেষ্টা ছিল কীভাবে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার যোগ্য করা যায় উদ্ভিদগুলোকে যাতে তারা আমাদেরই অসুস্থ পৃথিবী মায়ের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারে।

আর তাই, দূর হতে নক্ষত্ররাজির আলো আমার জানালার কাচে বিচ্ছুরিত হতে দেখে খেয়াল হলো, কোটি প্রাণের স্পন্দন এর জন্য আলোকে আমরা একটু বেশিই কৃতিত্ব দিয়ে ফেলি না? প্রাণের সৃষ্টির এবং টিকে থাকার জন্য কি আসলেও আলোর প্রয়োজন আছে?

প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করি। প্রাণের বিকাশের জন্য যে অপরিহার্য এনার্জি সাপ্লাই প্রয়োজন সেটা কি শুধু আলো থেকেই আসতে হবে? অন্য কোনোভাবে নেওয়া সম্ভব না?

আপনার পেছনে তাকালে আপনি সারি সারি করে সাজিয়ে রাখা সিলিন্ডার ভর্তি Algae দেখতে পাবেন। এর মাঝে কিছু আছে সবুজ, কিছু আছে লাল, কিছু আছে কালো এবং কিছু সিলিন্ডার পুরোটা অন্ধকারে ঢেকে রাখা।
যেই সিলিন্ডারে আলোর উপস্থিতি নেই, তার ভেতর একটা ছোট্ট হিটিং ডিভাইস রয়েছে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ সেটা সিলিন্ডারে সাপ্লাই দিচ্ছে এবং অ্যালগিরা সেভাবেই ইঞ্জিনিয়ার করা যাতে তারা এই তাপশক্তি কাজে লাগিয়ে জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম করতে পারে।

সত্যি বলতে ইঞ্জিনিয়ারিং করাটা এতটাও কঠিন ছিল না। স্রেফ প্রশান্ত মহাসাগরের তলে টেলুরিয়াম খনির আশেপাশে কিছু হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে বাস করা

ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ দিয়েই পুকুরবাসী অ্যালগির মাঝে পরিবর্তন আনা গেছে।
সমুদ্রতলে যদি এমন কোনো টেকটনিক প্লেট থাকে যেগুলোর নড়াচড়ার কারণে তৈরি হওয়া ফাটলের মাঝে সমুদ্রের ঠান্ডা পানি ঢুকে নিচে থাকা ম্যাগমার কারণে প্রচণ্ড গরম হয়ে ওপরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তাহলে হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট সৃষ্টি হয়। সমুদ্রতলে থাকা প্রচণ্ড চাপের কারণে পানির তাপমাত্রা কয়েকশ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যায়। এসব তাপ ব্যবহার করে কিছু এককোষী প্রাণ Chemosynthesis করতে পারে এবং কোটি কোটি বছর পর আমরা হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের আশেপাশে আরও বড়ো প্রাণীদেরও দেখতে পাই। যেমন: অন্ধ চিংড়ি।
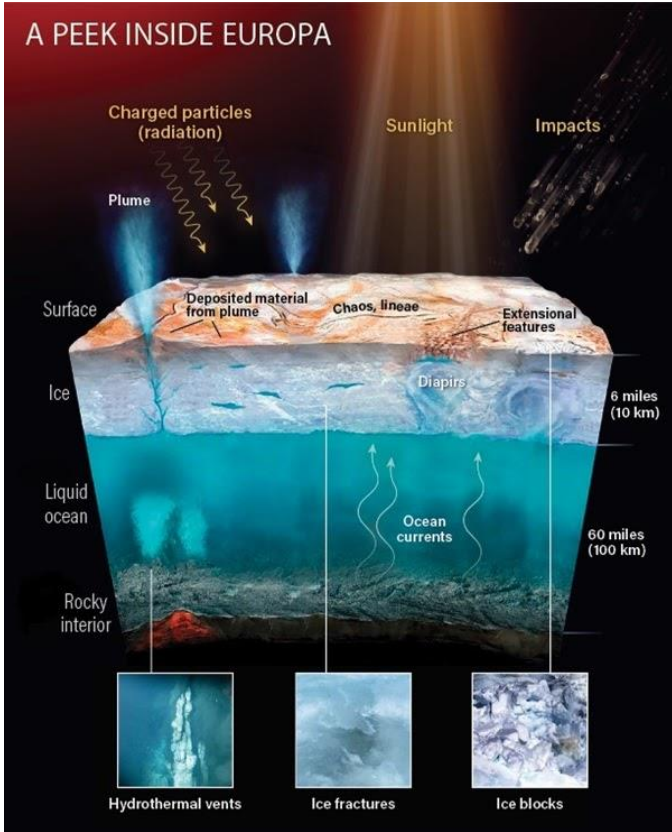
তো বুঝতেই পারছেন, ইউরোপা আমার গন্তব্য কেন। ইউরোপার উপরিভাগের পুরোটাই বরফে ঢাকা। তবে এর নিচেই রয়েছে তরল লবণাক্ত পানির সমুদ্র। আশেপাশে থাকা অন্যান্য চাঁদ এবং বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণের কারণে যে টাইডাল ওয়েভ তৈরি হয়, জোয়ার-ভাটা বলতে পারেন, তার ফলে এর মাঝে তাপমাত্রা একটু বেশি থাকে। এছাড়াও এর কোর এর তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, সমুদ্রতলে এর নিজস্ব হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট রয়েছে। অর্থাৎ, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ। এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলেরও প্রয়োজন পড়ছে না।

সেভাবে চিন্তা করলে আমাদের লিস্ট আরও লম্বা হয়ে যাচ্ছে। স্রেফ হ্যাবিটেবল জোনে থাকা গ্রহের দিকে না তাকিয়ে আমরা এও খোঁজ করতে পারি কোন চাঁদগুলোর গভীরে এমন উষ্ণ মহাসমুদ্র রয়েছে, যেখানে কেমিক্যাল স্যুপ ও হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের তাপ খেয়ে কিলবিল করতে পারে ভিনগ্রহী ব্যাকটেরিয়া!

৪.

বোর হচ্ছেন? গ্রিন টি খান। অ্যালগি পাউডার আর পরিশোধিত মূত্র দিয়ে বানিয়েছি। আরে! ভাববেন না। এই স্পেশাল অ্যালগিরা ফ্রুকটোজ জমায় নিজেদের কোষে, চা খেতে মোটেও তেতো লাগবে না। কী বললেন? ও, এখনও পরিশোধিত মূত্রেই আটকে আছেন। ওয়াসার পানি খেয়ে বড়ো হয়েছেন, ঢং না করে এটা খেয়ে নিন, পুরো মহাবিশ্বে এর চেয়ে বিশুদ্ধ পানি আর কোথাও পাবেন না।

পানির কথায় খেয়াল হলো, এই পানিকেও কি জীবনের জন্য একটু বেশিই কৃতিত্ব দেওয়া হয় না? বলুন দেখি, পানির এত সুনাম কেন? অন্যতম কারণ হচ্ছে এটা অনেক ভালো একটা solvent বা দ্রাবক। এর মাঝে নানান কেমিক্যাল দ্রবীভূত হতে পারে যার ফলে অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্ভব হয় যা জীবন ধারণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
তবে পানিই একমাত্র নয়।

আসুন পরিচিত হই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে। ভাবছেন এর সাথে নতুন করে আর কী পরিচিত হবেন? এই ভোলাভালা, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাস যে কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পানির চেয়েও ভালো দ্রাবকের পরিচয় দেয় তা জানা ছিল আপনার?

Super Critical Fluid বা SCF হলো যখন একটা কমপাউন্ড নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপের সীমা অতিক্রম করার ফলে এটা তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার মাঝামাঝি কোনো একটা অবস্থায় থাকে। এর ফলে, এটা কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে পারে ঠিক কোনো গ্যাসের মতো, আবার এর মাঝে কোনো কিছুকে দ্রবীভূত করতে পারে তরলের মতো। সুপার ক্রিটিকাল ব্যাপার-স্যাপার।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্রিটিকাল পয়েন্ট হলো ৩১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৭২.৯ atm বা বায়বীয় চাপ। পৃথিবীতে এমন চাপ আপনি সহজেই সমুদ্রের আধা মাইল নিচে পাবেন। পৃথিবীতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সুপারক্রিটিকাল ভার্সন ব্যবহার করা হয় কফির বীজ থেকে ক্যাফেইন কমানোর জন্য।
পানির চেয়েও কার্বন ডাইঅক্সাইডের এই রূপ ভালো দ্রাবক। এমনকি এটায় এনজাইম আরও বেশি স্ট্যাবল থাকে, অর্থাৎ, তারা তাদের Substrate moleculeগুলোর ব্যাপারে আরও বেশি নির্দিষ্ট বা স্পেসিফিক থাকে যার ফলে অপ্রয়োজনীয় সাইড রিয়্যাকশও হয় না।

কথা হচ্ছে, শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ৯৭% হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর এর গড় তাপমাত্রা ৪৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও চাপ হলো ৯০ atm। অর্থাৎ, ক্রিটিকাল ফ্লুইড হওয়ার জন্য বেশ উপযোগী পরিবেশ। শুক্রের বায়ুমণ্ডলে সুপার ক্রিটিকাল কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে এটা সহজেই অনুমেয়। প্রশ্ন করতে পারেন, জীবন কি এই গ্যাসের মাঝে বাঁচতে পারবে?
সত্যি বলতে আমাদের নিজ গ্রহেরই কিছু অণুজীবদের SC-CO_2 এর মাঝে ছেড়ে দিলে তারা দিব্যি বাঁচতে পারে, তাদের এনজাইম সহজেই বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা তাই এমন গ্রহের দিকেও চোখ রাখেন যেগুলোতে SC-CO_2 আছে।

৫.

একটু কষ্ট করে সিট বেল্ট বেঁধে বসে পড়ুন, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যবহার করে একটু দিক পরিবর্তন করব। ওই যে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে, আমরা প্রবল বেগে নিচের দিকে পড়ছি, তবে আমাদের আদি বেগের কারণে সামনের দিকেও এগোচ্ছি। অরিজিনাল ট্র্যাজেক্টরি একটু বেঁকে মঙ্গলের অপর পাশের দিকে চলে যাবে, এরপর আবার সোজা পথ ধরে এগোতে থাকব কিছুদিন, পৌঁছে যাব ইউরোপাতে।
এতে দিক পরিবর্তনে জ্বালানি কম লাগল, বুঝলেন? এটাকে সায়েন্স ফিকশনের ভাষায় গ্র্যাভিটেশনাল স্লিং শট বলা হয়।

দুঃখিত, চিৎকার করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম আরকি।

প্রবল বেগে সামনে এগোচ্ছিলাম, পুরো ম্যানুভার ১১২ বার অনুশীলন করেছি সিমুলেশনে, সবই মুখস্থ। কিন্তু হঠাৎই চোখের সামনে কী যেন চকচক করে উঠল। মনিটরে দেখি খুবই ছোটো ছোটো ডট দিয়ে পুরো স্ক্রিনের উপরিভাগ ভর্তি হয়ে গেছে। এখানে উল্কাপিন্ড বা asteroid তো থাকার কথা নয়। তাহলে?

আমার মাথায় সম্ভাব্য অনেক কিছুই চলছে, সবচেয়ে ভয়ানক যেটা সেটাই ধরে নিলাম।

প্রিয় কসমোনাট, আপনি জলদি স্পেইসস্যুট পড়ে নিন, আমি কন্ট্রোল রুম ফোর্সড ভ্যাক্যুয়েম করছি। মানে এই ঘর থেকে সব বাতাস বের করে দেবো, কারণ ওই ক্ষুদ্র চকচকে জিনিসগুলো যদি আমাদের শিপে আঘাত হানে সামনের কাচও ভেঙে যেতে পারে, তখন ভেতরে বাতাস থাকলে আমরা হুশ করে বাইরে বের হয়ে যাব, শ্বাস আটকে মারা যাওয়ার আগে ভেতর থেকে সিদ্ধ হয়ে যাব। তাড়াতাড়ি!

জিজ্ঞেস করছেন ওই জিনিসগুলো কী? আমার ধারণা মতে, ওগুলো স্পেইস জাঙ্ক বা আবর্জনা। জানেন তো, মানুষ যেখানেই যায় আবর্জনা ছড়িয়ে আসে। আমরা গত কয়েক দশকে তো কম মিশন পাঠাইনি মঙ্গলে। সেই প্রজেক্টগুলোর জাঙ্ক এগুলো। এসব সমস্যার সমাধান না করলে একসময় দেখা যাবে পৃথিবী থেকেই কোনো রকেট উড়তে পারছে না, নিজেদের আবর্জনার জালে নিজেরাই আটকে পড়ব। যে গতিতে এগোচ্ছি তাতে হালকা ম্যান্যুভার করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সংঘর্ষ অনিবার্য।

স্যুট না পড়া থাকলে চা খেতে পারতাম। আর কয়েক সেকেন্ড, আমাদের ও তেজস্ক্রিয়তায় মরণের পথে বাধা হয়ে আছে চার সেন্টিমিটার পুরু সাঁজোয়া কাচ। প্রয়োজন শুধু অল্প একটু ফাটলের, সাথে সাথেই সূর্য থেকে আসা অতি উৎসাহী তেজস্ক্রিয়

আলো গ্রাস করে নেবে আমাদের। অথবা করবে না, আমরা বেঁচে যাব।

তেজষ্ক্রিয়তা! প্রকৃতিতে যা প্রাণ নেয়, তা প্রাণ দেয়ও। জানতেন?

৬.

বিজ্ঞানীরা প্রাণ আছে এমন সম্ভাব্য গ্রহের লিস্ট তৈরি করার সময় সেই গ্রহে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ কতখানি আছে সেটায় খুব জোর দেন। কারণ, একটা গ্রহে টাইডাল ওয়েভ বা সরাসরি এর নক্ষত্র থেকে পাওয়া আলো ছাড়াও এর অভ্যন্তরীণ তেজষ্ক্রিয় পদার্থ তাপ তৈরিতে ভূমিকা রাখে। তেজষ্ক্রিয় পদার্থ অবশ্যই এমন হতে হবে যেগুলোর হাফ-লাইফ অনেক অনেক বেশি। যেমন: ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বা পটাশিয়াম; যাতে তারা গ্রহে লম্বা সময় ধরে টিকে থাকতে পারে।

শুধু যে তাপ তৈরি করবে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। অভ্যন্তরীণ তেজষ্ক্রিয় তাপের ফলে গ্রহে নিজস্ব একটা ডায়নামো বা মেকানিজম শুরু হতে পারে যা থেকে Plate Tectonics শুরু হতে পারে যেটা গ্রহের উপরিভাগ বা Crust-এ বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে, এমনকি গ্রহের নিজস্ব ম্যাগনেটিক ফিল্ডও তৈরি করতে পারে।
ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হওয়া মানে নক্ষত্র থেকে আসা ক্ষতিকর সোলার উইন্ড বা কসমিক রশ্মি থেকে রক্ষা পাওয়া। ঠিক যেমন বৃষ্টির সময় আপনার ঘরের ছাদ আপনাকে রক্ষা করে।
আর Plate tectonics এর ব্যাপারে বললে এটা ভেতরের তাপ রেগুলেট করতে সহায়তা করবে। মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে সেই তাপ বাইরেও বের করে দেবে, যার ফলে সহজেই বায়ুমণ্ডল তৈরি হবে। সবকিছু প্রাণের পক্ষে!

এখন প্রশ্ন থাকে কতটুকু তেজষ্ক্রিয়তা প্রয়োজন? বেশ, উত্তরটা আপনার জানার কথা। ঠিক পৃথিবীর মতো! বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর তেজষ্ক্রিয়তার মডেল তৈরি করে সেটার মান ওঠা-নামা করিয়ে সিমুলেশনে পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে যদি তেজষ্ক্রিয়তা পৃথিবীর চেয়ে বেশি হয় তাহলে ডায়নামো মেকানিজম খুব বেশি দিন টিকবে না। যেহেতু তেজষ্ক্রিয় পদার্থগুলো দ্বিতীয় লেয়ার অর্থাৎ mantle-এ থাকে, তাই ওই লেয়ার বেশিই গরম হয়ে গেলে সেটা অনেকটা insulator এর মতো কাজ করবে। নিচের কোর তখন তাপ রেগুলেট করতে পারবে না ঠিক মতো, তাই ম্যাগনেটিক ফিল্ডও থাকবে না।
আবার খুব বেশি তেজষ্ক্রিয়তা মানে খুব বেশি তাপ, খুব বেশি আগ্নেয়াগিরি, খুব বেশি mass extinction ঘটনা ঘটা। কী একটা অবস্থা!

আবার তেজষ্ক্রিয়তা কম অর্থাৎ কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা আগ্নেয়াগিরিই না হওয়া। সহজ ভাষায় বললে গ্রহটা নিজের সিভি তৈরি করলে কোয়ালিফিকেশনে লিখতে হবে, ‘মৃত গ্রহ’।

অ্যাস্ট্রোনমাররা বিভিন্ন তারা, সুপারনোভা এবং সম্প্রতি নিউট্রন স্টার কোথাও সংঘর্ষ করলে সেখানে চোখ রাখছেন যে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম তৈরি হচ্ছে কি না। কারণ যেই নক্ষত্রের মাঝে এগুলো থাকবে তার আশেপাশের গ্রহেও এগুলোর উপস্থিতি পাওয়া যেতে পারে। কথা হচ্ছে, এগুলো খুব বেশি নজরে আসে না। তাই ইউরোপিয়াম নামের এক এলিমেন্টেরও খোঁজ করা হয়। কারণ এটাও একই প্রসেসে তৈরি হয় যেভাবে ইউরেনিয়াম আর থোরিয়াম হয়। তাই এটার উপস্থিতি মানে বাকিরাও সেখানে আছে সেই আশা করা যায় আরকি।

ভাবছেন এতদূর থেকে কীভাবে বুঝি কোন তারায় কী আছে? এটাকে spectroscopy বলে। দূর নক্ষত্র হতে আসা রেডিয়ো ওয়েভ, আলো বা এক্সরে ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা হয় যে এরা কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে তরঙ্গ দিচ্ছে, এরপর ডাটাবেইজের সাথে মেলানো হয় কোন এলিমেন্ট এমন সিগনেচার দেয়, সেসব মিলিয়ে ধারণা করা হয় কোন পদার্থ থাকতে পারে।
নিউটনের কথা মনে আছে? কীভাবে একটা প্রিজমের মাঝে আলো ঢুকিয়ে রংধনু বানিয়েছিলেন তিনি। আলোর এই ছড়িয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যকে বলে dispersion। যেই আলোই পাচ্ছি আমরা, মহাকাশ থেকে সেটাকেই বিচ্ছুরিত করে ফেলছি এটা দেখতে যে : কোন স্পেক্ট্রামের আলো এগুলি। বোঝার সুবিধার্থে বলি, ক্লাস নাইনের chromatography-র মতোই শুধু এখানে আলো নিয়ে কারসাজি।

৭.

বকবক করতে করতে খেয়াল করিনি আপনি ভয়ে আধমরা হয়ে আছেন। চোখ খুলতে পারেন, তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। হালকা চিড় ধরেছে কাচের সামনের অংশে তবে তেমন কিছুনা। চেম্বারে আবার বাতাস ভর্তি করাই যায়। এই যে সুইচ টিপে দিলাম।

আমাদের এখন শীতঘুমে যেতে হবে। সাইফাই মুভিতে দেখেছেন নিশ্চয়ই, ক্রায়োস্লিপে থাকে নভোচারীরা। অতি ঠান্ডা তাপমাত্রায়, বছরের পর বছর কাটিয়ে দেওয়া যায়। বয়স বাড়ে না। ওয়েল, সেটা ফিকশন। তবে আমার শিপে যেটা আছে সেটা বাস্তব। টোটাল লিকুইড হাইবারনেশন বলে এটাকে। শরীরের মেটাবলিজম অনেক কম রাখা যায়। এতে অক্সিজেন খরচ, খাবার খরচ কম হয়। কয়েক মাসও কাটিয়ে দেওয়া যায় কিছু মডেলে। আপনিও ঢুকে পড়ুন। ঘুম আনার জন্য আমি রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা শুনতে থাকব, আর আপনার জন্যেও প্লে লিস্ট ঠিক করে রেখেছি, চিন্তা করবেন না। আপনি শুনবেন জীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্বন এলিমেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা। আমি সেন্ট্রাল কম্পিউটারকে কমান্ড দিয়ে রেখেছি, আপনি ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত এটা শোনাতে থাকবে আপনাকে। ওভাররাইট অথরিটি আপনার নেই, আর উলটা-পালটা সুইচ চাপাচাপি করবেন না, শেষে দুজনেই মারা পড়তে পারি।

ওকে, হ্যাপি স্লিপিং!

৮.

কার্বন। ৬টা ইলেকট্রন, ৬টা প্রোটন। আহামরি কি?

আমাদের গ্রহের যেখানেই তাকাই প্রাণের স্পন্দন দেখতে পাই। বড়োসড়ো হাতি, তিমি কিংবা অজগর থেকে শুরু করে ছোটোখাটো কেঁচো, ব্যাকটেরিয়া বা অ্যালগি, এমনকি ভাইরাস। সবখানেই জীবন-যৌগের প্রমাণ মেলে। জীবন-যৌগ, তা RNA বা DNA হোক, সেটার মলিকিউলার গঠনে তাকালে আমরা কার্বন পাই। সেটা neucleotide এ থাকা রাইবোজ সুগার হোক আর সাথে লাগোয়া নাইট্রোজেনাস বেজ হোক, কার্বন তো আছেই।
কার্বন যেহেতু একইসাথে চারটা আলাদা অণুর সাথে বন্ড তৈরি করতে পারে তাই এটা বিশাল বড়ো বড়ো চেইন তৈরি করতে পারে, যেমন ডিএনএ বা প্রোটিন ইত্যাদি। তবে প্রাণের মেরুদণ্ড কার্বনের প্রতিপক্ষ হতে পারে সিলিকন।

সিলিকনও একইসাথে চারটা অণুর সাথে বন্ড তৈরি করতে পারে। কার্বনের সাথে এর খুব মিল। এমনকি পৃথিবীর নানান ঘাস ও অ্যালগির মাঝে সিলিকন ডাইঅক্সাইডের ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায়। তবে এখনও কার্বন-সিলিকন মিলে কোনো কিছু তৈরি করেছে এমনটা প্রকৃতিতে দেখা যায় না।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফ্রান্সিস আর্নোল্ড, সিনথেটিক অর্গানিক কেমিস্ট জেনিফার কান, বায়োইঞ্জিনিয়ার রাসেল লুইস এবং কেমিস্ট কাই চেন মিলে অণুজীবদের দ্বারা কার্বন-সিলিকন একত্রে করে মলিকিউল তৈরি করিয়েছেন। তারা জানান, "যে জিনিস আমরা ল্যাবে করেছি আমার বিশ্বাস প্রকৃতি কোথাও না কোথাও সেটা ঠিকই করতে পেরেছে।"
প্রথমত, বায়োলজিক্যাল সিস্টেম অনেক জটিল এবং সেগুলোকে সরাসরি ইনফ্লুয়েন্স করা, কন্ট্রোল করা বিজ্ঞানীদের জন্য বেশ কঠিন। তাই তাঁরা সহজ পথ বেছে নিলেন। তারা অণুজীবদের সিলেক্টিভ ব্রিড করাতে লাগলেন এবং একই সাথে তাদের এনভায়রনমেন্ট হালকা বদলে দিলেন। এভাবে ধীরে ধীরে জেনারেশন পর জেনারেশন ধরে তাদের একটু একটু করে কাঙ্ক্ষিত মলিকিউল তৈরি করতে ডিরেক্ট করছিলেন তাঁরা। ব্যাপারটা অনেকটা সিলেক্টিভ ব্রিডিং এর মতোই। এই টেকনিকের নাম হলো Directed Evolution। অর্থাৎ, অণুজীবদের বিবর্তন

করা ঠিক আমরা যেমন চাই সেভাবে। এভাবে অনেক কেমিক্যাল তৈরি করা হয় এখন, যেমন ডিটারজেন্ট, ওষুধ বা জ্বালানি, যেগুলো সাধারণ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করতে গেলে অনেক বর্জ্য তৈরি হয়। তার তুলনায় অণুজীবদের ব্যবহার অনেকটাই পরিবেশবান্ধব।

বিজ্ঞানীদের এই ক্ষুদ্র দলটির মূল উৎসাহ ছিল এমন এনজাইম তৈরি করানো, অণুজীবদের দিয়ে যেই এনজাইম অর্গানো-সিলিকন বেজড মলিকিউল তৈরি করবে। এজন্য শুরু করা হয়েছিল এমন এনজাইমওয়ালা অণুজীবদের দিয়ে যেই এনজাইম সিলিকনকে কিছুটা হলেও পরিচালনা করতে সক্ষম। এরপর সেই অণুজীবদের ডিএনএর মিউটেশন করানো হয়, যেটা ছিল পুরোপুরি র‍্যান্ডম। তাঁরা নিজেরাও জানতেন না মিউটেশনের ফলে কী রেজাল্ট আসবে। এরপর দেখা হয় কারা সিলিকন রিলেটেড রিয়েকশনের আগের তুলনায় ভালো করছে। তাদের আলাদা করে নিয়ে আবার মিউটেড করা হয়। এভাবে অনেক জেনারেশন প্রসেসটা রিপিট করতে করতে একসময় তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত এনজাইম পেয়ে যান।

অর্গানো-সিলিকন বেজড মলিকিউল তৈরি করার মতো এনজাইম তৈরি করতে গিয়ে তারা দেখেন খুব বেশি মিউটেশন লাগেনি। এমনকি, এক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া তো মাত্র তিনবার মিউটেড হয়েই খুবই ভালো মানের এনজাইম তৈরি করেছে। যদিও পুরো ব্যাপারটা র‍্যান্ডম তারপরেও প্রকৃতিতে অর্গানো-সিলিকন বেজড এনজাইম যে কত সহজে তৈরি হওয়া সম্ভব তা আমরা ধারণা করতে পারি।

মহাবিশ্বে কার্বনের চাইতে সিলিকন অনেক অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাই বিজ্ঞানীদের লিস্ট আরও লম্বা করে এমন গ্রহতেও ঢুঁ মারতে হবে যেখানে...

কম্পিউটার ভয়েস: Subject Fallen Asleep. Set awakening schedule to T-24 days 13 hours 59 mins.

৯.

হ্যালো অ্যাগেইন! কেমন লাগছে লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে? ফ্রেশ হতে চাইলে বাথরুমে যেতে পারেন। পানি ব্যবহার করতে পারবেন না যদিও, টিস্যু আছে।

আমরা এই মুহূর্তে ইউরোপাকে কেন্দ্র করে ঘুরছি। এই চাঁদের আরেকটা বিশেষত্ব হলো এতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, বাতাসে খুবই হালকা অক্সিজেন আছে। তাকান এর দিকে, সৌরজগৎ এর সবচেয়ে মসৃণ পৃষ্ঠতলের দিকে চেয়ে রইবেন। কোথাও উঁচু-নিচু নেই, পাহাড়-পর্বত নেই, গর্ত নেই। যেন আক্ষরিক অর্থেই বিশাল এক বরফের গোলক।
আমরা কিছুক্ষণ অরবিটে থাকব, লোকেশন পিনপয়েন্ট করা মাত্রই অবতরণ করব। তখন ভয়ে পেচ্ছাব করে দিলে চলবে না কিন্তু। হে হে!

মাইন্ড করে লাভ নেই। এটা প্রকৃতির নিয়ম। সবাই মূত্র বিসর্জন করে, আমিও করি। আমার সিলিন্ডারে রাখা অ্যালগিরাও বর্জ্য ছাড়ে। ব্যাকটেরিয়াও একই। এর কারণ হচ্ছে আমরা সবাই একেবারে মলিকিউলার লেভেলে একইরকম। সবার মাঝেই ডিএনএ রয়েছে। প্রাণ আছে তো ডিএনএ থাকবেই!

আবার বেশি বলে ফেললাম। প্রাণের জন্য কী আসলেই ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডই দরকার? অন্য কোনো মলিকিউল প্রাণ গঠন করতে পারে না? জেনেটিক তথ্য জেনারেশন থেকে জেনারেশনে পাঠানোর জন্য কি ডিএনএ ছাড়া আর কেউ নেই?
একই প্রশ্ন করা হয়েছিল এক সুপার কম্পিউটারকে। তাকে একটা পরিশীলিত প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল যেটার কাজ ছিল ডিএনএ-র মতো আর কতগুলো স্ট্যাবল মলিকিউল থাকতে পারে সেটা বের করা। মলিকিউলগুলো ডিএনএ-র মতোই দুটো স্ট্র্যান্ড তৈরি করবে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রোগ্রামটি ৬৬ লক্ষেরও বেশি কম্বিনেশন দিয়েছে যেগুলো ডিএনএ-র সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে।

ভেবে দেখুন তো, আমরা যে অন্য গ্রহে প্রাণের খোঁজ করছি, আমরা কি নিজেরাও ধারণা করতে পারি সেই প্রাণগুলো কেমন হতে পারে? তাদের বায়োকেমিস্ট্রি কত আলাদা হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। সেক্ষেত্রে প্রাণ তৈরি হওয়ার জন্য যে পৃথিবীর মতোই পরিবেশ লাগবে এটা অমূলক হয়ে যায়।
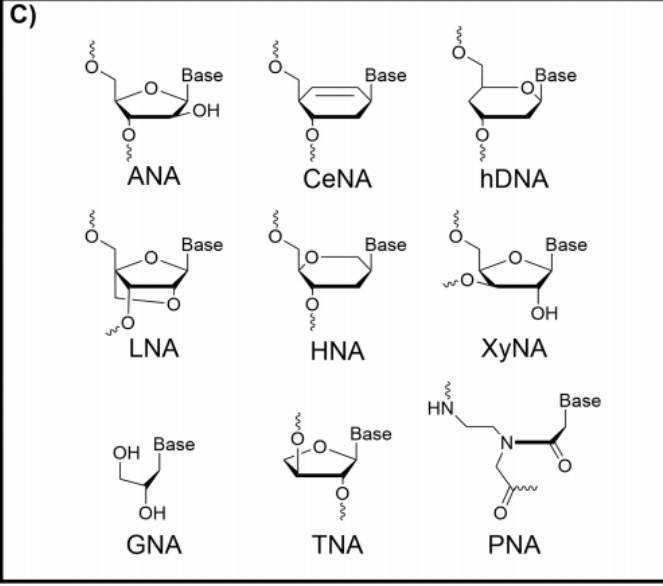
আমরা নামছি বেশ জোরে, কিন্তু কাঁপুনি অল্পই হচ্ছে, কারণ ইউরোপার বায়ুমণ্ডল বেশ পাতলা। বরফ থেকে মাত্র কয়েক মিটার ওপরে থাকতেই আমাকে থ্রাস্টার ব্যবহার করে গতি কমাতে হবে। দক্ষ পাইলট হিসেবে স্বীকৃতি নিতেই পারি।

দরজা খুলে যাবে কিছুক্ষণ পরেই। সহযাত্রী, ইউরোপায় প্রথম মানুষ হিসেবে অবতরণ করতে কেমন লাগছে? আমি অবশ্য আগে আমাদের চাঁদে নেমেছিলাম তাও মহাকাশ-দস্যুদের থেকে চুরি যাওয়া কলা ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু আপনার জন্য তো সব নতুন। আপনার প্রথম বাক্য কী হবে? দরজা খুলে গেছে, পা রেখে কিছু বলুন। এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আগামী অনেক দশক মানুষ এসব তাদের পাঠ্যবই-এ অধ্যয়ন করবে। অ্যাঁ!? কী বললেন?

হা ঈশ্বর! *Oryza sativa* মানে ধান গাছ! শান্তি?

রেড শিফট

স্বপ্নীল জয়ধর

তখন না ছিল এই পৃথিবী, না ছিল চাঁদ। এমনকি এই বিশাল মহাবিশ্বেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি স্থান-কাল নামের কিচ্ছু ছিল না। তখন সময়েরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ছিল শুধু একটা অসীম ভরের অসীম ঘনত্বের একটা বিন্দু। হঠাৎ করেই যেন সেই বিন্দুর কিছু একটা হলো।
কোনো এক অজানা কারণে সেই অদ্ভুতুড়ে বিন্দুটা ছোট্ট থেকে বড়ো হতে থাকল। আবির্ভাব হলো স্থান-কাল নামক এক অদ্ভুত চাদরের। বিন্দুটার ভিতরে থাকা সেই স্থান-কালের চাদর, অণু-পরমাণু, শক্তি সব ছড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। ছড়াচ্ছে তো ছড়াচ্ছেই। বড়ো হচ্ছে তো হচ্ছেই। এর থেকেই আস্তে আস্তে একে একে তৈরি হলো মৌল, যৌগ, তারা, গ্রহ, নীহারিকা, গ্যালাক্সি আরও কত কী! তৈরি হলো এই বিশাল মহাবিশ্ব। এই মহাবিশ্বেরই কোনো একটা গ্যালাক্সির, কোনো একটা সৌরজগতের কোনো একটা হলুদ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা কোনো এক গ্রহে এখন আমি বা আমরা। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে বিগ ব্যাং।

অসাধারণ, তাই না? সবচেয়ে অদ্ভুত কী জানো? ওই যে বললাম মহাবিশ্বের ছড়ানোর কথা। তা এখনও প্রসারিত হচ্ছে। এমনকি ভবিষ্যতেও তা হতে থাকবে। কিন্তু তা দেখার জন্য তখন হয়তো এই মানবসভ্যতার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।
কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? না হওয়ারই কথা, এমনকি বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনেরও তা বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু তাঁর ফিল্ড ইকুয়েশনের এক ফলাফল তাঁর বিশ্বাসের পুরো বারোটা বাজিয়ে দেয়। নিজের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাই তো তিনি সূত্রে এই প্রসারণ থামানোর জন্য বসিয়ে দিলেন একটা ধ্রুবক। সবাই তো তাঁর অগাধ ভক্ত। তাই কেউ আর প্রশ্ন করেননি।

এরপর এলেন সেই বিখ্যাত ব্যক্তি, যাঁর নাম ফ্রেডম্যান। তিনিই প্রথম বলেন মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল যা সব দিক থেকে সমানভাবে অগ্রসর হয়। তখন তেমন কেউ আমলে নেয়নি। কিন্তু পরে হাবল নামক এক জ্যোতির্বিদ আসেন। প্রমাণ করেন তাঁর মতবাদকে। তিনি টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করে দিলেন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতাকে। ভেঙে দিলেন আইনস্টাইনের বিশ্বাস। চারদিকে তাঁর জয়জয়কার।

তিনি কোনো এক গভীর রাতে ধন্যবাদ জানালেন সেই রেড শিফটকে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতাকে প্রমাণ করতে সাহায্য করার জন্য।

জানতে ইচ্ছা করে কী এই রেড শিফট যা তাঁকে এই বিশাল জিনিস প্রমাণ করতে সাহায্য করে। তো চলো জেনে নিই কী এই রেড শিফট।

তার আগে জানতে হবে ডপলার ইফেক্টের কথা।

একটা সহজ উদাহরণ দেখি। ধরলাম, একটা প্লেন নীল আকাশে উড়ছে। তুমি একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছ যে প্লেনটা তোমার দিকে আসছে। প্রথমে তুমি শুনতে পাবে প্লেনের একটি তীক্ষ্ণ শব্দ। যা ক্রমশ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হতে থাকবে। আর যখন প্লেনটা তোমাকে অতিক্রম করে অনেক দূর চলে যাবে তখন কোনো শব্দই শুনতে পাবে না। যেন তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকবে।
যদি প্লেনের উদাহরণটা বোধগম্য না হয় তবে তোমার দিকে আসতে থাকা একটা অ্যাম্বুলেন্স আর তার সাইরেনের কথা চিন্তা করতে পারো।

উভয় উদাহরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের দিকে ধেয়ে আসা কোনো উৎস থেকে কোনো শব্দ এলে তা প্রথমে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হতে থাকে। এরপর তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় এবং একসময় আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। একেই বলে ডপলার ইফেক্ট।
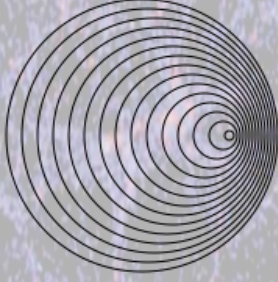
মোদ্দাকথা হলো যদি কোনো স্থির উৎস থেকে শব্দ আসে তবে তবে তা চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু যদি উৎসটা চলমান হয় তবে সেই উৎসটা যেই দিকে ধাবমান শব্দ সেই দিকেই যায় এবং সে দিকে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে এবং তার ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে। আর এর বিপরীত দিকে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়ে এবং ফ্রিকুয়েন্সি কমে। মোটকথা, কোনো শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কমে, অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি যত বাড়ে, শব্দটা তত তীক্ষ্ণ হতে থাকে। আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বাড়ে, অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি যত কমে, শব্দটা তত ভোঁতা হতে থাকে। আর এটা আলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা শব্দ ও আলো এক প্রকার তরঙ্গ। আর তরঙ্গের বেলাতেই শুধু ডপলার ইফেক্ট কাজ করে।

ডপলার ইফেক্ট নিয়ে মোটামুটি প্রাথমিক আলোচনা হয়ে গেল। এবার আসি মূল কথায়।

আবার ধরলাম। না, এবার প্লেন বা গাড়ি না, সোজা গ্যালাক্সি। ধরলাম, আমাদের গ্যালাক্সিসহ সব গ্যালাক্সি, এমনকি এই পুরো মহাবিশ্বটা যদি স্থির থাকত তবে তাদের যে-কোনো একটা গ্যালাক্সি থেকে আসা আলো চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ত। আবার যদি একটা গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সির দিকে বা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায় তবে তার থেকে আসা বিকিরিত আলো ডপলার ইফেক্ট অনুযায়ী পৃথিবীর দিকে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকবে বেশি এবং গ্যালাক্সির চলার পথের উলটো পাশে থাকবে কম। যার ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়তে থাকায় সেখান থেকে লালের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। যেহেতু লাল আলোর ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এবং ফ্রিকুয়েন্সি সবচেয়ে কম, তাই দেখব লাল, যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় বলে রেড শিফট। আবার যদি একটা গ্যালাক্সি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তবে তা ডপলার ইফেক্ট অনুযায়ী তার থেকে আসা বিকিরিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পৃথিবীর দিকে থাকবে কম এবং গ্যালাক্সির চলার পথের উলটো পাশে থাকবে বেশি। কেননা তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কমতে থাকবে উৎসটা থেকে আসা আলো তত বেগুনি রঙের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। যেহেতু বেগুনি আলোর ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম এবং ফ্রিকুয়েন্সি সবচেয়ে বেশি, তাই দেখব বেগুনি রং। আর একে বলে নেগেটিভ রেড শিফট বা ব্লু শিফট বা ভায়োলেট শিফট।
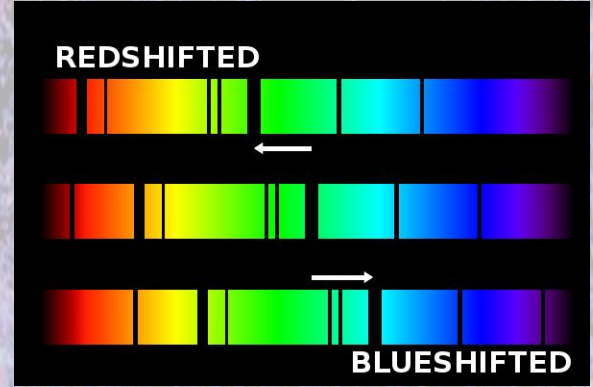
মোটামুটি এই ধারণা নিয়েই মাঠে নামেন হাবল। আর যখন তিনি দেখলেন অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেগুনির দিকে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ ব্লু শিফট দেখাচ্ছে; আবার মহাবিশ্বের বেশিরভাগ বস্তু থেকে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লালের দিকে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ রেড শিফট দেখাচ্ছে তখন তিনি এক প্রকার খেই হারিয়ে ফেললেন। পরে আরও পর্যবেক্ষণের পর নিশ্চিত হলেন যে মহাবিশ্বের বেশিরভাগ বস্তুই রেড শিফট। আবার আইনস্টাইনের পরিবর্তিত ফিল্ড ইকুয়েশনও একই ফলাফল দেয়। ফলে শেষমেশ একটা ফলাফল আসে যে , মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। এমনকি প্রতি মুহূর্তে তা আগের তুলনায় আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। যেন এক বিস্তার লাভকারী অদম্য বোমা প্রতি মুহূর্তে রেড শিফটের মাধ্যমে নিজের কর্মকাণ্ডকে জাহির করছে।
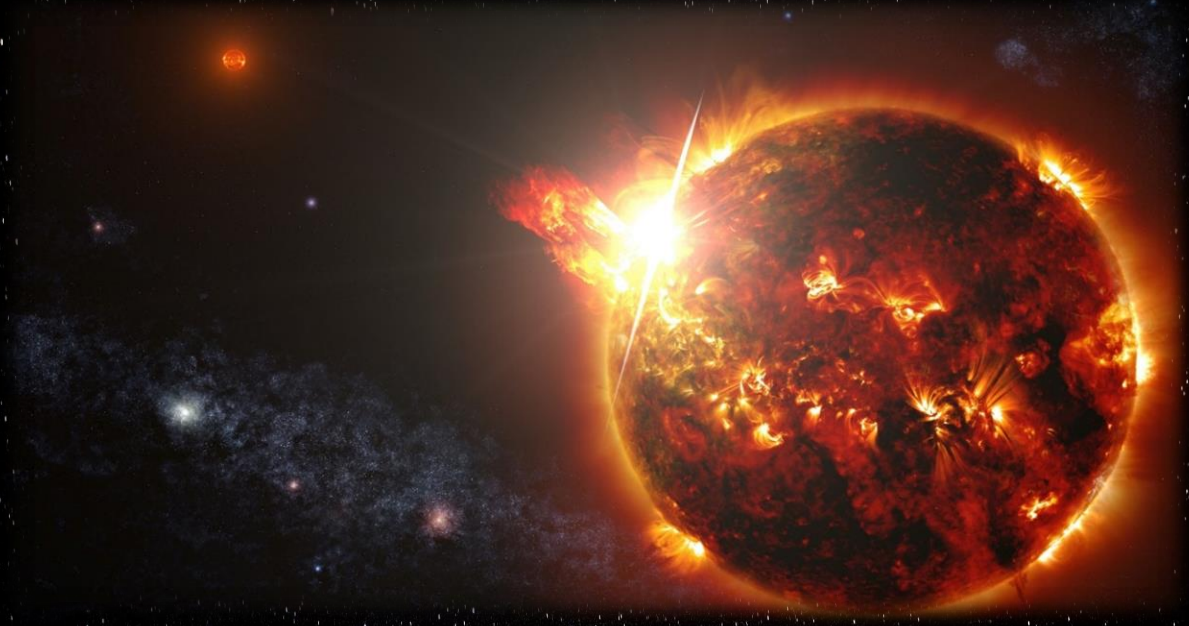
মহাবিশ্বের শেষ তারাটি

মাহতাব মাহদি

আজ থেকে হয়তো অনেক দিন পরে, একটা নিঃসঙ্গ তারা একা একা ধুঁকছে, তার আশেপাশের সমস্ত তারা মারা গিয়েছে আগেই, সে-ই টিকে আছে। তারাটি জানে, তারও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বেশিক্ষণ, তার এনার্জি প্রায় শেষ। তারাটা নিজের জীবন নিয়ে একটু চিন্তা করল, সারা জীবন তার আকার ছোটোই ছিল। ছোটো হওয়ার কারণে বামন নামের কটুক্তি শুনতে হতো তাকে। সবাই বলত, "ও বেশিদিন বাঁচবে না"। সবাইকে ভুল প্রমাণ করে সে একাই বেঁচে থাকল, তার আশেপাশের সবাই তাকে কটুক্তি করতে করতেই মারা গেল, একেবারে উচিত জবাব। এসব ভাবতে ভাবতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তারাটি। এর সাথেই সমগ্র মহাবিশ্ব হয়ে গেল অন্ধকার।

ওপরের গল্পটা রেড ডোয়ার্ফের, বাংলায় লাল বামন। নক্ষত্রটি অনেক ছোটো আকারের। এমনকি, শক্তিও খুব বেশি না, আমাদের সূর্যের চাইতেও ঠান্ডা। এর আলোও আমাদের দর্শন সীমায় নয়। ইনফ্রারেড আলোতে জ্বলে। ভর? সেটাও অনেক কম। সূর্যের ভরের ৮% থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সূর্যের ভরের ৪০% পর্যন্ত ভর থাকতে পারে। অনেক গরিব এরা, খুব কষ্টে কোনোমতে হাইড্রোজেন ফিউশন ঘটিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ধনী (বড়ো) তারা যেমন: MY Cephei, রিগেল এমনকি সূর্যের কাছেও এরা নস্যি। তার জন্যই কিনা, তাকে তারার মর্যাদাই দিতে চায়নি অনেকেই। কিন্তু ছোটো হলে কী হবে, তারা তো বটেই রেড ডোয়ার্ফ এবং তারাদের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘস্থায়ী। তারাটি যে আসলেই কতটা

গরিব তা H-R ডায়াগ্রামে এদের অবস্থান দেখেই বোঝা যায়। মেইন সিকুয়েন্সে সবার নিচে এদের অবস্থান।
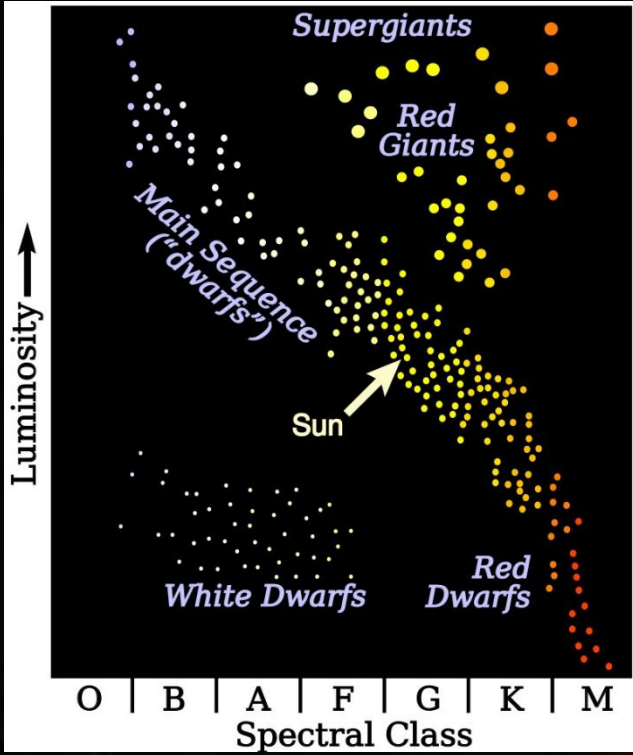
চিত্র ১: H-R ডায়াগ্রামে লাল বামন-এর অবস্থান।

তারাদের সমাজও অনেকটা মানুষের মতো, ধনীর চাইতে গরিবের সংখ্যা বেশি। ধনীর চাইতে গরিবদেরই বেশি দেখা যায়। তারাদের মধ্যেও তেমন রেড ডোয়ার্ফ বেশি। মহাবিশ্বে যতটা তারা তার ৮৫%-ই রেড ডোয়ার্ফ। এমনকি সূর্যের পরে আমাদের সবচাইতে কাছের উজ্জ্বল তারা আলফা সেন্টরাই। এটা আমাদের থেকে ৪.৪ আলোকবর্ষ দূরের তারা, এটা একটা রেড ডোয়ার্ফ। শুধু তাই না, আশেপাশের ৩০-৪০ টা তারাই হচ্ছে রেড ডোয়ার্ফ। আমাদের সূর্যের কাছাকাছি যে তারাগুলো আছে, তাদের বেশিরভাগই রেড ডোয়ার্ফ। রেড ডোয়ার্ফ একটু গরিব হলেও এরা তারা, অন্য যে-কোনো মেইন সিকুয়েন্স তারার মতোই হাইড্রোজেন ফিউশন ঘটিয়ে হিলিয়াম তৈরি করে। কিন্তু একটা তারার হাইড্রোজেন ফিউশনের পরিমাণ নির্ভর করে আসলে তারার ভরের ওপর। যেহেতু রেড ডোয়ার্ফের আকার খুবই ছোটো, সহজে হাইড্রোজেন কেন্দ্রের দিকে এনে ফিউশন ঘটাতে পারে না, সেহেতু তার হাইড্রোজেন ফিউশনের হারও কম।

আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আসতেই পারে, রেড ডোয়ার্ফের ভর সূর্যের ভরের চাইতে অনেক অনেক কম, ভর কম মানে হাইড্রোজেনের পরিমাণও কম, তাহলে এটা এত বছর টিকে কীভাবে? ছোট্ট ভাষায় উত্তর হলো: এটা অপচয় করে না।

নক্ষত্রগুলো, উদাহরণ হিসাবে আমাদের সবচাইতে কাছের নক্ষত্র সূর্যকে বিবেচনা করি, সূর্যের কেন্দ্রের চারপাশে একটা অঞ্চলে রশ্মি বিকিরিত হয় সবসময়। যাকে বলা হয় রশ্মি বিকিরিত অঞ্চল বা Radiative zone। সূর্য শুধু এই অঞ্চলটার ভেতরকার হাইড্রোজেনই ব্যবহার করে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। কারণ এই অঞ্চলটার রশ্মি বিকিরণ করে বিধায় সূর্যের বাকি অংশ থেকে সূর্যকে একপ্রকার আলাদাই করে রাখে বলা যায়। ফলে সূর্য নিজের সবটুকু ব্যবহার করতে পারে না। ১০% ব্যবহার করতে পারে মাত্র। শুধুমাত্র সূর্য না, অন্য নক্ষত্রের বেলায়ও এটা সত্য।

এখানেই রেড ডোয়ার্ফ কচ্ছপের টেকনিক ব্যবহার করে। রেড ডোয়ার্ফ আকারে ছোটো এবং পুরোটাই সংশ্লেষিত করা সম্ভব। সূর্যের অভ্যন্তরীণ গ্র্যাভিটি সেই রেডিয়েটিভ জোন অতিক্রম করে হাইড্রোজেন কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারে না, ডোয়ার্ফের রেডিয়েটিভ জোন নেই বললেই চলে। খুব সহজেই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম কেন্দ্রে নিয়ে আসা সম্ভব হয়, কারণ সেখানে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন মিশ্রিত হয়ে হাইড্রোজেন কেন্দ্রে আনতে সক্ষম হয়। সম্পূর্ণ ফিউশন ঘটে। অর্থাৎ, রেড ডোয়ার্ফ ১০০% এনার্জি ব্যবহার করতে পারে।

এর মানে হচ্ছে, পৃথিবীর ১০% ভরওয়ালা একটা রেড ডোয়ার্ফ কিন্তু সূর্যের সমান ফুয়েল ব্যবহার করে। আর ডোয়ার্ফের ফিউশন রেট অনেক কম, এজন্য এটা অনেক বেশি সময় টেকে। এজন্য সূর্য বাঁচে ১০ বিলিয়ন বছরের মতো, অন্য দিকে রেড ডোয়ার্ফ ৬ থেকে ১২ ট্রিলিয়ন বছর বেঁচে থাকতে পারে। ডোয়ার্ফের ভর ৩৫% এর মতো হলে সেটা তার জন্য ভালো।

কচ্ছপ খরগোশের দৌড়টা মনে আছে? এটা এর মহাকাশীয় ভার্সন। রেড ডোয়ার্ফটা হচ্ছে কচ্ছপ! ধীর কিন্তু ধারাবাহিক।
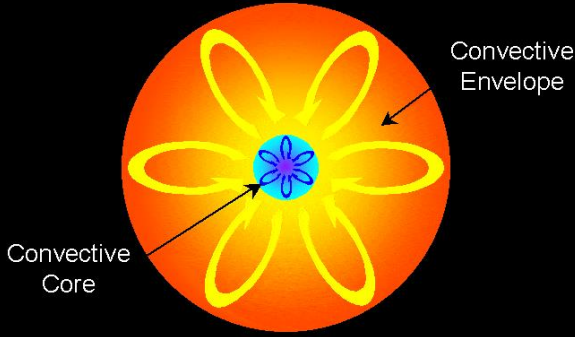
চিত্র ৩: রেড ডোয়ার্ফের অভ্যন্তর

রেড ডোয়ার্ফ খুব ছোটো না? তাহলে অন্য তারারা এদের সরিয়ে দেয় না বা তাদেরকে টেনে নিজেদের মধ্যে আনে না কেন? এখানে কি প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভব?

দেখো, মানলাম তারাটা ছোটো, ভর কম, কিন্তু এখানেই ধোঁকা খাওয়া যাবে না। কারণ এসব তারাদের সক্ষমতা নেহাতই কম নয়। আমরা জানলাম, রেড ডোয়ার্ফ কিন্তু নিজেকে নিজে সংশ্লেষণ করে, ফলে স্টারের সার্ফেসে কিছু স্পট তৈরি হয়। আমাদের সূর্যেও এমন স্পট আছে। পুরো তারার অর্ধেকের মতো এই স্টার স্পটই দখল করে থাকে। আর স্পট অঞ্চলে তাপমাত্রা কম থাকে। ফলে বাইরে থেকে দেখতে ঠান্ডা মনে হলেও এর বেশিরভাগ তাপই ভেতরের দিকে থাকে। একই সাথে প্রচণ্ড ঠান্ডা আবার গরম! এরা নিজেদের উজ্জ্বলতা মিনিটের মধ্যেই দ্বিগুণ করে ফেলতে পারে। আবার, প্রথম দিকে যেহেতু এরা একটু হলেও বেশি এনার্জি রিলিজ করে, ফলে তরুণ রেড ডোয়ার্ফগুলোর গতিও অনেক বেশি হয়, একটা সাধারণ নক্ষত্রের চাইতেও অনেক বেশি। এই প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণন এর তীব্র ম্যাগনেটিক শক্তির নিদর্শন দেয় এবং এই শক্তিটা প্রকাশ পায় জ্বলন্ত শিখার মাধ্যমে, এর পরিমাণ সূর্যের চাইতেও প্রায় ১০ হাজার গুণ বেশি। এজন্যই, রেড ডোয়ার্ফের দিকে তাকালেই মনে হয়, লাল রংয়ের একটা আগুনের গোলা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

এমন জ্বলন্ত নক্ষত্র যা তার আশেপাশের বস্তুগুলোতে তার তীব্র ম্যাগনেটিক ফোর্সের প্রভাব বিস্তার করে, এমন নক্ষত্র দ্বারা কোনো সিস্টেম থাকলে সেখানে প্রাণের উপস্থিতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অন্তত যেসব রেড ডোয়ার্ফ নতুন সেগুলোতে। সেখানে যেসব গ্রহ থাকবে সেগুলোর একদিক হবে প্রচণ্ড গরম, অন্য দিক হবে প্রচণ্ড ঠান্ডা। ফলে পানি থাকলেও তা শুকিয়ে যাবে। তবে..তবে..তবে, রেড ডোয়ার্ফ এর যখন বয়স হবে, তখন খুব সম্ভবত সেটা বসবাসের উপযোগী হবে। এজন্য, বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। এজন্য এটাকে বলে, জীবজগতের শেষ ভরসা।
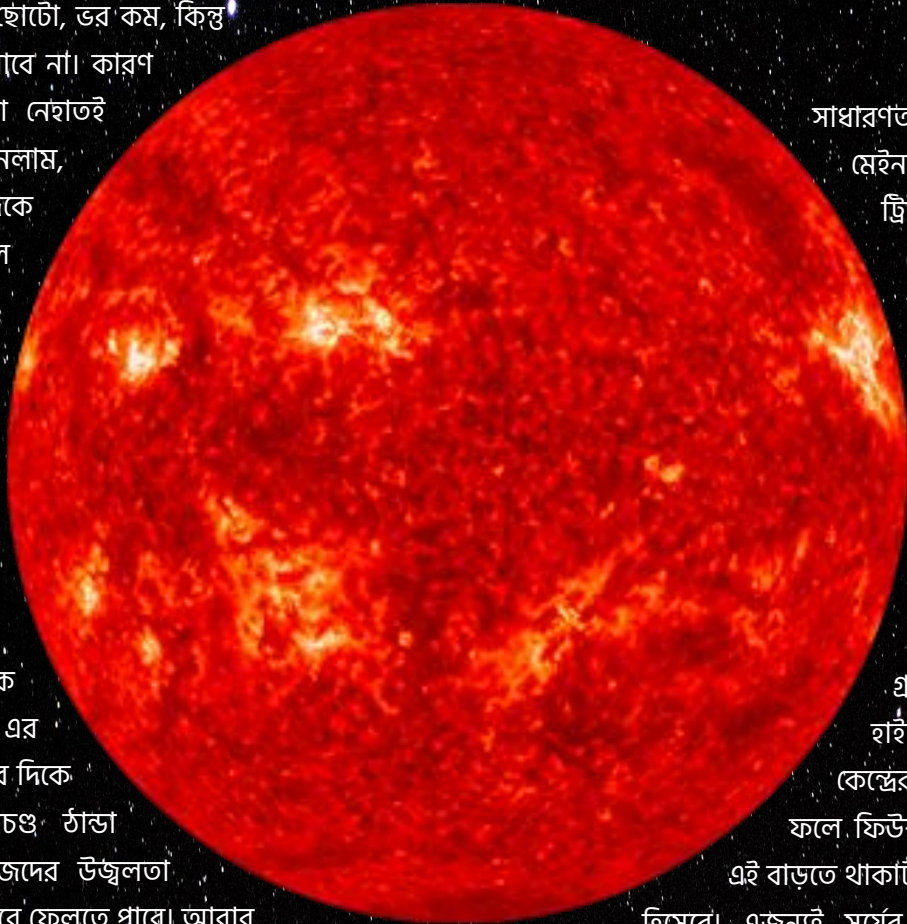
সাধারণত, জন্মের সূচনালগ্ন থেকেই মেইন সিকুয়েন্সের নিচের দিকে ট্রিলিয়ন বছর কাটিয়ে দেয় রেড ডোয়ার্ফ। হাইড্রোজেন ফিউশন করে হিলিয়াম তৈরি করে ও শক্তি তৈরি করে। আস্তে আস্তে রেড ডোয়ার্ফের ভর বাড়তে থাকে, ভর বাড়তে থাকা মানে ঘনত্বও বাড়তে থাকা। ভর যতই বেশি হয়, অভ্যন্তরীণ গ্র্যাভিটি বেড়ে যায়, আর হাইড্রোজেনগুলো দ্রুত কেন্দ্রের দিকে আসা শুরু করে। ফলে ফিউশনের হার বাড়তে থাকে। এই বাড়তে থাকাটা আসলে ১০ এর ফ্যাক্টর হিসেবে। এজন্যই সূর্যের ১০% ভর থাকা রেড ডোয়ার্ফের ১০ ট্রিলিয়ন বছর বাঁচার কথা থাকলেও এই ফ্যাক্টর

হিসেবে ফিউশন বাড়ায় তারা ৩ ট্রিলিয়ন বছর কম বাঁচে, ৭ ট্রিলিয়ন বছরের মতো বাঁচে।

আমরা জানলাম, একটা রেড ডোয়ার্ফের ফিউশন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, তাই না? তাহলে তো তার শক্তির নির্গমনও বেড়ে যাওয়ার কথা। শক্তির নির্গমন বেড়ে গেলে তো আর লাল থাকবে না, কালার চেইঞ্জ করবে, সাদা বা নীলের দিকে চলে যাবে এবং এটাই হয়। এটা আস্তে আস্তে ব্লু ডোয়ার্ফে পরিণত হয়। এখান থেকেই বিজ্ঞানীদের সকল আশা ভরসার সূচনা।
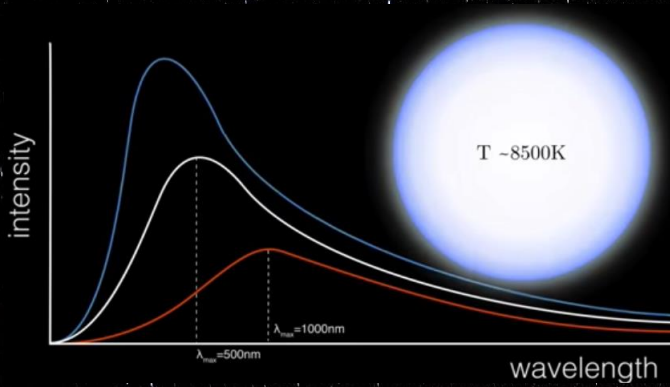
চিত্র ৪: লাল লাইনে কম ওয়েভলেংথ, রং লাল। সাদা লাইনে একটু বেশি ওয়েভলেংথ, রং সাদা। প্রচুর শক্তি হয়ে গেলে নীল লাইনের মতো বেশি ওয়েভলেংথ বিকিরণ করবে, রং হবে নীল।

শক্তির নির্গমন মানে আস্তে আস্তে শক্তি হারানো। যখন রেড ডোয়ার্ফ হোয়াইট বা ব্লু ডোয়ার্ফে পরিণত হওয়া শুরু করবে, তখন থেকেই তার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যাবে বলা যায়।

সূর্যের ৩ ভাগের ১ ভাগ ভরের একটা ব্লু ডোয়ার্ফ প্রায় ৭-৮ বিলিয়ন বছর টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ, রেড ডোয়ার্ফ তার জীবনের শেষের দিকে ৭ বিলিয়ন বছরের মতো বসবাসযোগ্য হতে পারে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, ব্লু ডোয়ার্ফের চারপাশে কোনো সিস্টেমে বসবাসযোগ্য অঞ্চল ও পানি থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর ৬-৭ বিলিয়ন বছর, কোনো একটা সিভিলাইজেশন গড়তে ও তা ধ্বংস হতে যথেষ্ট। আমাদের পৃথিবীর সিভিলাইজেশনেরই মাত্র ৪.৫ বিলিয়ন বছর বয়স।

ব্লু ডোয়ার্ফ, হোয়াইট ডোয়ার্ফ আর ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ বিশাল বিশাল টপিক, সেগুলো নিয়ে আলাদা আর্টিকেল লেখা হবে বলে আশা করি। আমরা রেড ডোয়ার্ফেই থাকি।

আজ থেকে আগামী ৭ বিলিয়ন বছর পরে সূর্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। যদি আমাদের সভ্যতা টিকে থাকে এবং আমরা আমাদের এই সভ্যতাকে আরও বেশি টিকিয়ে রাখতে চাই, আমাদের হাতে বিকল্প কোনো বসবাসের সিস্টেম খুঁজতে হবে, আর সেজন্য রেড ডোয়ার্ফকে খোঁজা হয়, এজন্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের লাস্ট হোপ।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, সূর্য ধ্বংস হয়ে গেলে কি আমরা সূর্যের মতো অন্য গ্রহে গিয়ে বসবাস করতে পারি না? রেড ডোয়ার্ফেই কেন গিয়ে থাকতে হবে?

উত্তরটা হলো, আজ থেকে ৫ বিলিয়ন বছর পরে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ও অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি দুটোর সংঘর্ষ হওয়ার কথা। যদি তা হয়, তবে আমাদের চিরপরিচিত আকাশ একেবারেই পালটে যাবে। নতুন সেই গ্যালাক্সিতে গ্যাসের সংকট দেখা দেবে, ফলে নতুন কিছু তারার জন্ম হলেও প্রায় অনেক তারাই সুপারনোভার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র সম্বল হিসেবে টিকে থাকবে রেড ডোয়ার্ফ, যদিও-বা ততক্ষণে সেটা বিকশিত হয়ে তখন ব্লু ডোয়ার্ফে পরিণত হবে।

তবে এই ব্লু ডোয়ার্ফের মধ্যেও একসময় হিলিয়াম বল তৈরি হবে। আস্তে আস্তে নিভে আসবে; তাই আলো, নীল থেকে লাল, লাল থেকে কালো... একসময় চিরতরে হারিয়ে যাবে সেই রেড ডোয়ার্ফ। ভর বেড়ে যাবে, ঘনত্ব বেড়ে যাবে, সাইজ হয়ে যাবে পৃথিবীর সমান, আস্তে আস্তে আরও ছোটো। একসময় ব্ল্যাক ডোয়ার্ফে পরিণত হয়ে] এর মৃত্যু ঘটবে। যদি আমাদের সিভিলাইভেশন তখন রেড ডোয়ার্ফের সিস্টেমে বসবাস করে, তবে হয়তো-বা তারা মহাবিশ্বের এই শেষ তারাটির মৃত্যু দেখতে পারবে।

এখন কথা হলো, রেড ডোয়ার্ফের সিস্টেমে আগে থেকেই কিছু হ্যাবিটেবল জোন অর্থাৎ মানুষের বসবাসের উপযোগী সিস্টেম আছে, পুরো মিল্কিওয়েতে এমন রেড ডোয়ার্ফের সংখ্যা ৫% এরও কম। এই ৫% কতটুকু জানেন? ৬০ হাজার। তো বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এমনও হতে পারে যে, পুরোনো কোনো রেড ডোয়ার্ফে প্রাণ আছে। হয়তো-বা তারাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় রেড ডোয়ার্ফের আশেপাশে নিজেদের বসতি স্থাপন করেছে। থাকতেই তো পারে। হয়তো-বা আমরা সেখানে এলিয়েনের দেখা পেতে পারি, অথবা নিজেরাই সেখানে এলিয়েন হয়ে যেতে পারি। সব সময়ের ব্যাপার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১) রেড ডোয়ার্ফ সম্পর্কে আমরা যা জানি তার প্রায় পুরোটাই থিয়োরিটিক্যাল।

২) রেড ডোয়ার্ফকে গরিব বলে সম্বোধন করা পুরোটাই কল্পিত, আর্টিকেলে কিছু রস যোগ করার প্রচেষ্টা। গরিব বলতে ছোটো বোঝানো হচ্ছে।

৩) ডার্ক ও হোয়াইট ডোয়ার্ফ নিয়ে আলোচনা করিনি, সেজন্য কিছু জায়গায় সেগুলোকে রেড ডোয়ার্ফ বলে সম্বোধন করেছি। প্রথমের গল্পটাতেও।

৪) আর্টিকেলটির তথ্য যে কয়েকটি বই থেকে লেখা, সেখানে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সে ভিত্তিতে তথ্য দেওয়া হয়েছে। উইকিপিডিয়াতে বর্তমানে কিছু তথ্য আছে সেগুলোর সাথে পার্থক্য থাকতে পারে।

৫) কোনো ভুল থাকলে অবশ্যই ধরিয়ে দেবেন আশা করি।
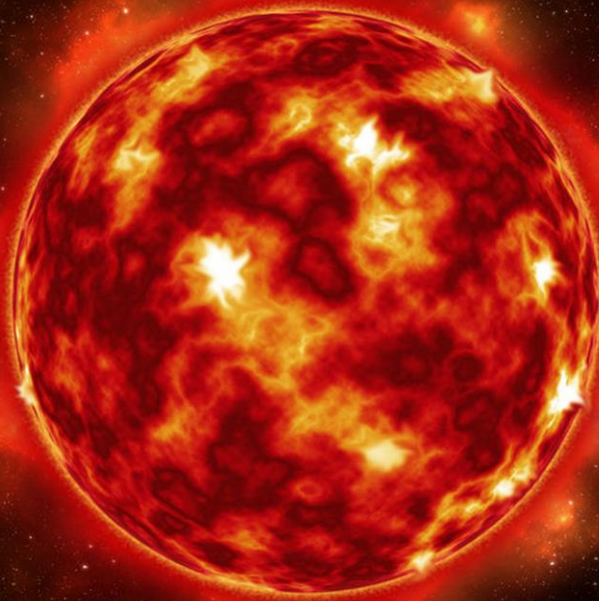
নক্ষত্রের জীবন

তাজ আহমেদ

রাতের আকাশে তাকালে দেখতে পাই ছোটো ছোটো কুপিবাতির মতো জ্বলছে কিছু বিন্দু। এরা অনেকেই সূর্যের চেয়ে বিশাল, কিন্তু অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় ছোটো বিন্দুর মতো দেখা যায়। এরাই হলো নক্ষত্র, যারা এই নিকষ অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাবিশ্বকে নিরন্তর আলোকিত করে যাচ্ছে।

নক্ষত্রের জীবনচক্র-

নক্ষত্রের জন্ম:

নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে, আমরা সবাই জানি। কোথা থেকে এলো সেই আলো?

নক্ষত্রের জন্ম হয় বিশালাকার গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ দ্বারা তৈরি বিশাল মহাজাগতিক মেঘ বা মলিকিউলার ক্লাউড থেকে।

এর কিছু কিছু অঞ্চলে গ্যাসপুঞ্জ অধিক ঘনীভূত অবস্থায় থাকে যা নেবুলা বা নীহারিকা নামেও পরিচিত হয়। এই মলিকিউলার ক্লাউডের নীহারিকাগুলোই নক্ষত্রের জন্মস্থান।

এই নীহারিকাগুলোর মধ্যে থাকে ৪৫%-৭৫% হাইড্রোজেন, ২০%-৩৫% হিলিয়াম ও ৫% অন্যান্য বস্তুপুঞ্জ।
একসময় নীহারিকার কিছু অঞ্চল, যেখানে গ্যাসের ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি, তা আপন মহাকর্ষের প্রভাবে সংকুচিত হতে থাকে এবং গ্যাসীয় গোলক তৈরি করতে থাকে। এই বল সদৃশ অংশটিকে তখন আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং একে বলা হয় প্রোটোস্টার বা শিশু নক্ষত্র। এটি নক্ষত্রের জন্মের প্রথম ধাপ। পরবর্তীতে প্রোটোস্টার হয় নক্ষত্রের সুগঠিত কেন্দ্র। মহাকর্ষের প্রভাবে কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস আবদ্ধ হয় এবং তাকে ঘিরে বাইরের গ্যাসসমূহ আকর্ষিত হতে থাকে এবং নক্ষত্রটিতে ভর যোগ হতে থাকে।
ক্লাউডের আয়তনের ওপর ভিত্তি করে ছোটো, মাঝারি বা বড়ো মাপের নক্ষত্র তৈরি হয়। কেন্দ্রকে ঘিরে সারফেস (উপরিভাগ) তৈরি হতে থাকে। কেন্দ্রে গ্যাসসমূহ অধিক ঘনীভূত থাকে বলে কেন্দ্রের ভর পুরো স্টারের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি হয় এবং তীব্র তাপ ও চাপ উৎপন্ন হয়।
মিলিয়ন বছর পরে তীব্র তাপ ও চাপের কারণে কেন্দ্রে থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন আরম্ভ হয় এবং ফিউশন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম প্রস্তুত হতে থাকে। ছড়িয়ে পড়ে নক্ষত্রের আলো ও তাপ।
ততদিনে কেন্দ্রকে ঘিরে আকর্ষিত হতে থাকা গ্যাসের ডিস্কসমূহ মহাকর্ষের প্রভাবে জুড়ে গিয়ে নক্ষত্রের সারফেস তথা উপরিভাগ গঠন করে ফেলেছে। তৈরি হয়েছে একটি নক্ষত্র।
থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন আস্তে আস্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ হাইড্রোজেন বার্নিং স্টার গঠিত হয়। দিতে থাকে তাপ ও আলো।

জীবন ও যৌবন:
যৌবনকালে সবকিছুই তেজস্বী থাকে। নক্ষত্রেরও একই দশা।
নক্ষত্রের পুরো জীবনব্যাপী ফিউশন চলাকালীন বিস্ফোরণের বহির্মুখী চাপ ও মহাকর্ষ বলের মধ্যে সাম্য বজায় থাকে। ফলে নক্ষত্রটি সংকুচিত কিংবা প্রসারিত হয় না। মিলিয়ন বছর ধরে দিতে থাকে তাপ ও আলো।

বার্ধক্য ও শেষ পরিণতি:
নক্ষত্রের ফিউশনের ফলে প্রতিনিয়ত ভর হারাতে থাকে। ফিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি শেষ হতে থাকে। হাইড্রোজেন কমে যাওয়ায় ফিউশনের হার কমে যায়। তখন বিস্ফোরণ ও মহাকর্ষ বলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।
এক্ষেত্রে নক্ষত্রের তিনটি শেষ পরিণতি দেখা যায়। হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত বামন, নিউট্রন স্টার বা নিউট্রন তারকা, ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর। তারাগুলোর শেষ পরিণতি বোঝা যায় চন্দ্রশেখর লিমিট থেকে। আমাদের সূর্যের ভরকে বলা হয় ১ সৌরভর বা $1M_\odot$। চন্দ্রশেখর প্রমাণ করে দেখান যে, সংকুচিত হওয়ার পর নক্ষত্রের কেন্দ্রের ভর সর্বোচ্চ $1.4M_\odot$ পর্যন্ত হলে তা একটি হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত বামন হবে। কেন্দ্রের ভর $1.5M_\odot$ থেকে $3M_\odot$ হলে হবে নিউট্রন স্টার ও এর চাইতে বেশি হলে পরিণত হবে ব্ল্যাক হোলে।

মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা-

হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত বামন:
মহাকর্ষ ও ফিউশনের মধ্যকার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রটি তীব্র মহাকর্ষের প্রভাবে আবার সংকুচিত ও উত্তপ্ত হতে থাকে এবং বাকি থাকা হাইড্রোজেনকে আরও দ্রুত ফিউজ করে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করতে থাকে। এই

গতিশক্তি নক্ষত্রের উপরিভাগকে বাইরের দিকে ঠেলতে থাকে। নক্ষত্রটি সম্প্রসারিত হয়। আমাদের সূর্যের মতো মাঝারি বা ছোটো মাপের তারাগুলো এ প্রক্রিয়ায় রেড জায়ান্ট-এ (লাল দানব) পরিণত হয়। নক্ষত্রটির আকার তার আগের চেয়ে অনেকগুণ বেশি বৃদ্ধি পায়। সূর্যের মতো তারাগুলোর প্রসারণের হার বেড়ে গেলে উপরিভাগকে মহাকাশে ছড়িয়ে দেয় এবং জন্ম হয় প্ল্যানেটরি নেবুলার। বাকি থাকে অত্যন্ত উত্তপ্ত, ঘনীভূত, তীব্র মহাকর্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্র। কেন্দ্র এত বেশি উত্তপ্ত হয় যে এটি হাইড্রোজেন থেকে প্রস্তুত করা হিলিয়ামকেও ফিউজ করার সক্ষমতা অর্জন করে। হিলিয়াম থেকে পর্যায়ক্রমে কার্বন, অক্সিজেন, সিলিকন ও আয়রন উৎপন্ন করে।

1.4$M_\odot$ বা তার কম ভরের সংকুচিত নক্ষত্রগুলো কার্বন বা অক্সিজেন পর্যন্ত ফিউজড হয়ে স্থিতিশীল হয়ে যায়। এরপর কার্বন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত মৃত নক্ষত্রটিতে আর কোনো ফিউশন হয় না এবং এটি ধীরে ধীরে তাপ ও আলো বিকিরণ করে ঠান্ডা হতে থাকে। একটি শ্বেত বামনের এই ঠান্ডা হওয়ার প্রক্রিয়া অনেক ধীর, তাই এটি অনেক দিন পর্যন্ত আলো দেয়। এদের মহাবিশ্বের সম্ভাব্য শেষ আলোর উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর পদার্থ এত ঘনীভূত অবস্থায় থাকে যে এক চামচ পদার্থের ওজন হবে ৬৫ টনেরও বেশি। এর মহাকর্ষও অনেক বেশি হওয়ায় যে-কোনো কিছু এর উপর রাখলে তা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

নিউট্রন স্টার:

1.4$M_\odot$ থেকে 3$M_\odot$ এর সমান কেন্দ্রবিশিষ্ট তারাগুলোর প্রসারণ হার অনেক বেশি হয়। এরা বাইরের আবরণকে তীব্র গতিতে মহাকাশে ছড়িয়ে দেয়, যাকে আমরা সুপারনোভা এক্সপ্লোশন বা অতিতারকা বিস্ফোরণ নামে চিনি। এরপর বাকি থাকা কেন্দ্রটি শ্বেত বামনের মতো একই প্রক্রিয়ায় সংকুচিত হতে থাকে। কেন্দ্রটি এত উত্তপ্ত হয় যে তা কার্বন ও অক্সিজেন ফিউশনের পর সিলিকন ও আয়রন সৃষ্টি করে। এরপর স্থিতিশীল হয়ে সংকুচিত হতে থাকে। তীব্র মহাকর্ষের ফলে পরমাণুর মধ্যে থাকা ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের ফাঁকা স্থান দূর হয়ে যায়। একে বলা হয় ইলেকট্রন ডিজেনারেসি।

ইলেকট্রন ডিজেনারেসির ফলে ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে নিউট্রন গঠিত হয়। নক্ষত্রটিতে তখন শুধু নিউট্রন ঠাসাঠাসি করে নিউক্লিয়োপাস্তার আকারে থাকে। তাই এর নাম নিউট্রন স্টার।

নিউট্রন স্টারের এক চামচ পদার্থের ওজন কয়েক বিলিয়ন টন হতে পারে।

এর আকর্ষণ বল শ্বেত বামনের চেয়েও অনেক বেশি যা আপনাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে।

নিউট্রন স্টার খুব দ্রুত ঘোরে এবং এদের উপরিভাগের তাপমাত্রা 10^{11} থেকে 10^{12} কেলভিন পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা অনেক ধরনের হয়ে থাকে।

পালসার: যারা কিছু সময় পর পর তীব্র রেডিয়েশন পালস নির্গত করে।

ম্যাগনেটার: বড়ো আকৃতির নিউট্রন স্টার।

বাইনারি নিউট্রন স্টার: দুটি নিউট্রন স্টার একে অপরকে ঘিরে আবর্তন করে।

ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর:
এবার আসি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং তারকার বিষয়ে যার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। সংকুচিত তারার ভর $3M_\odot$ এর বেশি হলে সুপারনোভার পর নিউট্রন স্টারের মতো প্রক্রিয়াই অনুসরণ করে। কিন্তু এদের ভর অত্যধিক বেশি হওয়ায় সংকুচিত হওয়ার পর তীব্র ভরের প্রভাবে এরা আরও বেশি সংকুচিত হয়। এতটাই সংকুচিত হয় যে, সমস্ত ভর একটি ক্ষুদ্র জায়গাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে, যাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। এর আকর্ষণ বল এত বেশি যে একটি নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত এটি সব বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, যাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরে কিছু প্রবেশ করলে তা আর বেরুতে পারে না। এই সিঙ্গুলারিটি আর ইভেন্ট হরাইজন নিয়েই ব্ল্যাক হোল গঠিত।
এর মহাকর্ষ এত বেশি যে কিছুই এর মধ্য থেকে বের হতে পারে না, এমনকি আলোও নয়। তাই এটি আলো প্রতিফলিত করে না। এর বাইরের ইভেন্ট হরাইজনের চারপাশে যেখানে আলোকিত বস্তুসমূহ ঘুরতে থাকে সে জায়গাটিকে এক্রেশন ডিস্ক বলে। এক্রেশন ডিস্কের ঘূর্ণায়মান আলোকিত বস্তুসমূহ থেকেই ব্ল্যাক হোলকে চিহ্নিত করা যায়। এর ভেতরে ঢুকতে গেলে আপনার অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনি অণু-পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে যাবেন।
ব্ল্যাক হোল সাধারণত কয়েক ধরনের হয়।

স্টেলার ব্ল্যাক হোল: ছোটো আকৃতির ব্ল্যাক হোল।
ইন্টারমিডিয়েট মাস ব্ল্যাক হোল: মাঝারি আকৃতির ব্ল্যাক হোল।
সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল: এরা বিশালাকৃতির নক্ষত্রের পরবর্তী অবস্থা। দুই বা ততোধিক ব্ল্যাক হোল একত্র হয়েও গঠিত হতে পারে।

এই ছিল নক্ষত্রের জীবনচক্র ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা। জীবনকালের চেয়ে মৃত্যু ও পরবর্তীকাল যেন বেশি আকর্ষণীয়। মৃত্যু হয়েও যেন মৃত্যু হয় না নক্ষত্রের। পুনর্জীবন লাভ করে কোটি কোটি বছর ধরে রাজত্ব করে চলে এই বিশাল মহাকাশে।

মানমন্দির

রাজেশ মজুমদার

সম্প্রতি একটি খবর নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। সেটি হলো ঢাকার অদূরে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় নির্মাণ করা হবে 'বঙ্গবন্ধু মানমন্দির'। সুখবরটি সবার অজানা ছিল। খবরটি সামনে নিয়ে এসেছিলেন লেখক, পদার্থবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে তিনটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত রেখা আছে। সেগুলো হলো কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি এবং বিষুবরেখা। ঠিক এরকম চারটি উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত রেখা আছে। সেগুলো হলো শূন্য ডিগ্রি, ৯০ ডিগ্রি, ১৮০ ডিগ্রি এবং ২৭০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা। চারটি উত্তর-দক্ষিণ রেখা এবং তিনটি পূর্ব-পশ্চিম রেখা, সব মিলিয়ে বারো জায়গায় ছেদ করেছে। বারোটি বিন্দুর দশটি বিন্দুই পড়েছে সাগরে-মহাসাগরে। এর মধ্যে শুধু দুইটি ছেদবিন্দু পড়েছে স্থলভাগে। এর একটি পড়েছে সাহারা মরুভূমিতে আর অন্য বিন্দুটি বাংলাদেশে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে কর্কটক্রান্তি এবং ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার ছেদবিন্দুটি পড়েছে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায়। ঠিক এখানেই বঙ্গবন্ধুর নামে মানমন্দির নির্মাণের প্রস্তাব উঠেছে। এর নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে ২২২ কোটি টাকা। এটি নির্মিত হলে সত্যিই মহাকাশ গবেষণায় বাংলাদেশের নাম ছড়িয়ে যাবে।

অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে, আসলে এই 'মানমন্দির' কী? না, কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষের উপাসনাগার নয় এটি। তবে এটি মহাকাশচর্চার উপাসনাগার বা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে মহাকাশচর্চার গবেষণাগার।

অবজারভেটরি শব্দটি এসেছে 'অবজার্ভ' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'পর্যবেক্ষণ' করা। আর 'অবজারভেটরি' অর্থ হলো পর্যবেক্ষণাগার। বাংলায় একে মানমন্দিরও বলা হয়। এবার

অনেকেই বুঝেছেন, মানমন্দির মূলত অবজারভেটরির বাংলা প্রতিশব্দ। মূলত মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণের জন্য গড়ে তোলা হয় ‘পর্যবেক্ষণাগার’। তবে সব পর্যবেক্ষণাগার শুধু মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি করা হয় না; বরং আবহাওয়া, জলবায়ু এবং আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে গবেষণার জন্য গড়ে তোলা হয় ‘পর্যবেক্ষণাগার’। তবে আজকের আলোচনা শুধু ‘মহাকাশ পর্যবেক্ষণাগার’ বা ‘স্পেস অবজারভেটরি’ সম্পর্কে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণাগার তৈরি করা করা হয় মহাকাশের বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য। কিছু কিছু পর্যবেক্ষণাগার শুধু একটি টেলিস্কোপের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, আবার কিছু ভালো পর্যবেক্ষণাগারে রয়েছে ২০টিরও বেশি টেলিস্কোপ।

মহাকাশের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। সূর্য-চাঁদ এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি ও আকৃতি নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই কারও। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এই কৌতূহল মেটাতে নানা তৎপরতা চলছে। আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য লোকালয় থেকে দূরে উঁচু পাহাড় বা খোলা প্রান্তরে অবকাঠামো গড়ে তোলার রেওয়াজও শুরু হয়েছে বহু আগেই। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের দিকে মিশরে 'মানমন্দির' গড়ে ওঠে। প্রাচীন মিশরের পাশাপাশি মায়া, চৈনিক, ভারতীয় ও গ্রিক সভ্যতায় মানমন্দির বানিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এছাড়া মুসলিম সভ্যতায়ও রয়েছে মানমন্দিরের ইতিহাস। ১৭ শতকের শুরুতে গ্যালিলিও প্রতিসরণ দুরবিন আবিষ্কারের পর মহাকাশ পর্যবেক্ষণে বিপ্লব ঘটে। ধীরে ধীরে আধুনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়। মানুষের দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয় কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। এখন মহাকাশেও হাবল টেলিস্কোপের মতো মানমন্দির গড়ে উঠেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণাগার সাধারণত ৪ ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো হলো:

১. মহাকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার
২. আকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার
৩. ভূ-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার এবং
৪. ভূ-অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণাগার

এসব পর্যবেক্ষণাগার বা মানমন্দিরে সাধারণত টেলিস্কোপ, শক্তিশালী কম্পাস, বেতার বা বিভিন্ন মহাকাশীয় তরঙ্গ শনাক্তকারী উন্নত যন্ত্রপাতি থাকে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পর্যবেক্ষণাগার হচ্ছে ভূ-ভিত্তিক।

ভূ-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগারগুলোতে বিজ্ঞানীরা সাধারণত লোকালয় থেকে দূরে ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করে দৃশ্যমান আলো এবং বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ শনাক্ত করে তাঁদের গবেষণা সম্পন্ন করেন। তবে এখানকার বেশিরভাগ টেলিস্কোপই আলোকীয় তথা অপটিক্যাল টেলিস্কোপ। এগুলো গম্বুজ আকৃতির ঘরে সংরক্ষিত থাকে, ফলে প্রতিকূল আবহাওয়ায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এছাড়াও গম্বুজগুলোকে সুবিধামতো যে-কোনো দিকে ঘুরিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়। তবে বেতার টেলিস্কোপগুলো কোনো গম্বুজ আকৃতির ঘরে সংরক্ষিত থাকে না। বেশিরভাগ ভূ-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার আলোকদূষণজনিত কারণে লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা হয়। তবে এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে যে জায়গায় অন্ধকার আকাশ, পরিষ্কার আবহাওয়া রয়েছে, সেই জায়গা। পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যবেক্ষণাগারগুলোর অধিকাংশই ভূ-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার। তবে এই পর্যবেক্ষণাগারের প্রধান সমস্যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং আকস্মিক আবহাওয়া পরিবর্তন! তবে এসব প্রতিকূলতা কাটিয়েই প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে পর্যবেক্ষণাগারের বিজ্ঞানীরা।

১৯৩০ এর দশকের প্রথম দিকে বেতার টেলিস্কোপ তৈরি করা শুরু হয়। এসময় থেকেই রেডিয়ো জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক দারুণ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। বেতার পর্যবেক্ষণাগারগুলো

সাধারণত অনেকগুলো যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এখানে বড়ো বেতার প্রেরক এবং প্রাপক যন্ত্র থেকে শুরু করে কন্ট্রোল সেন্টার, ভিজিটর সেন্টার, ড্যাটা সেন্টার এমনকি রক্ষণাবেক্ষণ সেন্টারও থাকে। এই পর্যবেক্ষণাগারগুলো তৈরিতে অনেক বিশাল জায়গা প্রয়োজন হয়। এগুলো লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা হয়; কারণ রেডিয়ো বা টেলিভিশন এমনকি মোবাইল ফোন থেকে নিঃসৃত ছোট্ট একটি তরঙ্গ এই পর্যবেক্ষণাগারের ক্ষতি সাধন করতে পারে। কিছু বিখ্যাত রেডিয়ো পর্যবেক্ষণাগার হলো:
Jodrell Bank in the UK, Arecibo in Puerto Rico, Parkes in New South Wales, Australia and Chajnantor in Chile.

মহাকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার হলো সাধারণত বিভিন্ন ধরনের টেলিস্কোপ অথবা কৃত্রিম উপগ্রহ। এগুলো সাধারণত মহাকাশে স্থাপন করা হয় এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। এগুলো খুব সহজেই অবিকৃত সংকেত গ্রহণ করতে পারে; তাই গবেষণাকার্য দ্রুত সফল হয়। এছাড়া বায়ুমণ্ডলের বাধাও এক্ষেত্রে থাকে না। তবে মহাকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার বা টেলিস্কোপগুলো সাধারণত খুব দামি হয়ে থাকে। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও প্রচুর টাকা খরচ হয়। তবে এগুলো অন্যান্য পর্যবেক্ষণাগার থেকে অনেক ছোটো হয়। যেমন: হাবল টেলিস্কোপের আকৃতি একটি মাঝারি আকৃতির বাসের সমান!

আকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগারগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরাংশে স্থাপন করা হয়ে থাকে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের বাধা কাটানো সহজ হয়। এদের সুবিধা ভূ-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার থেকে অনেক বেশি। এছাড়াও মহাকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার থেকেও এদের সুবিধা বেশি। কারণ এদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। এর ফলে গবেষণাকার্য দ্রুত সম্পন্ন হয়। সাধারণত বড়ো আকৃতির বেলুন অথবা উড়োজাহাজ ব্যবহার করা হয় এসব পর্যবেক্ষণাগার তৈরিতে। এরকম কিছু আকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগার হলো:
The Kuiper Airborne Observatory and the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy.

কয়েকটি বিখ্যাত মহাকাশ পর্যবেক্ষণাগার:

লাওয়েল পর্যবেক্ষণাগার:
লাওয়েল পর্যবেক্ষণাগার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা রাজ্যের ফ্ল্যাগস্টাপে অবস্থিত একটি বিখ্যাত পর্যবেক্ষণাগার। এটি ১৮৯৪ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ‘পারসিভেল লাওয়েল’ কর্তৃক নির্মাণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণাগারেই ১৯৩০ সালে ‘ক্লাইড টমবাউ’ বামন গ্রহ ‘প্লুটো’ আবিষ্কার করেন। এই পর্যবেক্ষণাগারে প্রায় ১৭টি টেলিস্কোপ রয়েছে। ১৯৬৩ সালের অ্যাপোলো মিশনের আগমুহূর্তে এই পর্যবেক্ষণাগার থেকেই চাঁদের মানচিত্র তৈরি করা হয়। এই পর্যবেক্ষণাগারে রয়েছে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম প্রতিফলক টেলিস্কোপ (Lowell Discovery Telescope), যেটি প্রায় ৪.৩ মিটার লম্বা। এই পর্যবেক্ষণাগারে সাধারণত বহির্জাগতিক প্রাণের খোঁজে এবং বিভিন্ন গ্রহাণু উদ্ভাবনে কাজ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণাগারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো:

ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কার (১৯৭৭), হ্যালির ধূমকেতুর পর্যায়কালিক ঘূর্ণনের কারণ আবিষ্কার (১৯৮৫/৮৬), সবচেয়ে বড়ো তিনটি নক্ষত্র আবিষ্কার, প্লুটোর বায়ুমণ্ডল আবিষ্কার, প্লুটোর দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কার, এমনকি বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমেডে অক্সিজেনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় এখান থেকে।

পুলকোভো জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দির:

এটি একটি রাশিয়ান পর্যবেক্ষণাগার, যেটি সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ১৯ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এটি ইউনেস্কোর ‘World Heritage Site’ এর একটি অংশ। এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: www.gao.spb.ru

এই পর্যবেক্ষণাগার ১৮৩৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী Friedrich Georg Wilhelm Von Struve, কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর সর্বপ্রথম বানানো সবচেয়ে বড়ো টেলিস্কোপ ছিল এই পর্যবেক্ষণাগারে। তবে বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় এর চেয়ে বড়ো টেলিস্কোপ রয়েছে।

এই পর্যবেক্ষণাগারে অনেকগুলো নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়। এছাড়াও নানা কারণে এটি অনেক বিখ্যাত।

ভেরি লার্জ অ্যারে:

এটি নিউ মেক্সিকোতে অবস্থিত একটি রেডিয়ো অবজারভেটরি। এই পর্যবেক্ষণাগারের সবচেয়ে বড়ো টেলিস্কোপটি হলো একটি ২৫ মিটার রেডিয়ো টেলিস্কোপ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মূলত এই টেলিস্কোপের সাহায্যে ব্ল্যাক হোল, নতুন নক্ষত্রের প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু থেকে নিঃসৃত বেতার তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেন। এই পর্যবেক্ষণাগারটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,১২৪ মিটার ওপরে অবস্থিত। ১৯৭২ সালে জায়গাটি তৈরির কাজ আরম্ভ হলেও কাজ শেষ হয়েছিল ১৯৮০ সালে। এখনো এর উন্নতিকরণ চলছে। এই পর্যবেক্ষণাগারে থাকা রেডিয়ো টেলিস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য সংকেত গ্রহণের কাজেও এটি ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৯ সালে এই টেলিস্কোপের সাহায্যেই ভয়েজার-২ থেকে সংকেত গ্রহণ করা হয় (সেসময় ভয়েজার-২ নেপচুনকে অতিক্রম করছিল)। ২০১৭ সালে এখানে নতুন একটি মিশন চালু হয়। এর মাধ্যমে নতুন করে প্রায় ১০ মিলিয়ন নতুন মহাজাগতিক বস্তু আবিষ্কার সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

স্পিতজার স্পেস টেলিস্কোপ:

এটি একটি মহাকাশ পর্যবেক্ষণাগার। এই টেলিস্কোপটি ২০০৩ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় এবং ১৬ বছর ৫ মাস ৪ দিনের মিশন শেষ করে ৩০ জানুয়ারি ২০২০ সালে এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এই টেলিস্কোপের উৎক্ষেপণ ভর ছিল ৯৫০ কেজি। পরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিযোগে এর ভর আরও বেড়ে যায়। মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞানী Lyman Spitzer এর স্মরণে এই টেলিস্কোপের নামকরণ করা হয়। প্রায় ৭৭৬ মিলিয়ন ডলারের মিশনটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম সরাসরি টেলিস্কোপের মাধ্যমে একটি এক্সোপ্ল্যানেটের (HD 209458 b and TrES-1b) ছবি তোলার কৃতিত্ব দেখায় টেলিস্কোপটি। এরপর ২০০৭ সালে এক্সোপ্ল্যানেটটির পৃষ্ঠীয় তাপমাত্রাও মাপা হয় টেলিস্কোপটির সাহায্যে। ২০০৫ সালেই এই টেলিস্কোপ ব্যবহার করে মহাবিশ্বের প্রথম নক্ষত্রের আলো দেখতে পান বিজ্ঞানীরা। ২০০৬ সালে ৮০ আলোকবর্ষ দীর্ঘ 'ডাবল হেলিক্স নেবুলা' আবিষ্কৃত হয় এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে। ২০০৮ সালে বিজ্ঞানীরা এই টেলিস্কোপ ব্যবহার করে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একটি পোট্রেট তৈরি করেন, যেটি প্রায় ৮,০০,০০০ ছবির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। এরকম আরও অনেক আবিষ্কারের পর ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি টেলিস্কোপটি অবসর নেয়।

কুইপার অবজারভেটরি:

এটি একটি আকাশভিত্তিক মহাকাশ পর্যবেক্ষণাগার। এটি ছিল 'নাসা' কর্তৃক পরিচালিত একটি পর্যবেক্ষণাগার। পর্যবেক্ষণাগারটি একটি 'লকহিড সি-১৪১ এ স্টারলিফটার জেট এয়ারক্রাফট' এর ভেতর অবস্থিত ছিল। এটি ১৯৭৪ সালে আরেকটি আকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণাগারের (গ্যালিলিও এয়ারবোন অবজারভেটরি) বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। এখানে ছিলেন ২ জন পাইলট ও ১ জন ফ্লাইং ইঞ্জিনিয়ার। এছাড়াও মাঝে মাঝে থাকত বিভিন্ন গবেষণা দল। প্রতিবার গবেষণার সময় এটি প্রায় সাড়ে ৭ ঘণ্টা আকাশে অবস্থান করত। মূলত New Zealand, Australia, American Samoa, Panama, Japan, Guam, Brazil, Ecuador, Chile, Houston (Texas) and Hawaii – এসব দেশের ওপরের আকাশসীমায় পর্যবেক্ষণাগারটি অবস্থান করত। ১৯৯৫ সালে পর্যবেক্ষণাগারটি এর মিশন সম্পন্ন করে। বর্তমানে NASA এর বিকল্প হিসেবে 'SOFIA' নামক আরেকটি পর্যবেক্ষণাগার তৈরি করেছে। কুইপার পর্যবেক্ষণাগারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো:

১৯৭৭ সালে ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কারে সহযোগিতা, ১৯৮৮ সালে প্লুটোর বায়ুমণ্ডল আবিষ্কারে সহযোগিতা, এছাড়াও বিভিন্ন নক্ষত্রের গঠন ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার ইত্যাদি।

এখন পর্যন্ত বর্ণিত সবগুলো পর্যবেক্ষণাগার মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য বানানো হলেও কিছু পর্যবেক্ষণাগার মহাকাশ থেকে আগত তরঙ্গ ও কণার প্রকৃতি নির্ণয়ের

জন্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরকম একটি পর্যবেক্ষণাগার হলো ‘লাইগো’ বা ‘লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ অবজারভেটরি’ (ইংরেজিতে Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory – LIGO)। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত একটি মানমন্দির। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির কিপ থর্ন ও রোনাল্ড ড্রেভার এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির রেইনার ওয়েইস ১৯৯২ সালে যৌথভাবে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সে হিসেবে এটি ক্যালটেক ও এমআইটি'র বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় পরিচালিত একটি মানমন্দির। এর অর্থায়নের দায়িত্ব পালন করে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (এনএসএফ)। ২০০২ সালে এনএসএফ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা এনএসএফের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। এখন পর্যন্ত এনএসএফ অন্য কোনো প্রকল্পে এতটা অর্থ বরাদ্দ করেনি। লাইগোর বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও গবেষকদের গ্রুপের নাম ‘লাইগো সায়েন্টিফিক কলাবোরেশন’ (LIGO Scientific Collaboration – LSC) যাতে ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০০জন ব্যক্তি কর্মরত আছেন। তাঁদের মূল কাজ লাইগো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শনাক্তকরণ যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা এবং ভবিষ্যতে আরও সূক্ষ্ম শনাক্তকারকের উন্নয়ন। লাইগোর নির্দিষ্ট কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্ত করা।

পির, শিষ্য আর কোয়াসার

আবু সালেহ্ মহিবুল্লাহ্

(রিংটোন - বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা....)

– হ্যালো, কে বলচিস?

– বাবা, আমি।

– 'আমি'টা কে? নাম বল হতভাগা!

– (বাবা তো চেতি গেছে) নাম ছাড়েন বাবা, কামের কথায় আসি।

– আচ্ছা, বল তোর কী সমস্যা?

– বাবা, আকাশ-পাতাল নিয়ে কিছু লিখতে চাই।

– হতচ্ছাড়া, আকাশ পাতাল কীরে, হা? মহাকাশ, বল মহাকাশ।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি সেটা নিয়ে লিখতে চাই, বাবা। কিন্তু সমস্যা হলো আমি তো কিছুই পারি না।

– কোন বিষয়ে লিখবি রে পাগলা?

– ব্ল্যাক হোল, বাবা। জনগণের খোরাক।

– ওরে মূর্খ! তুই তো তোর ভবিষ্যতের মতো একটা টপিক খুঁজে বের করেছিস, দুইটাই অন্ধকার।

– তাহলে কী হবে, বাবা?

– আলোর সন্ধান কর, বৎস। কোয়াসার নিয়ে লেখা জমা দে।

– সেইটা কী জিনিস বাবা? ওটা কি খাওয়া যায়? মিষ্টি লাগে? না কি তিতা?

– চুপ! বাজে বকিস না। কোয়াসার হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে উজ্জ্বল জিনিস।

– এটা কোথায় থাকে?

– তোর বাড়ির পেছনে গাব গাছের মাথায় থাকে, হাঁদারাম! তুই এসেছিস আর্টিকেল লিখতে?

– বাবা, ও বাবা, আপনি তো সবার মুশকিল-আসান। একটু সাহায্য করুন।

– ঠিক আছে, কাঁদিসনে পাগলা। মন দিয়ে শোন। কোয়াসার থাকে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজনে। সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল ছাড়া অন্য এক ধরনের ব্ল্যাক হোল আছে, স্টেলার ব্ল্যাক হোল। এটা তৈরি হয় নক্ষত্রের মৃত্যুতে। আমরা ওদিকে যাব না। আমরা কথা বলব সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল নিয়ে। প্রত্যেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি করে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল আছে। আমাদের মিল্কিওয়ে তথা আকাশগঙ্গার কেন্দ্রেও একটি ব্ল্যাক হোল আছে। এগুলোর জন্ম মহাবিশ্বের জন্মের সময় হয়েছে। বুঝলি?

– একটু-একটু, কিন্তু মন দিয়ে শুনছি। বলুন আপনি।

– আরও সামনে বলার আগে তোর জানতে হবে ব্ল্যাক হোল কী জিনিস। ব্ল্যাক হোল হচ্ছে খুবই উচ্চ ভরসম্পন্ন বস্তু কিন্তু ভর অপেক্ষা আকার-আয়তনে অনেক ছোটো। অর্থাৎ, এর ঘনত্ব খুবই বেশি। আমাদের সূর্যের ভরের বিলিয়ন গুণ ভরবিশিষ্ট একটা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের আকার আমাদের সূর্যের সমান, এমনকি ছোটোও হতে পারে, আবার বড়োও হতে পারে; যদিও স্টেলার ব্ল্যাক হোল আকারে ছোটো হয়। ব্ল্যাক হোলের উচ্চ ভরের কারণে এর আশেপাশে স্পেইস-টাইম কার্ভেচার বেশি তথা মহাকর্ষ বলের পরিমাণ অত্যধিক হয়। এতই বেশি যে ব্ল্যাক হোল থেকে কোনো আলোর তরঙ্গ ফিরে আসতে পারে না। ব্ল্যাক হোল এর আশেপাশের গ্যাস এবং ধূলিকণা প্রচণ্ড বেগে নিজের ভেতর টেনে নেয়। বুঝলি?

– কিন্তু বাবা...

– আবার কী?

– আপনি তো বললেন ব্ল্যাক হোল থেকে আলোও ফিরে আসতে পারে না। তাইলে আমরা কোয়াসার অর্থাৎ, ওই উজ্জ্বল আলো কীভাবে দেখি?

– শোন তাহলে। ব্ল্যাক হোলের মধ্যে এর আশেপাশের সবকিছু যখন মহাকর্ষের টানে প্রবেশ করে তখন সেগুলো সেখানে হুট করেই প্রবেশ করে না। ব্ল্যাক হোলের চারিদিকে খুব গতিতে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে একসময় ব্ল্যাক হোলে পড়ে যায়। তাছাড়া ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষ বলেরও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমার বাইরে থেকে যে-কোনো বস্তু চাইলে ফিরে আসতে পারবে। এই সীমাকে বলে ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা-দিগন্ত। ব্ল্যাক হোলে পতিত হওয়া সবকিছুই ইভেন্ট হরাইজনের বাইরে প্রচুর গতিতে ঘুরতে থাকে। একে বলে অ্যাক্রেশন ডিস্ক। এর ফলে প্রচুর তাপ এবং রেডিয়ো তরঙ্গ, গামা রে উৎপন্ন হয়। আর এই আলো ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষ সীমার বাইরে থাকে বলে আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া উৎপন্ন আলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাহায্যে প্রচণ্ড গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। একে জেট বলে। তবে ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্র অন্ধকার থাকে। অ্যাক্রেশন ডিস্কে গ্যাস এবং ধূলিকণার সংঘর্ষের ফলে তাপ এবং আলো উৎপন্ন হয়। এটি এতটা উজ্জ্বল নয়। যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড

কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হবে, অর্থাৎ জেট তৈরি হবে, তখন তা খুবই উজ্জ্বল হবে। আমাদের আকাশগঙ্গার মতো শ'খানেক গ্যালাক্সি একত্রিত করলে যতটা উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাবে, একটা কোয়াসার তার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। এজন্যই কোয়াসারকে সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু বলা হয়।

– আচ্ছা, আকাশগঙ্গার কেন্দ্রে তো ব্ল্যাক হোল আছে, সেখানে কি কোয়াসার দেখা যায়?

– ভালো প্রশ্ন। মিল্কিওয়ের ব্ল্যাক হোল স্যাজিটেরিয়াসে একসময় হয়তো কোয়াসার ছিল। কিন্তু এখন নেই। এর কারণ কোয়াসার তখনই হবে, যখন ধুলাবালি বা তদ্রুপ কিছু ব্ল্যাক হোলে প্রবেশ করবে। আকাশগঙ্গার কেন্দ্রের ধূলাবালি শেষ, তাই সেখানে এখন কোয়াসার নেই। অন্যান্য যে গ্যালাক্সিতে কোয়াসার দেখা যায়, সেগুলো বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। আর জানিস নিশ্চয়ই, দূরের তারাগুলোর দিকে তাকালে আমরা মূলত তাদের অতীত দেখি। এর মানে আমরা ওই গ্যালাক্সির বিলিয়ন বছর আগেকার ছবি দেখছি। হয়তো এখন অনেক ব্ল্যাক হোলের খাদ্য শেষ হয়ে গেছে। তাই কোয়াসার নেই। তবে তা বোঝা যাবে আরও বিলিয়ন বছর পর। কারণ সেখান থেকে আলো আসতে যে বিলিয়ন বছর লাগবে। এজন্য কোয়াসারগুলোকে মনে হয় মহাবিশ্বের শেষ সীমানায় অবস্থিত। কীরে? ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

– হুঁ? আরে না না! ঘুমাই নাই।

– আরেকটু শোন, যখন কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছিল তখন একে নক্ষত্রের মতো কিছু মনে করে এর নাম দেওয়া হয় আধা নক্ষত্র বা Quasi Stellar Objects (Quasar)। এই হলো কোয়াসারের গল্প।

– বাবা, আমার মাথায় তো ভালো করে ঢুকে নাই। কল রেকর্ড করেছি। এখন সেটা কপি করে লিখে ব্যাঙাচিতে দেবো। কপি করতে পারি?

– কর কিন্তু ক্রেডিট দিস। আর হাদিয়াটা নগদ করে দিস, ক্যাশ আউট চার্জসহ।

– হ্যালো? হ্যাএএএলোও??? বাবা কিছু শুনতে পাই না, টাওয়ারে নেট নাই। হ্যালো?

– ওরে বাটপার...
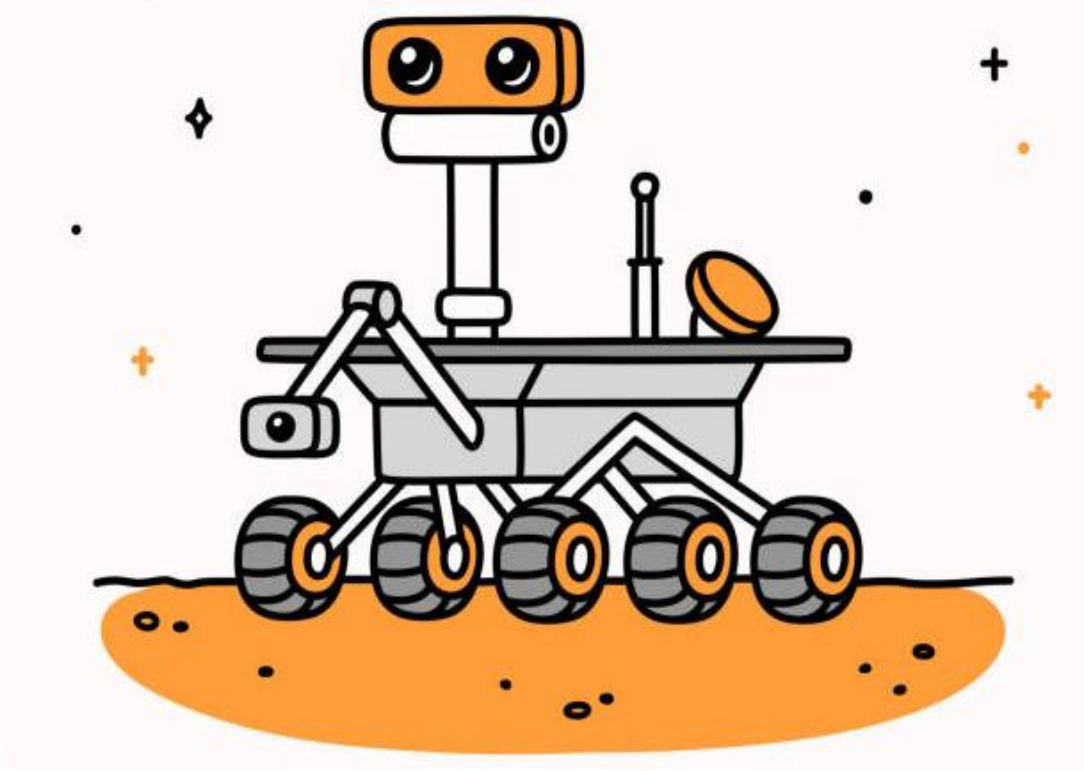
কিউরিওসিটি মার্স রোভার

মাহতাব মাহদি

(৯৫ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরের মঙ্গলে মানবজাতির প্রতিনিধি)

এই শীতের বিকালে আপনি, আমি যখন কম্বলের নিচে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছি, তখন ঠিক আমাদের পৃথিবী থেকে ৯৫ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরের মঙ্গল গ্রহে একটি যন্ত্র মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে মঙ্গলে বসবাস করছে। ১৯৯৭ সালের ৪ই জুলাই থেকে শুরু করে আজ ২০২০ সালে মঙ্গলে মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে রোভার ছিল এবং আছে। এখন পর্যন্ত ৬টা রোভার মঙ্গলে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে একটা মাত্র সচল আছে। তবে কিছু দিনের মধ্যে সেখানে আরেকটি রোভার নিক্ষেপণের প্ল্যানিং চলছে।
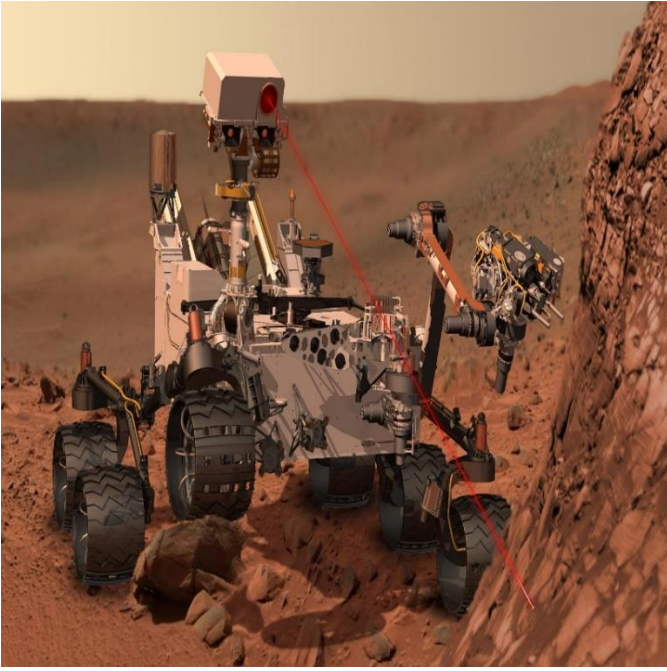
চিত্র: মার্স রোভারের মডেল।

অনেক আগে থেকেই মঙ্গলের বুকে মানবজাতি তাদের দ্বিতীয় বসতি স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু বললেই তো আর কোনো গ্রহে মানববসতি স্থাপন করা সম্ভব নয়। আগে সে গ্রহটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হয়। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন আছে কি না, পানি আছে কি না বা বেঁচে থাকার জন্য যে আবশ্যকীয় উপাদানগুলো দরকার সেগুলো আছে কি না; এগুলো জানার জন্য সরাসরি স্যাম্পল ও খুব কাছ থেকে ছবি দেখার দরকার হয়। তাই মানুষ এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ও বিস্তারিত জানতে মঙ্গলে রোবট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নাসা ১৯৯৭ সালের জুনে প্রথম রোভার উৎক্ষেপণ করে যার নাম *Sojourner* rover। এর আগেও ১৯৭১ সালে চীন ২টা রোভার মঙ্গলে পাঠায় যা সফলভাবে ল্যান্ডিং করলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবীর সাথে কম্যুনিকেশন হারায়। *Sojourner* rover প্রায় ২ মাস অ্যাকটিভ ছিল বিধায় আমেরিকার এই প্রোজেক্টটিকে প্রথম সফল রোভার উৎক্ষেপণ প্রোজেক্ট বলা হয়।
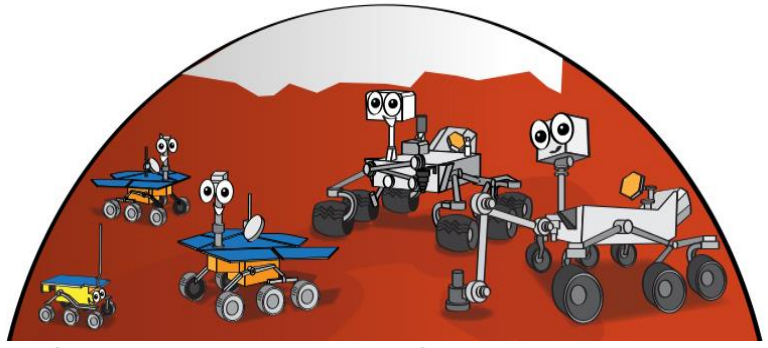
চিত্র ২: ৬টা মার্স রোভারের কার্টুন চিত্র।

৬টা মার্স রোভারের নাম ছিল মার্স ২ (চীন), মার্স ৩ (চীন), *Sojourner* rover (আমেরিকা), স্প্রিন্ট (আমেরিকা), Opportunity (আমেরিকা), কিউরিওসিটি (আমেরিকা)। এদের মধ্যে কিউরিওসিটি এখনো অ্যাক্টিভ। এটাই বর্তমানে মঙ্গলে মানবজাতির একমাত্র সচল প্রতিনিধি। চিত্র ৩-এ এদের দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব নিয়ে জানতে পারবেন।
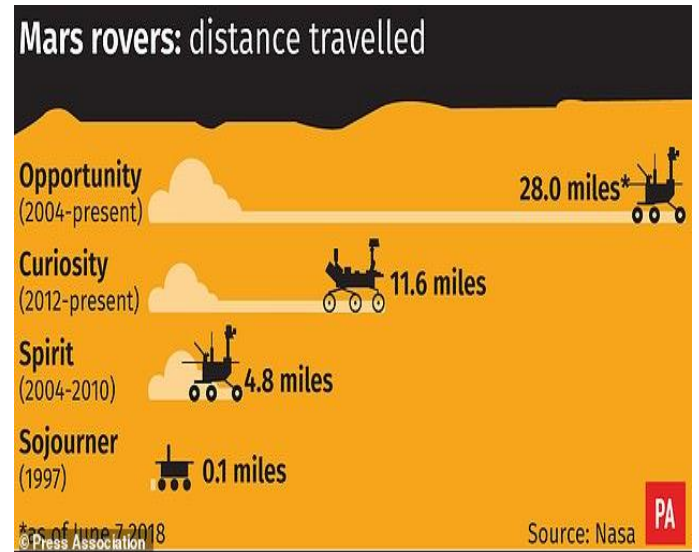
চিত্র ৩: মার্স রোভারদের দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব।

আজকে আমরা আলোচনা করব সচল মার্স রোভারটি নিয়ে যার নাম ‘কিউরিওসিটি’।

চিত্র ৪: কিউরিওসিটি রোভার

চিত্র ৫: কিউরিওসিটি রোভারের চাকা।

মঙ্গলে রোবট পাঠাতে আমাদেরকে কম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়নি। প্রথমে যে সমস্যার মুখোমুখি আমরা হই, সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন প্রবলেম। মঙ্গলের রেডিয়েশনের পরিমাণ এত বেশি যে সেখানে নরমাল কোনো কম্পিউটারের সার্কিট কাজ করে না। পৃথিবীর কোনো সাধারণ কম্পিউটার বা যন্ত্র সেখানে পাঠালে কম্পিউটারটির সার্কিট নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ অকেজো হয়ে যায়। এসময় এই সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, কম্পিউটারটির সার্কিট ও কম্পিউটার বডি এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি করবেন যাতে তা তেজস্ক্রিয়তা দীর্ঘক্ষণ সহ্য করতে পারে। সেজন্য একটি অপধাতু/সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করতে হলো, যার নাম বোরন। তবে এটা খুব ব্যয়বহুল হলো, কারণ প্রতিটি সার্কিট বোর্ডের জন্য দুই হাজার ডলার করে খরচ করতে হলো। এই পাওয়ার কম্পিউটারকে বলে Rover Compute Element অথবা RPC।

এখন যে বিষয় নিয়ে কথা বলব সেটা হচ্ছে রোভারের চাকা। আচ্ছা, কখনো কোনো রোভার দেখেছেন? খেয়াল করে দেখবেন এদের চাকা কিন্তু মসৃণ নয়। খাঁজকাটা খাঁজকাটা এবং অদ্ভুত সব ডিজাইন করা। আমাদের কিউরিওসিটির চাকারও ডিজাইন করা এভাবে। কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়? কারণ হচ্ছে এদের চলাচলের পথ ট্র্যাক করার জন্য। একে বলে odomity।
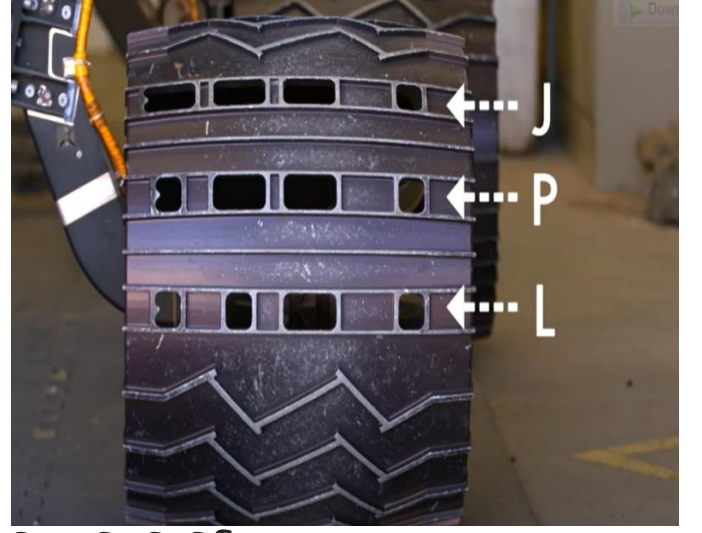
কিউরিওসিটির চাকা চিত্র ৫-এর মতো। সোর্স কোড দ্বারা ইংরেজি লেটারে JPL লেখা। এটা হলো Jet Propulsion Laboratory এর শর্ট ফর্ম। এই JPL ল্যাবেই কিউরিওসিটি মার্স রোভার তৈরি হয়। যখন মঙ্গলে সে চলাচল করে, তখন বালুতে ছাপ রেখে যায়। এই ছাপ দেখেই তার চলার পথ সম্পর্কে জানা যায় ও সে কোথায় আছে সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

কীভাবে আমরা রোভারের সাথে পৃথিবীতে সম্পর্ক রাখি? আসলে এই কানেকশন কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আমাদের ৯ম ২টা রোভার মার্স-২ ও মার্স-৩ মঙ্গলে ল্যান্ড করার পর পৃথিবীর সাথে কানেকশন হারানোর কারণেই কিন্তু মিশন সফল হয়নি।

তো আমরা দুইভাবে রোভারের সাথে কানেকশন রেখে থাকি। একটা ডিরেক্ট কানেকশন, মানে রোভার আমাদের তার অ্যান্টেনা দিয়ে আমাদের (পৃথিবীতে) রেডিয়ো ফ্রিকুয়েন্সিতে তথ্য পাঠায় আর আমরা আমাদের পৃথিবীর অ্যান্টেনা দিয়ে তা রিসিভ করি। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তথ্য খুব বেশি পাঠানো যায় না, আর পাঠালেও তা আসতে অনেক সময় লাগে। এজন্য ২য় পদ্ধতি অর্থাৎ, পৃথিবী ও রোভারের মধ্যে ৩য় মাধ্যম ব্যবহার করা হয়।

মঙ্গলের চারপাশে আমাদের কিছু অ্যান্টেনা আছে মঙ্গল পর্যবেক্ষণের জন্য, যাদের অরবিটার বলে। এরা আমাদের ৩য় মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। ফলে তথ্য প্রথমে রোভার থেকে

অরবিটরে যায়, সেখান থেকে পৃথিবীতে আসে। ফলে আমরা রোভার থেকে অনেক বেশি তথ্য পেয়ে থাকি।

মার্স রোভারের ১৭টা ক্যামেরা আর ১টা টেলিস্কোপ আছে। এটার আর্ম বা হাত একটা। তাই ১৮টা ক্যামেরার কয়েকটা দিয়ে সে মার্সের ছবি তোলে, বাকি ক্যামেরাগুলো দিয়ে সে নিজের চলাচলের পথ ঠিক রাখে। যেমন চাকার ওপরে ক্যামেরা থাকে যাতে সে কোনো পাথরের ওপর দিয়ে না চলে যায়। সামনের ক্যামেরাটা চোখের মতো কাজ করে। তার সামনে কী আছে, সেগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। এসব নির্দেশ পৃথিবী থেকে তার মধ্যে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে।

রোভারের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে SAM যার পূর্ণরূপ Sample Analysis at Mars। আমরা তো ছবি দেখে সবকিছু জানতে পারি না, পদার্থের স্যাম্পলও বিশ্লেষণ করতে হয়। এজন্য এই অংশটা দারুণ কাজ করে। এটাকে মুখের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

এটা ছোটো ছোটো নুড়ি পাথর খেয়ে চূর্ণ করে বালুর প্যালোটের মতো করে ফেলে। এরপর এই স্যাম্পল পরীক্ষা করে বের করে এখানে কী কী পদার্থ আছে, কী ধরনের গ্যাস আছে, পানির উপস্থিতি আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব তথ্য পরবর্তীতে সে পৃথিবীতে পাঠায়।

এভাবেই কিউরিওসিটি রোভার কাজ করে। আগের রোভারগুলোর কার্যপদ্ধতিও মোটামুটি একই ধরনের ছিল। এই রোভারগুলো মঙ্গলে আমাদের মানবজাতির প্রতিনিধি। হয়তো-বা কয়েক দশক বা শতাব্দী পরে মঙ্গলে আমাদের বসতি হবে। তখন আমাদের মনে রাখতে হবে এই রোভারগুলোকে, যারা মঙ্গলে মানবজাতির বসতি গঠনের প্রথম দিকে কাজ করছে।
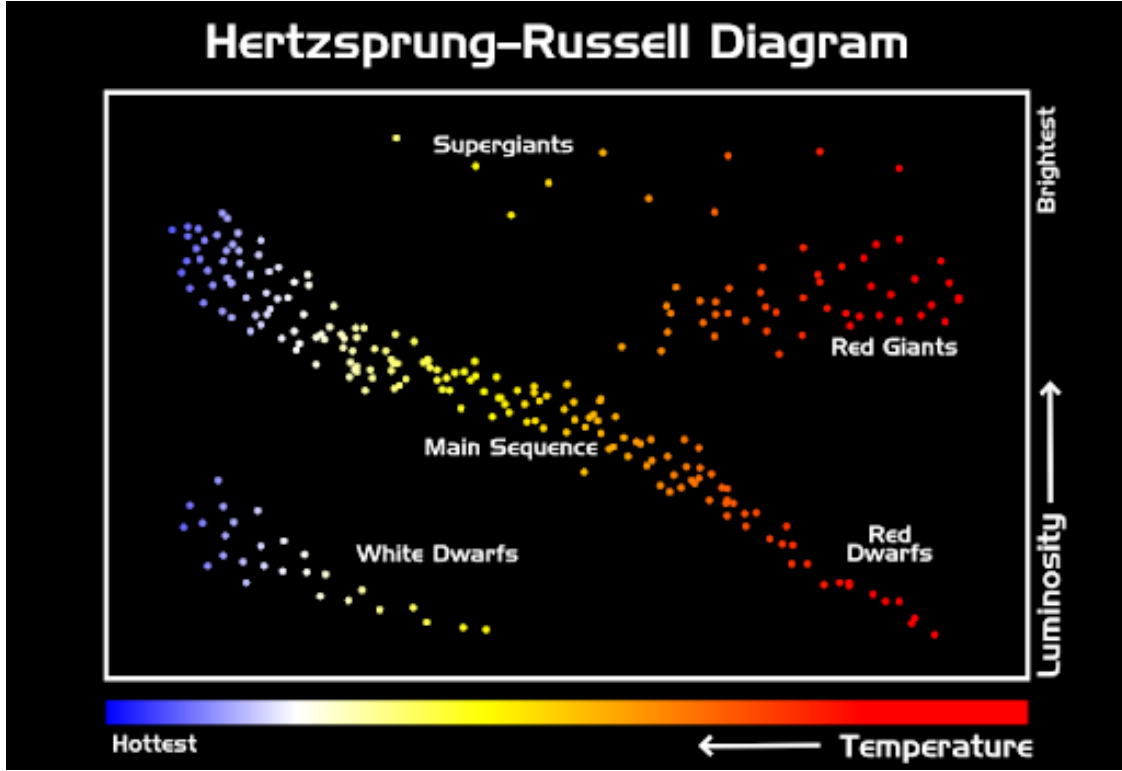
এইচ-আর ডায়াগ্রাম

(যেভাবে আমরা তারা সম্পর্কে জানি)

মাহতাব মাহদি

৪.৪ আলোকবর্ষ দূরের আলফা সেন্টরাই থেকে শুরু করে ৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের MACS J11492223। এত দূরের গ্রহ সম্পর্কে আমরা কীভাবে জানি? তাদের ভর, প্রকৃতি আকার সম্পর্কে আমরা কীভাবে জানি? উত্তর হচ্ছে Diagram দিয়ে। যার পূর্ণরূপ Hertzsprung-Russell Diagram বা সংক্ষেপে H-R Diagram। কারণ তা আবিষ্কার করেছিলেন Ejnar Hertzsprung এবং Henry Norris Russell। তবে আদি ধারণা ছিল গ্রিক দার্শনিক হিপারকাসের। বিষয়টা মোটেও জটিল নয়, খুব সহজে বোঝানো যায়।

অনেক অনেক দিন আগের এক রাত। গ্রিসের আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে। সেই আকাশের নিচে বসে তারা দেখছিলেন Hipparchus সাহেব। তিনি দেখলেন, আকাশের তারাগুলো সব এক উজ্জ্বলতার নয়। কিছু তারা বেশি উজ্জ্বল, কিছু তারা কম। তাই তিনি মনে করলেন, উজ্জ্বলতার ভিত্তিতে এদের ভাগ করা যায়। সেটাই করলেন তিনি। উজ্জ্বলতার ভিত্তিতে তারাগুলোকে ৬টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করলেন। ক্যাটাগরিগুলোকে ১, ২, ৩ এভাবে ৬ পর্যন্ত ধরা যায়। ক্যাটাগরি-১ ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা, ৬ ছিল তাঁর দেখা সবচেয়ে হালকা আলোর তারা।

Hipparchus-এর সময় লাইট পলিউশন ছিল না বললেই চলে। তবে তখনকার দিনে এখনকার মতো উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। খালি চোখে অনেক তারাই দেখা সম্ভব ছিলনা, কারণ সেগুলোর উজ্জ্বলতা অনেক কম ছিল। আমরা এখন আমাদের টেলিস্কোপ দিয়ে ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও উজ্জ্বল ও কম উজ্জ্বল তারা দেখতে সক্ষম। যদি ৬ এর থেকে কম উজ্জ্বল হয়, সেটাকে আমরা ৭, ৮ এমন ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারি। আবার ১ এর থেকে বেশি উজ্জ্বল তারাগুলোকে আমরা -১ ,-২ এভাবে নামকরণ করে থাকি। সেটা নিয়ে পরে বলছি।

এই যে Hipparchus ৬টা ভাগে ভাগ করলেন, তো এই ক্যাটাগরির মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? আগে একটা জিনিস বলে নিই, Hipparchus সাহেব যে উজ্জ্বলতার ভিত্তিতে একটা ক্যাটাগরি করলেন, একে বলা হয় অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিটিউড (apparent magnitude)। এই স্কেলে মোট ভাগ ৬টা। সবচেয়ে কম উজ্জ্বল ৬ নাম্বার ধাপ থেকে শুরু করে যদি মাত্র ৫ ঘর আগানো হয়, তখন তারার উজ্জ্বলতা প্রায় ১০০ গুণ বেশি হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ১ নাম্বার ক্যাটাগরির তারা ৬ নাম্বারের থেকে ১০০ গুন বেশি উজ্জ্বল। কেন? সেটা এই আর্টিকেলের টপিক নয়।

এখন অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিটিউডের একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করব। আলফা সেন্টরাই আমাদের থেকে ৪.৪ আলোকবর্ষ দূরে আছে, বিটা সেন্টরাই আছে ৩৯১.৪৩ আলোকর্ষ দূরে; কিন্তু পৃথিবী থেকে দুটোর আলো প্রায় সমান দেখা যায়। একটার অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিটিউড বা অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস (apparent magnitude or apparent brightness) ০.০১ আর আরেকটার ০.৬১। দুটোই কাছাকাছি ধরনের উজ্জ্বল দেখায় পৃথিবী থেকে (কাছাকাছি মানে ক্যাটাগরি এক আর কী)। কিন্তু পৃথিবী থেকে দুইটার দূরত্ব তো সমান নয়। ব্যাপারটা কল্পনা করা যাক, আপনার চোখের সামনে একটা মোমবাতি, আর ১০ ফিট দূরে একটা চার্জারের আলো; আপনার কাছে দুটোর আলোই একই লাগবে মোটামুটি। কিন্তু আসলে তো একটা মোমবাতি আর চার্জারের আলো সমান নয়। চার্জার দূরে থাকায় আমাদের দেখতে কম উজ্জ্বল দেখায়। তার মানে শুধু উজ্জ্বলতা পরিমাপ করলেই হচ্ছে না, আমাদের দূরত্বের বিষয়টাও মাথায় রাখতে হবে।

তো আমরা পৃথিবী থেকে একটা তারার মধ্যবর্তী দূরত্ব মাপতে পারি। এই দূরত্ব ও অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেসের সমন্বয়ে আমরা কোনো তারার আসল আলো বা আসল উজ্জ্বলতা মাপতে পারি। একে বলে True magnitude or absolute magnitude। তাহলে, এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম, আলফা সেন্টরাই ও বিটা সেন্টরাই এর অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস ০.০১ ও ০.৬১। এবার পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব বিবেচনায় নিয়ে আমরা যদি তাদের absolute magnitude বা absolute brightness পরিমাপ করি তাহলে আমরা পাই ৪.৩৮ আর -৪.৫১।

কী বোঝা গেল? আমরা আগেই বলেছিলাম, যে তারা যত বেশি উজ্জ্বল, তাদের ম্যাগনিটিউড ততই কম। মানে সত্যিকারের উজ্জ্বলতা দেখলে বিটা সেন্টরাইয়ের উজ্জ্বলতা আলফা সেন্টরাই থেকে অনেক বেশি; যদিও পৃথিবী থেকে দুটো দেখতেই প্রায় একই উজ্জ্বলতার মনে হয়।

এই প্রসেসে কোনোরকম সমস্যা ছাড়া আমরা তারার আসল উজ্জ্বলতার ওপর ভিত্তি করে তারাদের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব।

ছবি ১: Alpha centauri (yellow - red) & beta centauri (slightly blue)

তো উজ্জ্বলতার বিষয়টা তো গেল, এখন আমরা আসি তারাদের রং নিয়ে।

১ নাম্বার চিত্রটা একটু খেয়াল করি, দুটো তারার রং এক নয়। একটা হলদেটে লাল, আরেকটা প্রায় নীল। এই যে তারাদের এই রং, এগুলো কী বোঝায়? কেন হয় এই রং? এটা আসলে তারাদের তাপমাত্রা বোঝায়। এই তাপমাত্রা আসে তারাদের ভেতরকার ফিউশনের জন্য। বিস্তারিত জানতে আপনারা ইউন্স ল নিয়ে ইউটিউবে ভিডিয়ো দেখে নিতে পারেন।

এই যে তারাদের রং, এটা তাদের তাপমাত্রা প্রকাশ করে। আমরা জানি, তারার ভেতরকার তাপমাত্রা ৩ হাজার কেলভিন থেকে ৫০ হাজার কেলভিন পর্যন্ত হতে পারে। এটা অবশ্যই সার্ফেস টেম্পারেচার। নিউক্লিয়ার ফিউশন নিয়ে পড়লে বুঝতে পারবেন একটা তারার ভেতরে প্রায় মিলিয়ন কেলভিন টেম্পারেচার হতে পারে। যেমন: আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও ভেতরকার তাপমাত্রা অনেক বেশি।

এখন তাপমাত্রার বেসিসে আমরা কীভাবে স্টারকে ভাগ করি? যেসব তারার তাপমাত্রা কম হয় তারা হয় লাল বা হলুদ, আর যেসব তারার তাপমাত্রা বেশি হয় তাদের রং হয় নীল। এই এক লাইনের ব্যাখ্যা দিয়ে তেমন কিছুই বোঝা যায় না। তারার তাপমাত্রা বের করার জন্য একটা সূত্র আছে। যেটাকে মনে রাখা যায় একটা বাক্য দিয়ে, "একজন ভালো বালিকা হয়ে আমাকে চুম্বন করো!"

Oh **B**e **A** **F**ine **G**irl and **K**iss **M**e

এখানে বোল্ড করা ৭টা লেটার ৭টা ক্লাস্টার উল্লেখ করে। নিচের চার্টে তাদের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো:

	বৈশিষ্ট্য	তাপমাত্রা(কেলভিন)	রং	তারার উদাহরণ
O	আয়নিত ও ন্যাচারাল হিলিয়াম, দুর্বল হাইড্রোজেন	৩১,০০০ এর বেশি	আকাশি	Mintaka (O9)
B	ন্যাচারাল হিলিয়াম, শক্তিশালী হাইড্রোজেন	৯,৭৫০ থেকে ৩১,০০০	নীলচে সাদা	Rigel (B8)
A	স্ট্রং হাইড্রোজেন, আয়নিত ধাতু	৭,১০০ থেকে ৯,৭৫০	সাদা	Vega (A0)
F	দুর্বল হাইড্রোজেন, আয়নিত ধাতু	৫,৯৫০ থেকে ৯,৭৫০	হলদেটে সাদা	Canopus (F0)
G	দুর্বল হাইড্রোজেন, আয়নিত অথবা ন্যাচারাল ধাতু	৫,২৫০ থেকে ৫,৯৫০	হলুদ	Sun (G2)
K	দুর্বল হাইড্রোজেন, ন্যাচারাল ধাতু	৩,৮০০ থেকে ৫,২৫০	কমলা	Arctures (K2)
M	ন্যাচারাল ধাতু অণু	২,২০০ থেকে ৩,৮০০	লাল	Betelgeuse (M2)

চার্ট ১

প্রতিটি ভাগ আবার ১০টা ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে ০, ১, ২ এভাবে নামকরণ করা। সে জন্য উদাহরণে ব্র্যাকেটে তাদের ভাগ দেখানো হয়েছে। বেটেলজিউস এম-২, রিগেল বি-৮, আমাদের সূর্য জি-২।

এখন আপনি ওপরের চার্টটা জানেন। এখন আপনাকে আমি প্রশ্ন করলাম, যদি ভেগার রং সাদা হয়, তাহলে আপনি ভেগা সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেন? কেন পারেন না? দেখুন সাদা ভেগার তাপমাত্রা আর বর্ণ সম্পতর্কে আপনি জানেন। আরও কিছু জানতে পারেন কি? হ্যাঁ, পারেন। আপনি তাদের আকার, ব্যাস, উজ্জ্বলতা সম্পর্কেও ধারণা নিতে পারেন। নিচে একটা চার্ট দিচ্ছি যেটা উইকি থেকে কালেক্ট করা। ওটা দেখে নিলে বুঝবেন, কেন একটা তারার রং জানা আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ।

Star Type	Color	Approximate Surface Temperature	Average Mass (The Sun = 1)	Average Radius (The Sun = 1)	Average Luminosity (The Sun = 1)	Main Characteristics	Examples
O	Blue	over 25,000 K	60	15	1,400,000	Singly ionized helium lines (H I) either in emission or absorption. Strong UV continuum.	10 Lacertra
B	Blue	11,000 - 25,000 K	18	7	20,000	Neutral helium lines (H II) in absorption.	Rigel Spica
A	Blue	7,500 - 11,000 K	3.2	2.5	80	Hydrogen (H) lines strongest for A0 stars, decreasing for other A's.	Sirius, Vega
F	Blue to White	6,000 - 7,500 K	1.7	1.3	6	Ca II absorption. Metallic lines become noticeable.	Canopus, Procyon
G	White to Yellow	5,000 - 6,000 K	1.1	1.1	1.2	Absorption lines of neutral metallic atoms and ions (e.g. once-ionized calcium).	Sun, Capella
K	Orange to Red	3,500 - 5,000 K	0.8	0.9	0.4	Metallic lines, some blue continuum.	Arcturus, Aldebaran
M	Red	under 3,500 K	0.3	0.4	0.04 (very faint)	Some molecular bands of titanium oxide.	Betelgeuse, Antares

চার্ট ২

তো, তারার রং জানা গুরুত্বপূর্ণ বটে, তাই নয় কি?

রঙের বিষয়টা আমাদের আর্টিকেলের মূল টপিক ছিল না, পারিপার্শ্বিক কিছু জিনিস বোঝাতে এই টপিক নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হলো। এখন ফিরে আসি আমাদের মূল টপিকে। আমাদের হাতে এখন দুটো জিনিস আছে। একটা হলো তারাদের উজ্জ্বলতা বা ম্যাগনিটিউড, আর তাদের রং বা টেম্পারেচার।

এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এখন আমরা একটা ডায়াগ্রাম আঁকব। ডায়াগ্রামটা হবে নিচের চিত্রের মতো। একটা বক্সের মতো বাম পাশে থাকবে ম্যাগনিটিউড মানে স্টারের উজ্জ্বলতা, আসল উজ্জ্বলতা যা আমরা জানি, যত বেশি উজ্জ্বল হবে তারার ম্যাগনিটিউডের মান ততই কম হবে।

ডানে আছে লুমিনোসিটি। টপিকটা 'তারা-র গঠনে' ডিটেইলস পাবেন। আমি ছোট্ট ব্যাখ্যা দিই। এটা হচ্ছে তারার শক্তি নির্গমণের হার। এই নির্গমণকৃত শক্তির দ্বারাই কিন্তু তারার উজ্জ্বলতা পরিমাপ করা হয়। এটা বের করার একটা জোস সূত্র আছে। সূত্রটা হচ্ছে, L=AT4

বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। এই জিনিসটা অনেকটা লগের মতো। ১ এর পর ১০, ১০০ এভাবে আবার ১ এর কম ০.১, ০.০১, ০.০০১ এভাবে ১০ এর লগারিদম।
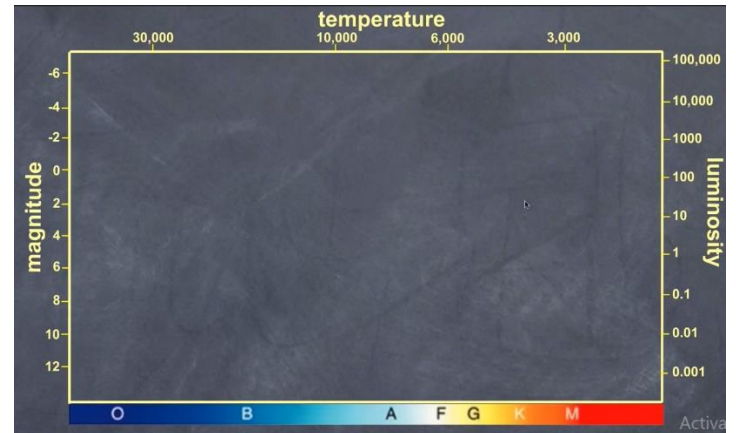
চিত্র ২: এইচ-আর ডায়াগ্রাম (১/২)

ওপরে আছে তাপমাত্রা, নিচে আছে তারাদের সেই শ্রেণীবিভাগ। দুটোই রিলেটেড। এখন আমরা তারাদের এই ডায়াগ্রাম অনুসারে প্লট করব। মানে ফোঁটা ফোঁটা আকারে বসাব বিভিন্ন ধরনের তারাকে।

বিভিন্ন ধরনের তারাকে বসানোর পর ডায়াগ্রামটা মোটামুটি নিচের চিত্রের মতো হবে–
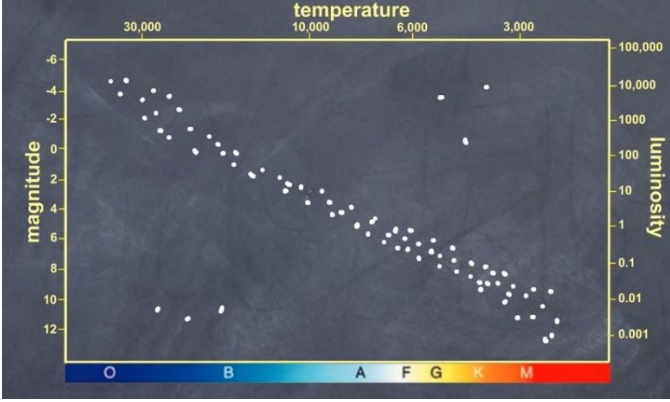
চিত্র ৩: এইচ আর ডায়াগ্রাম (২/২)

গ্রাফটা দেখে সবার প্রথমে তোমার মাথায় কী আসে? কোনো লাইন দেখতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ, মাঝে একটা লাইনের মতো দেখা যাচ্ছে। ৯৫% এর মতো তারাই ওই লাইনে রয়েছে। বেশ কিছু তারা, ৫% এর মতো,ওই লাইনের বাইরে। ওই লাইনটাকে সেজন্য বলা হচ্ছে মেইন সিকুয়েন্স (Main Sequence)। এবার লাইনের নিচের দিকে চোখ দিই; ওখানে দেখা যাচ্ছে ম্যাগনিটিউড কম মানে উজ্জ্বলতা কম। লাল রং এর ফলে আকারও ছোটো, আর শক্তি নির্গমণের হারও অনেক কম। ওই লাইন ধরে আমরা যতই ওপরে উঠব, তারার শক্তি নির্গমণের হার ততই বাড়বে, উজ্জ্বলতা বাড়বে, রং নীলের দিকে যাবে, তাপমাত্রাও বাড়তে শুরু করবে।

অর্থাৎ, ওপরের তারাগুলো বড়ো, মেইন সিকুয়েন্সের নিচের তারাগুলো ছোটো। তারা যত বড়ো হবে, ফিউশন তত বেশি হবে; ফলে জ্বালানি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। এতে তারার স্থায়িত্ব কমে যাওয়ার কথা এবং সেটাই হয়। ওপরের তারাগুলো প্রায় $১০^{৭}$ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে, যেখানে নিচের তারাগুলোর লাইফস্প্যান মোটামুটি $১০^{১১}$ বছর। অনেক বেশি। কারণ ছোটো তারার ফিউশন রেট কম। জ্বালানি শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। আমাদের সূর্য যেহেতু জি ক্লাস্টারে অর্থাৎ, মোটামুটি মাঝারি ও নিচের দিকে এবং এর লুমিনোসিটি হচ্ছে- ১।

এখন দেখা যাচ্ছে, মেইন সিকুয়েন্সের বাইরে কিছু তারা দেখা যাচ্ছে। চিত্রটার দিকে আরেকবার লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যায়, কিছু তারা যাদের তাপমাত্রা অনেক কম কিন্তু খুব উজ্জ্বল। এদেরকে বলা হয় জায়ান্টস। এরা কিন্তু কম তাপমাত্রার তারা কিন্তু এদের আকার অনেক বড়ো। তাই এদের বলা হয় GIANTS অথবা SUPER GAINTS। যেমন : বেটেলজিউস (এম২)।

এবার আরও কিছু তারা দেখা যাচ্ছে চিত্রের বামপাশের নিচের দিকে যারা আসলে বেশ গরম বা উত্তপ্ত। তবে এদের উজ্জ্বলতা বেশি নয়। কেন বেশি নয়? কারণ এদের আকার ছোটো। এদেরকে বলা হয় হোয়াইট ডোয়ার্ফ। White dwarf আসলে খুব ছোটো তারা, তবে বেশ গরম। তবে ছোটো হওয়ায় এদের লুমিনোসিটি কম। যেমন সাইরাসবি-৫ (Sirius B-5)।

তো এটাই ছিল H-R Diagram। তারাদের সম্পর্কে জানার জন্য এই চার্টটির ভূমিকা অনেক বেশি।
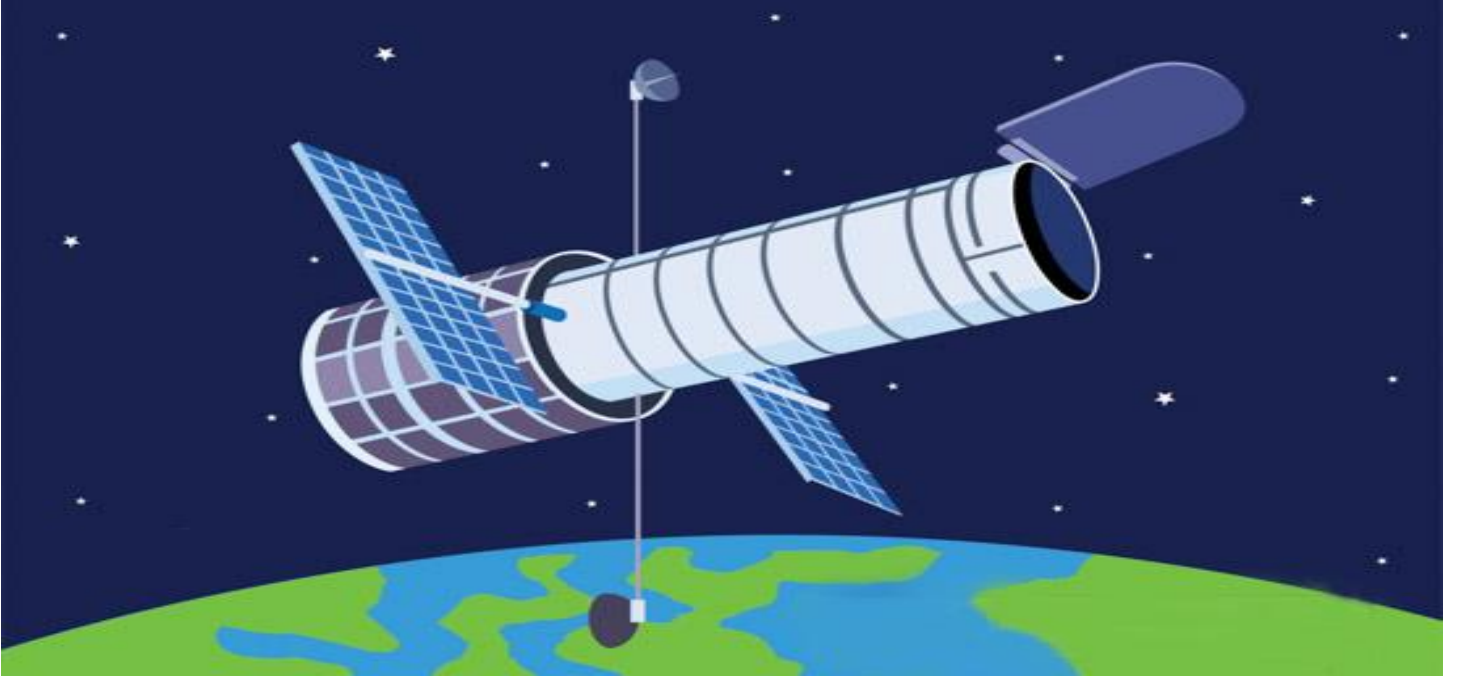
স্পেইস টেলিস্কোপ

রওনক শাহরিয়ার

মহাকাশ নিয়ে মানুষের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। আদি ও মধ্যযুগে তারার ওপর নির্ভর করা জীবনের অংশ ছিল। তাদের যাত্রা, ফসল, বাসস্থানসহ বিভিন্ন কাজে তারা তারার ওপর নির্ভর করত। বর্তমানে অনেক কিছুই বদলে গেছে; এখন মানুষের আগ্রহ তারাদের ছাড়িয়ে মহাবিশ্বের গভীরে প্রবেশ করেছে। প্রতিনিয়ত আমরা নিত্য-নতুন কোনো অবজারভেশনের কথা জানতে পারছি; সেটা ব্ল্যাক হোলের প্রথম ছবি বা দূরবর্তী গ্যালাক্সির খোঁজ বা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের সন্ধান।

এই চমৎকার সব আবিষ্কারের জন্য বা পর্যবেক্ষণের জন্য আদিকাল ও মধ্যযুগে অবজারভেটরি বা পর্যবেক্ষণাগার গড়ে তোলা হয়।

অবজারভেশনের পূর্বে তারার ওপর নির্ভর করে সব করা হলেও বর্তমানের উদ্দেশ্য অনেকটাই ভিন্ন।

বর্তমানের প্রযুক্তিগত উন্নতি গ্যালিলিও-এর হাত ধরে এসেছিল। তিনি পৃথিবীর বাইরের প্রকৃতি জানার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ছোট্ট টেলিস্কোপ দিয়ে; যদিও তিনি টেলিস্কোপের আবিষ্কারক নন। তবুও শনির বলয়, বৃহস্পতির চাঁদ, মিল্কিওয়ের নক্ষত্রসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তৎকালীন মতের বিপক্ষে গিয়ে নিজের

যুগান্তকারী মত প্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে রেনেসাঁসের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সময়ের সাথে টেলিস্কোপের আকার, জটিলতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এগুলো শহর থেকে দূরে এবং যতটা সম্ভব ওপরে তৈরির চেষ্টা করা হয়। বর্তমানের সকল অবজারভেটরিতে বিশাল আকারের টেলিস্কোপ রয়েছে। অবজারভেটরি কয়েক প্রকার হলেও মহাকাশে দৃষ্টি রাখার উপায় দুটো। ভূমি বা পৃথিবী থেকে এবং পৃথিবীর বাইরে থেকে বা মহাকাশ থেকে। বর্তমানে চীন, পেরু, ইউএস, অ্যান্টার্কটিকাসহ বিভিন্ন দেশে বৃহৎ আকৃতির অবজারভেটরি রয়েছে। ভূমি থেকে আকাশে দৃষ্টি রাখা সহজ, স্বল্প ব্যয় এবং ড্যাটা স্থানান্তর সহজ। আর স্পেইস থেকে পর্যবেক্ষণ করা কিছুটা কঠিন, স্পেইস-শাটল পাঠানো ও সবসময় নজরদারিতে রাখতে হয়। অত্যধিক খরচ, ড্যাটা সংগ্রহসহ বিভিন্ন কারণে স্পেইসে পর্যবেক্ষণাগার এখনও কম।

যদি পৃথিবীতে বৃহৎ আকৃতির অবজারভেটরি বানানো সম্ভব হয়, তবে মহাকাশে টেলিস্কোপ পাঠানোর কী দরকার?

মূলত এর জন্য দায়ী আমাদের বায়ুমণ্ডল। প্রথমত, জনবহুল অ্যারিয়াতে লাইট পলিউশন, বায়ু দূষণের জন্য ছবির শার্পনেস সীমাবদ্ধ হয়ে যায় (বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের বায়ুর আলোড়নের জন্য মূলত রাতের তারা জ্বলজ্বল করে আর স্পেইসে স্পষ্ট দেখা যায়) এবং মেঘ ও বৃষ্টি অবজারভেশনে বড়ো বাধা তৈরি করে।

আবার, ওজোন লেয়ার ইনফ্রারেড ও আল্ট্রাভায়োলেট-রে অনেকটাই শোষণ করে যা স্পেইস টেলিস্কোপ সহজে ডিটেক্ট করতে পারে। যদিও ভূমিস্থ টেলিস্কোপগুলো উন্নত করা হয়েছে এবং আকারে বিশাল, তবুও থার্মোস্ফিয়ারে আটকে যাওয়া কোনো তরঙ্গ শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। স্পেইস টেলিস্কোপ এসব থেকে মুক্ত; তাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পরিষ্কার চিত্রসমূহ এখান থেকেই পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

স্পেইস টেলিস্কোপের ধারণাটা একেবারেই নতুন। সর্বপ্রথম ১৯৪০ সালে এমন টেলিস্কোপের প্রস্তাবনা রাখা হয়। ১৯৪৬ সালে ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে একটি রিসার্চ পেপার বের হয় যেখানে অ্যাস্ট্রোনমিতে স্পেইস থেকে পর্যবেক্ষণের সুবিধা ও বড়ো আকারের স্পেইস টেলিস্কোপ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়, যে সময়ে কোনো স্যাটেলাইটও অরবিটে পাঠানো সম্ভব হয়নি। ১৯৬৯ সালে বৈজ্ঞানিকভাবে বড়ো স্পেইস টেলিস্কোপের সুবিধা সম্পর্কিত পেপার পাবলিশ হলে প্রথম টেলিস্কোপের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তারপর থেকে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ও ইঞ্জিনিয়াররা একযোগে বিশাল আকারের অবজারভেটরি নিমার্ণের কনসেপ্ট, বাজেট স্পেইসক্রাফটে পাঠানোর উপায় নির্ধারণ করেন। আমেরিকা সরকারের অনুমোদনের দীর্ঘ দশ বছর পর সকল ঝামেলার অবসান শেষে প্রথম বৃহৎ অবজারভেটরি বা হাবল টেলিস্কোপ প্রেরণ সম্ভব হয়। এই পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের জন্য স্পেইসে অনেক অবজারভেটরি পাঠানো হলেও নাসার বৃহৎ আকৃতির টেলিস্কোপ মূলত ৪টি। অন্যান্য মহাকাশ সংস্থারও কিছু টেলিস্কোপ রয়েছে, তবে হাবলের মতো কোনোটিই নয়। স্পেইস টেলিস্কোপের মানও বিভিন্ন ধরনের। যেমন- বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি (গামা-রে, এক্স-রে, আল্ট্রাভায়োলেট, দর্শনীয় আলো, ইনফ্রারেড, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি), পার্টিকেল ডিটেক্টর, গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়।

টেলিস্কোপের বিভিন্ন অংশ:

টেলিস্কোপের অসংখ্য যন্ত্রাংশ থাকে যার মাধ্যমে মহাকাশের আলো বিশ্লেষণ করা যায়। মূল কম্পিউটার বাদে এখানে হাবলের মূল কয়েকটি অংশ নিয়ে আলোচনা করা হলো–

আয়না:

মহাকাশের আলো যখন টেলিস্কোপে আসে তা প্রথমে প্রাথমিক আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে সামনের সেকেন্ডারি আয়নাতে যায় এবং সেখান থেকে প্রাথমিক আয়নার মাঝের ফুটো দিয়ে ফোকাল পয়েন্ট তৈরির আগে প্রবেশ করে এবং সেখানে থাকা যন্ত্রাংশে

প্রবেশ করে।

ক্যামেরা:

হাবলের মূল ক্যামেরা দুইটা। এই দুইটা ক্যামেরা একসাথে কাজ করে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (IR, visible, UV) আলো বিশ্লেষণ করে ওয়াইড ফিল্ড ছবি প্রদান করে।

স্পেকট্রোগ্রাফ:

স্পেকট্রোগ্রাফ নক্ষত্র হতে নির্গত বিভিন্ন উপাদানের বর্ণালি শনাক্ত করতে পারে। প্রিজমের মতো আলোকে ভেঙে তাপমাত্রা, ঘনত্ব, রাসায়নিক উপাদান ও বেগ নির্ণয় করতে পারে।

ইন্টারফেরোমিটার:

এর মূল কাজ হলো টেলিস্কোপকে স্থির লক্ষ্যে রাখতে সহায়তা করা এবং এটি আলাদা যন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। মোট তিনটি ইন্টারফেরোমিটারের দুইটা টার্গেট লক করে এবং একটি নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা ও আপেক্ষিক দূরত্ব নির্ণয় করে।

সোলার প্যানেল:

যাবতীয় বৈদ্যুতিক চাহিদা সোলার প্যানেল মিটিয়ে থাকে এবং ছয়টি ব্যাটারি স্টোর হয়।

জাইরোস্কোপ:

তিনটিসহ সবসময় মোট ছয়টি জাইরোস্কোপ **(**Gyroscope) টেলিস্কোপের উচ্চতা ও গতি নির্ণয় করে এবং কক্ষপথে থাকতে সহায়তা করে।

অ্যান্টেনা:

ড্যাটা ও কমান্ড প্রথমে টেলিস্কোপের দুটি শক্তিশালী অ্যান্টেনা দিয়ে নাসার দ্বিতীয় স্যাটেলাইটে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান থেকে ভূমিস্থ কন্ট্রোল সেন্টারে ড্যাটা গ্রহণ ও প্রেরণ করা হয়।
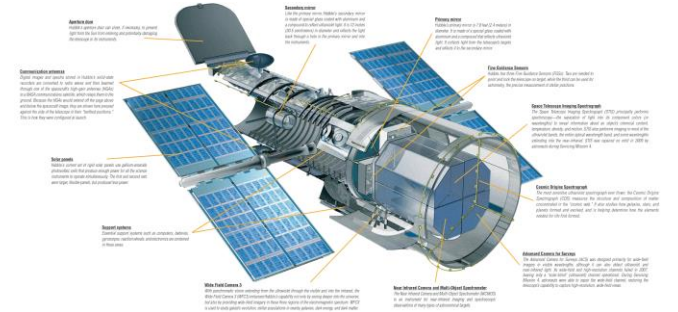
কয়েকটি বিখ্যাত স্পেইস টেলিস্কোপ–

হাবল টেলিস্কোপ (Hubble telescope): টেলিস্কোপের মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী ও পুরোনো টেলিস্কোপ যা ৩০ বছর ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আমাদের তথ্য দিয়ে যাচ্ছে। নাসার প্রথম স্পেইস অবজারভেটরি যা অ্যাস্ট্রোনমিতে নতুন রেভ্যুলেশন এনেছে এবং মহাবিশ্বের অগণিত বস্তুর আশ্চর্যজনক ছবি তুলেছে। মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরবর্তী বস্তু দেখা সম্ভব হয়েছে হাবল ডিপ ফিল্ড ও আল্ট্রা ডিপ ফিল্ড দিয়ে। ভূমি থেকে ৩৫০ মাইল ওপরে থাকা ৪৪ ফুট দৈর্ঘ্যের ও প্রায় ৯৩ টন ভরের টেলিস্কোপটি প্রায় ২০,০০০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এটি আল্ট্রাভায়োলেট ও ইনফ্রারেড আলো দেখতে সক্ষম। টেলিস্কোপটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে অ্যাস্ট্রোনটরা সেখানে যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় রিপেয়ার, পার্টস ইত্যাদি পরিবর্তন করে টেকনোলজিকে আপডেট রাখতে পারে। হাবল টেলিস্কোপে নতুনভাবে আলোকপাত করেছে মহাবিশ্বের সীমা, নক্ষত্রের জীবন, ব্ল্যাক হোল এবং প্রথম গ্যালাক্সির গঠনসহ অসংখ্য বিষয়ের। আশা করা যায়, টেলিস্কোপটি আরও কিছু বছর থাকবে এবং উত্তরসূরি জেমস ওয়েভ টেলিস্কোপের মাধ্যমে চির বিদায় নেবে।

চন্দ্রা এক্স-রে অবজারভেটরি:

চন্দ্রা, Subrahmanyan Chandrasekhar-এর নামে রাখা হয়েছে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এক্স-রে টেলিস্কোপ। এটি হাবল টেলিস্কোপের সাথে মূল ছবির পাশাপাশি এক্স-রে ডিটেক্ট করে। এই টেলিস্কোপ ১০^{৬} থেকে ১০^{৮} °C পর্যন্ত বস্তুর তাপমাত্রা বুঝতে পারে; ;যখন গ্যাসের অণু গরম হয়, অত্যন্ত দ্রুত চলার সময় সংঘর্ষ হয় এবং 10 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্স-রে ফোটন নির্গত হয়। এই অতি তাপমাত্রা উচ্চ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র বা অকল্পনীয় গ্র্যাভিটি বা অভাবনীয় ফোর্স থেকে আসে। এগুলো মহাবিশ্বের অদ্ভুত বস্তু যেমন–কোয়াসার, ক্লাস্টারে উত্তপ্ত বিশাল গ্যাসের কুণ্ডলী, বিস্ফোরিত তারা এবং ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজনে বস্তু টেনে নেওয়ার সময় হয়ে থাকে।

চন্দ্রা এক্স-রে টেলিস্কোপ নতুন যে জিনিস পেয়েছে তা হলো–লুকায়িত ব্ল্যাক হোল, মিল্কিওয়ের নিজস্ব ব্ল্যাক হোল, Sagittarius A*, মার্সের প্রথম ছবি, এক্স-রে ছবি।

ফার্মি গামা-রে স্পেইস টেলিস্কোপ:

এই টেলিস্কোপ আলাদা কোনো আয়না ব্যবহার না করে একটি স্পেশাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে; যেটা গামা-রে এর শক্তি ও গতিপথ নির্ণয় করতে পারে। এই টেলিস্কোপ 10 KeV থেকে 300 GeV পর্যন্ত শক্তি শনাক্ত করতে পারে এবং এর বিশাল ফিল্ড অব ভিউ রয়েছে। এটি একবারে আকাশের ২০% দেখতে পারে এবং সম্পূর্ণ আকাশ দেখে মাত্র তিন ঘণ্টায়। অ্যাস্ট্রোনোমাররা এর ফলাফলের ভিত্তিতে ব্ল্যাক হোল, অ্যাক্টিভ গ্যালাক্টিক নিউক্লিয়াই, ব্লাজারস, গামা-রে ব্লাস্ট ও সোলার ফ্লেয়ার সম্পর্কে গবেষণা করতে পারেন। আর কসমোলজিস্টরা মহাবিশ্বের জন্ম ও প্রাথমিক বিবর্তনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান।

অ্যান্ড্রোমিডাকে পাওয়ার প্রয়াসে

স্বপ্নীল জয়ধর

অ্যান্ড্রোমিডার কথা মনে আছে তো? ওই যে, আমাদের ছায়াপথের পর যে গ্যালাক্সি সবচেয়ে ভালোভাবে চোখে পড়ে, সেটা। সবচেয়ে কাছের স্পাইরাল গ্যালাক্সি হলো এই অ্যান্ড্রোমিডা। আজ আমরা সেই অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিকেই খুঁজব।

অনেক মজা হবে! তো শুরু করা যাক।

প্রথমেই আমরা অ্যান্ড্রোমিডা সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিই; তাহলে এগোতে সুবিধা হবে।

তো যা বললাম, অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি হলো আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সি চার্লস মেসিয়ারের মেসিয়ার তালিকায় ২৬ নম্বর সদস্য। এজন্য একে অনেক সময় M31 বলেও অবহিত করা হয়। সূর্য থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্যালাক্সিতে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন তারার বাস। আকারে আমাদের গ্যালাক্সি থেকে প্রায় দেড় গুণ বড়ো এই গ্যালাক্সিটিকে অ্যান্ড্রোমিডা-মণ্ডলের দিকে দেখা যায় বলে এই নামকরণ করা হয়েছে। চাঁদহীন অন্ধকার রাতে, এমনকি আলোকদূষণ কম থাকলেও রাজকন্যা অ্যান্ড্রোমিডার ডান উরুর একটু উত্তরে সাদাটে পেঁজা তুলোর মতো তাকে ভাসতে দেখা যায়।

এবার একটু পুরাণের দিকে নজর দিই।

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, অ্যান্ড্রোমিডা ছিলেন ইথিওপিয়ার রাজা সিফিয়াস আর রানি ক্যাসিওপিয়ার কন্যা। রানি ক্যাসিওপিয়া ও তাঁর কন্যা অ্যান্ড্রোমিডা উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। কিন্তু তাঁর

মা ক্যাসিওপিয়ার নিজের সৌন্দর্যের প্রতি বেশ অহংকার ছিল। তিনি এতই অহংকারী হয়ে যান যে তিনি একসময় সমুদ্র দেবতা পসাইডনের (কোথাও কোথাও নিমিয়াসকে সমুদ্র দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়) কন্যা ওসেডিয়ানদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বসেন। এতে তাঁরা দারুণভাবে অপমানিত হয়ে সমুদ্র দেবতার কাছে নালিশ করেন। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সিটাসকে (সিটাসকে একটা বিরাট সাপ, আবার কোথাও একটা বিরাট তিমি, আবার কোথাও কোথাও সামুদ্রিক দৈত্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) পাঠান ইথিওপিয়ার রাজ্যকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। তখন রাজা সিফিয়াস দেবতার মন্দিরে যান তাঁর রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য। মন্দিরে গিয়ে জানতে পারেন যে দেবতার রাগ ঠান্ডা করতে অহংকারী রানিকে চিরজীবন ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে আপত্তিকর ভঙ্গিতে ঘুরতে হবে ও তাঁর নিরপরাধ কন্যা অ্যান্ড্রোমিডাকে সিটাসের কাছে সমর্পণ করতে হবে।

এই খবর সমগ্র ইথিওপিয়ানদের কানে গেলে জনমুখের রোষানলে পড়ে একরাশ দুঃখ নিয়ে রাজাকে সেই কাজ করতে হয়।

তিনি রাজকন্যা অ্যান্ড্রোমিডাকে সমুদ্রের কাছে একটা পাথরের সাথে বেঁধে দেন যাতে সিটাস তাঁকে সহজে পেতে পারে। মৃত্যু একেবারে নিশ্চিত ছিল।

কিন্তু সেই সময় সেখান দিয়ে দেবরাজ জিউস আর রাজকন্যা ডেনীর পুত্র বীর পারসিয়াস দেবতা হার্মিসের দেওয়া পাখাওয়ালা পাদুকায় করে (কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, দেবতা হার্মিসের মতো পাখাওয়ালা পাদুকায় করে, আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে পেগাসাসে করে; এর কোনো ভিত্তি নেই) যাচ্ছিলেন মেডুসা নামক গর্গনের মাথা নিয়ে। তিনি গর্গনকন্যা মেডুসার হত্যাকারী হিসেবেই অধিক পরিচিত। তিনি হলেন আধা মানব, আধা ঈশ্বর! অর্থাৎ উপদেবতা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডেমিগড'।

তিনি তখন অ্যান্ড্রোমিডাকে এক পলক দেখে প্রেমে পড়ে যান। তাই তিনি ঠিক করলেন, যে করেই হোক তাঁকে বাঁচাবেন। তাই তিনি সিটাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। যখন সিটাস অ্যান্ড্রোমিডাকে খাওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে তখন পারসিয়াস সিটাসকে তলোয়ারের এক কোপে দুই টুকরা করে সমুদ্রে ফেলে দেন। আবার কোথাও কোথাও বলা হয়ে থাকে, পারসিয়াস শেষে সিটাসকে মেডুসার ভয়ংকর মাথা দেখালেন। সাথে সাথে সে পাথরে পরিণত হয়ে গিয়ে দ্বীপে পরিণত হলো। তখন তিনি অ্যান্ড্রোমিডাকে বাঁচিয়ে তাঁর সাথে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এরপর অনেক দূর কাহিনি গড়িয়ে যায়।

তবে শেষমেশ রাজকন্যা অ্যান্ড্রোমিডা কীভাবে আকাশে স্থান পান তা সম্পর্কে কোথাও তেমন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাই এই পুরাণ ছেড়ে এখন অন্যত্র আসি।

বর্তমানের আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করলে দেখতে পাব অ্যান্ড্রোমিডা, ক্যাসিওপিয়া, সিফিয়াস, সিটাস, পারসিয়াস, পেগাসাস সবগুলোকে বেশ কাছাকাছি দেখা যায়। একটু কল্পনা করলে দেখা যাবে, একটা মেয়েকে চারটা পাথরের সাথে হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে রাখা হয়েছে। তার দক্ষিণে বিরাট তিমি মাছ সিটাস তাঁর দিকে ধেয়ে আসছে। তার উত্তরে পিতা সিফিয়াস বিষণ্ণ হয়ে রাজমুকুট পরে বসে আছেন, আর মা ক্যাসিওপিয়া বিব্রতকরভাবে সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁরই পাশেই আছেন বীর পারসিয়াস আর আছে ঘোড়া পেগাসাস।

অনেক পুরাণের মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম, এবার বরং অ্যান্ড্রোমিডাকে আকাশপটে খুঁজতে বের হই। তবে তাঁর মাকে ছাড়া তাঁকে খুঁজে পাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য।

তো রাজকন্যা অ্যান্ড্রোমিডাকে পেতে হলে প্রথমেই আমাদের সপ্তর্ষিকে খুঁজতে হবে। এর উপযুক্ত সময় শীতকাল। আরও ভালোভাবে বললে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি যখন কিনা আকাশ পরিষ্কার থাকে।

এই সপ্তর্ষিমণ্ডল PTOLEMY-এর তালিকাভুক্ত ৪৮ মণ্ডলের একটি। সপ্তর্ষি নাম শুনে মনে হতে পারে যে সাতটি নক্ষত্র নিয়ে এটি গঠিত। কিন্তু এই মণ্ডল আসলে সাতটি তারা নিয়ে গঠিত নয়। এই মণ্ডল সাতটি তারাসহ আরও কিছু তারা নিয়ে গঠিত। এই সাতটি তারা নিয়ে গঠিত মণ্ডল সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি অংশ পাশ্চাত্যে 'Ursa Major' বলে বেশি পরিচিত। কারণ এই সপ্তর্ষিকে একটি বিরাট ভাল্লুকের মতো কল্পনা করা হয়, এজন্য একে 'বৃহৎ ভাল্লুকমণ্ডল' বা 'Ursa Major' বলা হয়। আবার এই মণ্ডলের একটি অংশকে 'The Great Dipper' বলা হয়যা এই মণ্ডলের ওই ৭টি তারার অংশ। একে কোথাও কোথাও এখানে একটি হাতলওয়ালা চারকোণা চায়ের কাপ বা পেয়ালা হিসেবে কল্পনা করা হয়।

ভারতীয় পুরাণে একে ময়ূর হিসেবে কল্পনা করা হয়। আবার এতে থাকা সাতটি তারাকে সাতজন ঋষি হিসেবে কল্পনা করা হয়। এজন্য একে 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' ডাকা হয়। কোথাও কোথাও একে একটা লাঙল হিসেবে কল্পনা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও একে একটা বৃহৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে কল্পনা করা হয়।

আসলে মানুষের কল্পনাশক্তি অসীম। তাই তার কল্পনা করতে কোনো সমস্যা নেই। একেকজন একেক ধরনের কল্পনা করতে পারে।

তো সপ্তর্ষিকে পেতে হলে প্রথমে সন্ধ্যার পর ৯টার দিকে বা তারও পরে উত্তর-পূর্ব দিকে ভালো করে দেখতে হবে। সেখানে দিগন্তছোঁয়া সাতটি তারা দেখা যাবে; যেগুলোকে জুড়ে দিলে পাওয়া যাবে এই চায়ের কাপ বা সপ্তর্ষি। এই কাপের যে হাতল আছে তার উলটা দিকের তারা দুটো যোগ করে এর সংযোগকারী সরলরেখা বরাবর একটু উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে আরও সামনে নিয়ে গেলে কিছুটা ডানদিকে ছোটো, কম উজ্জ্বল একটা তারা পাওয়া যাবে। এটাই হলো ধ্রুবতারা।

নিচের ছবিটা লক্ষ করলে আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে।
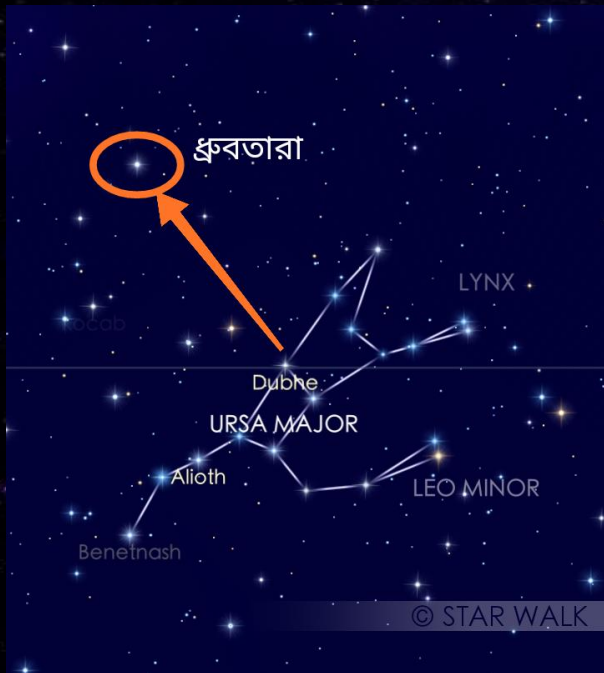
সপ্তর্ষি থেকে ধ্রুবতারা

এরপর যে সরলরেখা দিয়ে ধ্রুবতারাকে পেয়েছি, আবারো সেই সরলরেখা বরাবর ধ্রুবতারা থেকে আর একটু সামনে গেলে পাব রানি ক্যাসিওপিয়াকে। আকাশের অন্যান্য মণ্ডল থেকে এর গঠন অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও দৃষ্টিনন্দন। এটা দেখতে অনেকটা ইংরেজি 'W' বা 'M' এর মতো। অবস্থানভেদে 'M' বা 'W' এর মতো দেখায়। এর এই আকৃতির জন্য একে খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ। তবে হঠাৎ করে দেখলে 'W' বা 'M' না চোখে পড়ে প্রথমে 'V' চোখে পড়ে। পরে বাকি অংশ চোখে পড়ে।

নিচের ছবিটা লক্ষ করলে আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে।

ধ্রুবতারা থেকে ক্যাসিওপিয়া

ক্যাসিওপিয়াকে পেয়ে গেলে প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে। আর মাত্র ৫০ শতাংশ এগোলেই পেয়ে যাব কাঙ্ক্ষিত অ্যান্ড্রোমিডাকে।

তো এবার খুঁজতে হবে পেগাসাস বর্গকে। এর জন্য প্রথমেই ক্যাসিওপিয়ার পশ্চিমের তারা β ক্যাসিওপিয়া থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে, উত্তর-পশ্চিম আকাশে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল তারা দেখতে পাব। এখন সেই এলাকা জুড়ে ভালো করে লক্ষ করলে পশ্চিম আকাশে আরও তিনটি তারা দেখতে পাব। এখন এই চারটি

তারা যোগ করলেই একটা কল্পিত বর্গক্ষেত্র দেখতে পাব। এটাই পেগাসাস বর্গ।

নিচের ছবিটা লক্ষ করলে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে।
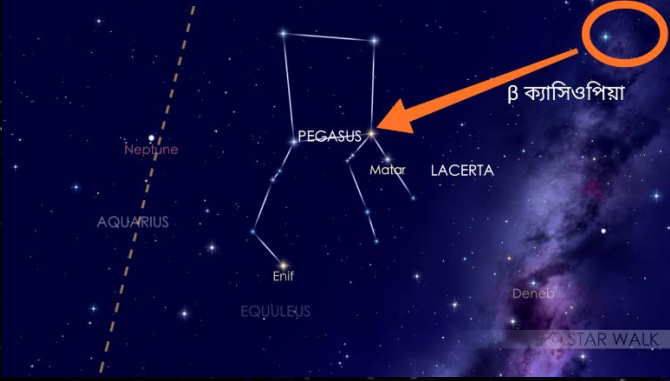
β ক্যাসিওপিয়া থেকে পেগাসাস

অবশ্য এটাকে কোনো দিক থেকে বর্গক্ষেত্র মনে হয় না। দেখে মনে হয় এটা একটা চর্তুভুজ।

ব্যস, পেয়ে গেলাম পেগাসাসকে! অনেকখানি এগিয়ে গেছি। আর বেশি কাজ নেই।

এবার পেগাসাস বর্গের উত্তর-পূর্বদিকে একটা তারা দেখা যাবে; সেটা হলো α অ্যান্ড্রোমিডা। প্রাথমিকভাবে দেখলে মনে হবে এটা পেগাসাস বর্গের তারা। কিন্তু এটা আসলে অ্যান্ড্রোমিডা-মণ্ডলের তারা। তাই এর নাম α অ্যান্ড্রোমিডা।

এবার এই α অ্যান্ড্রোমিডা থেকে সামনে একটা সরলরেখা কল্পনা করলে আরো তিনটি তারা দেখতে পাওয়া যাবে।

α অ্যান্ড্রোমিডা থেকে সামনে এগোতে থাকলে যে তৃতীয় তারা দেখা যাবে, সেটা হলো β অ্যান্ড্রোমিডা। এবার এই তারা থেকে ডানে বা উত্তরে একটু নিচে পাওয়া যাবে μ অ্যান্ড্রোমিডা। আবার এর ডানে বা উত্তরে পাওয়া যাবে ν অ্যান্ড্রোমিডা। এর থেকে একটু ডানে বা উত্তরে তাকালেই পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্ড্রোমিডা।

যদি না বুঝে থাকেন তাহলে নিচের ছবিটা লক্ষ করুন।

α অ্যান্ড্রোমিডা থেকে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি

ভালোভাবে (অবশ্য ভালো মানের বাইনোকুলার দিয়ে; টেলিস্কোপ হলে আরও ভালো হয়) লক্ষ করলে 'Messier 110' ও 'Messier 32' নামে আরো দুইটা আবছা গ্যালাক্সি দেখা যাবে।

ভাবতেই অবাক লাগে, সেই ২৫ লক্ষ বছর আগের আলো আমাদের রেটিনায় এসে পড়ছে!

SpaceX

রওনক শাহরিয়ার

৩০ মে, ২০২০। প্রায় দুই যুগ প্রচেষ্টার পর SpaceX মহাকাশে মানুষ পাঠাতে সক্ষম হয়। শুরুটা হয়েছিল পুনঃব্যবহারযোগ্য রকেট তৈরি করা দিয়ে, তারপর মহাকাশে গাড়ি প্রেরণ, অরবিটে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা এবং সর্বশেষ নাসা (NASA) এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী মহাকাশে মানুষ প্রেরণের উদ্দেশ্য নিয়ে। ২০১১ সালে মহাকাশে নিজ দেশ থেকে নাসা সর্বশেষ মানুষ প্রেরণ করেছিল। SpaceX এর ক্রু মিশন রাশিয়ার সাথে দীর্ঘ দিনের মহাকাশযান পরিচালনার চুক্তির অবসান ঘটায় এবং দীর্ঘ ছয় বছরের পরিকল্পনা শেষে স্বল্প ব্যয়ে, নিজ দেশ থেকে এক যুগ পর মহাকাশযান উড্ডয়ন করে প্রথম প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে ইতিহাস রচনা করে। আসুন জেনে নিই SpaceX-এর মূল কাজ কী?

Space Exploration Technology Corporation (SpaceX) হলো একটি অ্যামেরিকান অ্যারোস্পেইস প্রস্তুতকারক ও মহাকাশ পরিবহন সংস্থা, যার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে SpaceX এর অর্জন অসংখ্য, কিন্তু তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো অন্য গ্রহ মানুষের জন্য বসবাসযোগ্য করে তোলা। ইলন মাস্ক তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সায়েন্স ফিকশনের বিষয়গুলোকে শুধু বইয়ের মধ্যে নয় বরং বাস্তবে করে দেখাতে চান। তাঁদের শুরুর দিকটা কঠিন হলেও, পুনঃব্যবহারযোগ্য স্পেইস শাটল স্বপ্নের মহাকাশযাত্রাকে এগিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে ৭৫% পর্যন্ত খরচও কমিয়ে এনেছেন। আর নাসার দুই অ্যাস্ট্রোনট মহাকাশে প্রেরণের ঐতিহাসিক কাজ শুধু সফলতাই এনে দেয়নি, বরং প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে নিজেদের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়াও নাসার সাথে চুক্তি অনুসারে ISS-তে এখন পর্যন্ত ২০টি কনটেইনার পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটও স্পেইস এক্স থেকে তার অরবিটে প্রেরণ করা হয়। স্বপ্নের মহাকাশযাত্রাকে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্য বর্তমানে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন।

Elon Musk

স্পেইসে মানব প্রেরণ:

স্পেইসে মানুষ প্রেরণের অভিযান অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও ব্যয়বহুল কাজ যা আগে চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দপ্তরগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হতো। মহাকাশে বিশেষত ইন্টারন্যাশনাল স্পেইস স্টেশনে (ISS) গবেষণা, কার্গো পৌঁছানো, সেখানের কাজের জন্য মানুষের যাওয়া প্রয়োজন। আর নাসা নিজ দেশ থেকে সরাসরি মানুষ প্রেরণ করা বন্ধ করায় এ কাজে এতদিন পুরোপুরি রাশিয়ার ওপর নির্ভর ছিল। সেজন্য প্রাইভেট কোম্পানি 'SpaceX' এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় 'ISS'-এ প্রাথমিকভাবে মানুষ পাঠানোর জন্য। ২০১৬ সালের প্রথম ব্যর্থতার পর ২০২০ সালে পুরোদমে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। কিন্তু আবহাওয়া বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবার। অবশেষে সকল ঝামেলার অবসান শেষে ৩০ মে 'NASA' এর দুই অ্যাস্ট্রোনট 'Robert Behnken' এবং 'Douglas Hurley' নাসার কেনেডি স্পেইস সেন্টার থেকে 'Falcon 9' এর 'Crew dragon' ক্যাপসুলে করে উড্ডয়ন করেন এবং ৬৯ ঘন্টা অরবিটে থাকার পর ২৫০ কি.মি. ওপরে থাকা 'ISS'-এ ডক করতে সক্ষম হয়।

পুনঃব্যবহারযোগ্য স্পেইস শাটল:

পূর্বে মহাকাশযান প্রেরণের পর বিভিন্ন কারণে তা পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। এতে অত্যন্ত পরিশ্রম, অর্থ অপচয় হতো এবং নতুন স্পেইস শাটল বারবার পরীক্ষা করায় মহাকাশযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাত। পুনঃব্যবহারযোগ্য জ্বালানি থেকে পুনরায় ব্যবহার করা যায় বা পুনঃব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান তৈরির আইডিয়া আসে। SpaceX সেটাকে বাস্তবায়ন করে এবং প্রতিটা মহাকাশযানের খরচ প্রায় ৭৫% কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়। মূলত মহাকাশযানের দুইটা স্টেজ থাকে, একটা জ্বালানি প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ। মূলত প্রথম পর্যায়ে জ্বালানিপূর্ণ রকেট বুস্টারগুলোতেই অতিরিক্ত ব্যয় হয়, যদি একে পুনঃব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে বিশাল খরচ বাঁচানো সম্ভব হয়। 'Falcon 9'-এর স্পেইসক্রাফটের একেকটা বুস্টার সর্বোচ্চ ছয়বারও ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ইলন মাস্কের পরবর্তী পরিকল্পনা দ্বিতীয় স্টেজকেও পুনঃব্যবহারযোগ্য করে তোলা, যেন খরচ একেবারে কমে আসে। 'SpaceX' এর প্রতিদ্বন্দ্বী 'Blue Origin'-ও পুনঃব্যবহারযোগ্য স্পেইস শাটল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্রু ড্রাগন ক্যাপসুল:

'SpaceX' ক্রু ড্রাগন নির্মাণ করে যা অ্যাস্ট্রোনটদের 'ISS' পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায় এবং পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে। এটি মহাকাশযানের ওপরে পূর্বের কার্গো এর পরিবর্তে রাখা হয়, যাকে বুস্টারগুলো প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করে নির্দিষ্ট অরবিটে পাঠায়। স্পেইসক্রাফটটি 'Applo 11' এর মতো হলেও ভিতরে বিলাসবহুল গাড়ির মতো। পূর্বের মতো ২,০০০ এর অধিক সুইচ ও সার্কিট এতে নেই, বরং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে যেখানে টাচস্ক্রিনের মাধ্যমে যানের সবকিছু দেখা, সব তথ্যও পর্যবেক্ষণ, এমনকি স্পেইসশিপকে পরিচলনাও সম্ভব। অ্যাস্ট্রোনটরা সব পর্যবেক্ষণ শেষে অটোমেটিক মোডে দিয়ে দেন যা মহাকাশযানকে সরাসরি স্পেইস স্টেশনে নিয়ে ডক করায়

এবং ৩ মাস পর ২রা আগস্ট ক্রু ড্রাগনে করে তাঁরা পৃথিবীতে আসার প্রস্তুতি নেয়। ৬৮ ঘন্টা মহাশূন্য অরবিটে প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। বায়ুমন্ডল স্পর্শ করার সময় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩,৫০০° ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছায়। নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছালে প্যারাসুট খুলে যায় এবং ধীরে ধীরে ফ্লোরিডা উপকূলে ক্যারিবিয়ান সাগরে পতিত হয়।

কোভিড-১৯ ও মিশন:

করোনা প্যানডেমিক জন্য অ্যাস্ট্রোনটদের একটা বিশাল সময় কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়, যা এর আগে এত দীর্ঘ কখনও ছিল না। আবার সর্বোচ্চ পরিমাণে চেক করা হয়েছিল যাতে ভাইরাস মহাকাশে পৌঁছাতে না পারে। করোনা ভাইরাসের জন্য সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করা হয়েছে।
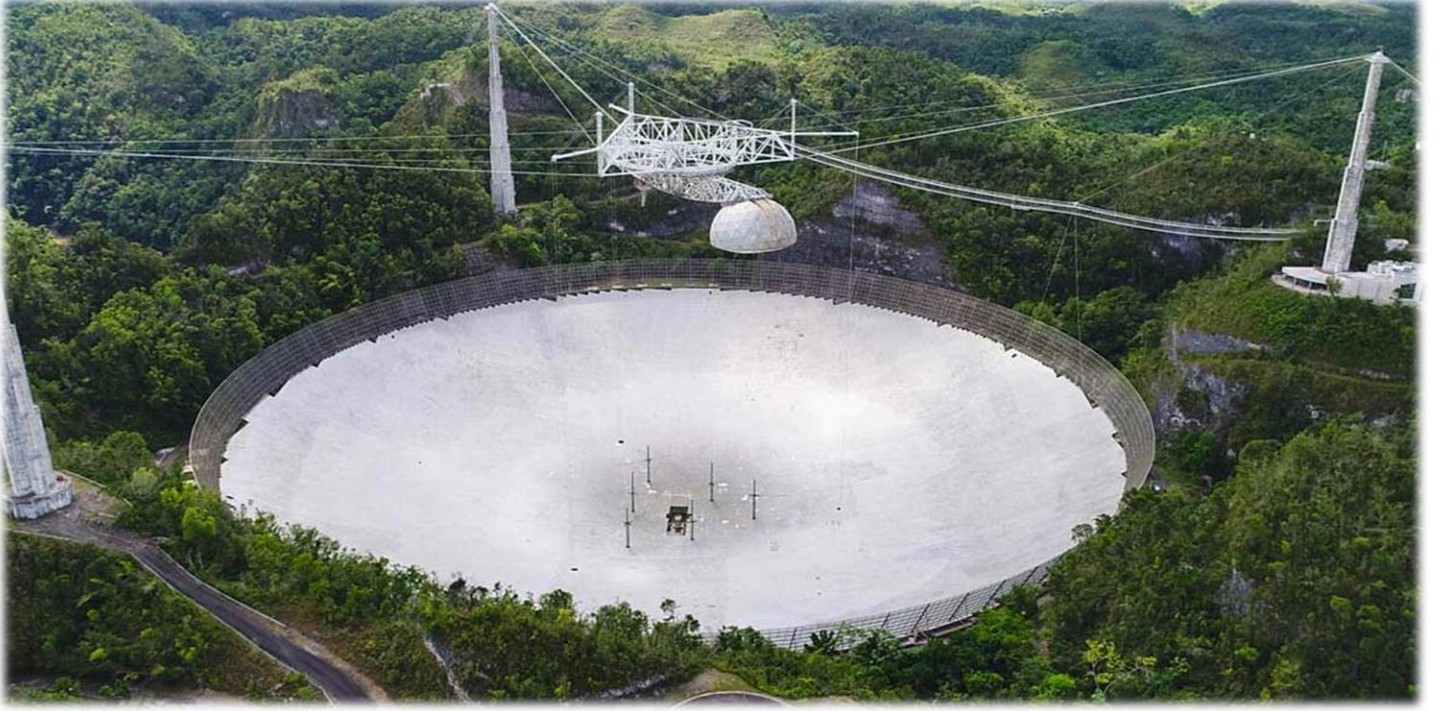
আরেসিবো টেলিস্কোপ: ভেঙে পড়া এক মহাজাগতিক স্বপ্ন

রাজেশ মজুমদার

হলিউডের চলচ্চিত্রে অনেকেই বিশাল এক রেডিয়ো টেলিস্কোপ দেখেছেন। বিশেষ করে জেমস বন্ডের ‘গোল্ডেন আই’ ছবিটিতে এ টেলিস্কোপ বিশেষভাবে দেখানো হয়েছিল। পুয়ের্তো রিকোতে অবস্থিত আইকনিক টেলিস্কোপটি ৫৭ বছর ধরে জ্যোতির্বিদদের মহাকাশের বিভিন্ন গবেষণায় সাহায্য করে যাচ্ছিল। কিন্তু গত ১লা ডিসেম্বর ২০২০, মঙ্গলবার ভেঙে পড়েছে বিশাল ওই টেলিস্কোপ।

আরেসিবো টেলিস্কোপটি অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত পর্যবেক্ষণাগার ‘আরেসিবো পর্যবেক্ষণাগার’-এ। আরেসিবো পর্যবেক্ষণাগারটি The National Astronomy and Ionosphere Center (NAIC) নামেও পরিচিত। এটি ক্যারিবিয়ান দ্বীপের পুয়ের্তো রিকোতে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (এনএসএফ) এর অধীনে কার্যরত পর্যবেক্ষণাগারটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হলো www.naic.edu। পর্যবেক্ষণাগারের বর্তমান পরিচালক হলেন ফ্রান্সিসকো কর্ডোভা। পর্যবেক্ষণাগারটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,৬৩৪ ফুট ওপরে অবস্থিত। পর্যবেক্ষণাগারের প্রধান টেলিস্কোপ ছিল ‘আরেসিবো টেলিস্কোপ’, যেটি প্রায় ৩০৫ মিটারের গোলীয় প্রতিফলক ডিশ রেডিয়ো টেলিস্কোপ। পর্যবেক্ষণাগারটিতে আরও একটি ১২ মিটারের রেডিয়ো টেলিস্কোপ, একটি লাইডার ফ্যাসিলিটি এবং একটি ভিজিটর সেন্টার রয়েছে। মূল টেলিস্কোপটি ধ্বংস হওয়ার পরও পর্যবেক্ষণাগারের এই অংশগুলো সচল থাকবে।

পর্যবেক্ষণাগারটিতে রয়েছে 'এঞ্জেল রামোস ভিজিটর সেন্টার' যেটি ১৯৯৭ সালে চালু করা হয়েছিল। এই সেন্টারে মূলত পর্যবেক্ষণাগারে অবস্থিত বিভিন্ন টেলিস্কোপের কার্যাবলী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনাবলী প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও ক্যারিবিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞান সোসাইটির সহায়তায় সেন্টারটিতে পুরো বছর জুড়ে রাতের আকাশের বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা এবং বহির্জাগতিক গ্রহ সম্পর্কে সিরিজ প্রদর্শন করা হয়। এই সেন্টারটির মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ জনগণের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা এবং পর্যবেক্ষণাগারের গবেষণা সম্পন্ন করা।

কেন এই 'আরেসিবো টেলিস্কোপ' এত গুরুত্বপূর্ণ? আরেসিবো টেলিস্কোপটির উন্মেষ ছিল ৩০৫ মিটার। টেলিস্কোপের ডিশের ওপর একটি ৯৫০ মিটারের ট্রান্সমিটার ছিল যেটি মহাকাশে বিভিন্ন সংকেত ছড়িয়ে দিত। ১৯৬৩ সালে কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ৫৩ বছর ধরে এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সিঙ্গেল অ্যাপারেচার টেলিস্কোপ। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে চীন তাদের ৫০০ মিটার উন্মেষ বিশিষ্ট 'FAST' রেডিয়ো টেলিস্কোপ তৈরি করার পর টেলিস্কোপটি তার প্রথম স্থান হারায়। টেলিস্কোপটির সাহায্যে ৯লা নভেম্বর, ১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম গবেষণা শুরু হয়।

টেলিস্কোপটি মূলত বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান, বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা এবং রাডার জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও এর সাহায্যে বহির্জাগতিক প্রাণেরও খোঁজ করা হতো। এই টেলিস্কোপের সাহায্যে 'নাসা' পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থিত বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করত। টেলিস্কোপটির দারুণ ডিজাইনের কারণে এটি বিভিন্ন চলচ্চিত্র এবং গেইম তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। ২০০৮ সালে টেলিস্কোপটিকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। গত ৯লা ডিসেম্বর, মঙ্গলবার টেলিস্কোপটি পুরোপুরি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেলেও এর আগে ২০১৭ সালে ঘূর্ণিঝড় মারিয়া এবং ২০১৯ সালে ভূমিকম্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় টেলিস্কোপটি।

টেলিস্কোপটির গাঠনিক বৈশিষ্ট্য অনেক ভালো ছিল। টেলিস্কোপটির ব্যাস ৩০৫ মিটার হলেও এর গোলীয় ব্যাসার্ধ ছিল ২৬৫ মিটার। টেলিস্কোপের ডিশটির পৃষ্ঠ তৈরি করা হয় ৩৮,৭৭৮টি অ্যালুমিনিয়াম প্যানেল দ্বারা, যেগুলো স্টিল ক্যাবল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। টেলিস্কোপটিতে ছিল তিনটি রাডার ট্রান্সমিটার। যখন সংকেত গ্রহণ এবং প্রেরণের জন্য রিসিভার ও ট্রান্সমিটারটিকে বিভিন্ন দিকে ঘোরানো হতো তখন টেলিস্কোপের মূল ডিশটি স্থির থাকত।

অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা হয়েছে এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে। টেলিস্কোপটির কাজ শুরুর কিছু দিনের মধ্যে, ৭ই এপ্রিল, ১৯৬৪ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই টেলিস্কোপ ব্যবহারের মাধ্যমে জানতে পারেন বুধ গ্রহের ঘূর্ণন পর্যায়কাল ৮৮ দিন নয়, বরং মাত্র ৫৯ দিন। ১৯৬৮ সালে এই টেলিস্কোপের মাধ্যমেই আবিষ্কার করা হয় 'কাঁকড়া পালসার'-এর পর্যায়কাল (৩৩ মিলিসেকেন্ড); যা নিউট্রন নক্ষত্রের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করেছিল। ১৯৭৪ সালে 'হালস' এবং 'টেইলর' নামে দুজন বিজ্ঞানী টেলিস্কোপটির মাধ্যমে প্রথম বাইনারি পালসার (PSR B1913+16) আবিষ্কার করেন, যার ওপর ভিত্তি করে তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৮২ সালে প্রথম মিলিসেকেন্ড পালসার (PSR B1937+21) আবিষ্কার করা হয় যেটি সেকেন্ডে ৬৪২ বার ঘূর্ণন সম্পন্ন করে।

১৯৮০ সালে টেলিস্কোপটির মাধ্যমে প্রথম কোনো ধূমকেতুর (Encke) সন্ধান করা হয় রাডার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে টেলিস্কোপটির মাধ্যমে একটি গ্রহাণু (4769 Castalia)-র ছবি তোলা হয়। এর পরের বছরই টেলিস্কোপটির সাহায্যে পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী Aleksander Wolszczan আরেকটি পালসারকে (PSR B1257+12) ঘিরে তিনটি গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। এরাই ছিল প্রথম বহির্জাগতিক গ্রহ! ১৯৯৪ সালে জন হারমন নামে এক বিজ্ঞানী এই টেলিস্কোপের সাহায্যে বুধ গ্রহের মেরু অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করেন। ২০০৮ সালে 'Galaxy Arp 220'-এ অবস্থিত মিথানিমাইন এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড এর মেঘ শনাক্ত করা হয়। এছাড়াও বৃহস্পতি এবং সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্র পরীক্ষা করা হয় এই টেলিস্কোপের সাহায্যে। এছাড়াও ১৯৭৪ সালে বহির্জাগতিক প্রাণীর উদ্দেশ্যে প্রায় ২৫,০০০

আলোকবর্ষ দূরে একটি মেসেজ পাঠানো হয় যা আরসিবো মেসেজ নামে পরিচিত। এরকম অসংখ্য আবিষ্কার ও গবেষণায় সহযোগিতার মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করে আসছিল টেলিস্কোপটি।

কিন্তু গত মঙ্গলবার এই টেলিস্কোপটির ৯০০ টন যন্ত্রপাতি ৪৫০ ফুট ওপর থেকে রিফ্লেক্টর ডিশের ওপর পড়ে যায়। যে অ্যান্টেনা ভেঙে পড়েছে তার ওজন ছিল প্রায় ৫.৪৪ লক্ষ কেজি। এনএসএফ জানিয়েছে, গতকাল স্থানীয় সময় ৭টা ৫৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৫ মিনিট) দুর্ঘটনা ঘটে। এতে বিশাল ডিশটি ভেঙে গেছে এবং আশপাশের স্থাপনার ক্ষতি হয়েছে। ওই টেলিস্কোপে এক হাজার ফুট প্রশস্ত রেডিয়ো ডিশ ও ৪৫০ ফুট ওপরে ঝুলন্ত যন্ত্রপাতি ছিল। তিনটি বিশেষ টাওয়ার থেকে তারের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা ছিল। দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে।

এর আগে গত আগস্ট মাসে দুটি তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর ওই কাঠামোর ক্ষতি হয়েছিল। তখনই কর্মকর্তারা এ অবজারভেটরি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গত মাসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পর যন্ত্রাংশ ভেঙে পড়ার ঝুঁকির কথাও বলা হয়েছিল। এটি ঠিক করার কোনো পথ ছিল না। এনএসএফের কর্মকর্তারা বলছেন, "পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হবে এ রেডিয়ো টেলিস্কোপ।" মোট ৮৯ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে টেলিস্কোপটি ভেঙে পড়ে।

টেলিস্কোপটি ভেঙে পড়ার ফলে দেশ তথা পৃথিবীর যে কত বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল তা সাধারণ মানুষ সেভাবে বুঝতে না পারলেও বিজ্ঞানীরা ভালোই বুঝতে পারছেন। এই দুর্ঘটনার কথা শুনে আবহাওয়াবিদ থেকে শুরু করে বহু বিজ্ঞানীর চোখে জল এসে গেছে। ১৯৬০ সালে এই বিশাল টেলিস্কোপটির কাজ শুরু হয়েছিল; সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল ৩ বছরের দীর্ঘ সময়। তারপর থেকে বহুবার মহাজাগতিক বিপদ যেমন অ্যাস্টেরয়েড, উল্কার হাত থেকে বাঁচার জন্য আগামী সতর্কতা পাওয়া গেছে এই টেলিস্কোপের জন্যই।

নিউট্রন স্টার

কাইফ রহমান

প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। তো নিউট্রন স্টার কাকে বলে:-
যে তারা নিউট্রন দিয়ে তৈরি, তাকে নিউট্রন স্টার বলে।

উত্তর ঠিক আছে। কিন্তু কেউ যদি একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে বলে, তাহলে তো নিউট্রন স্টার সম্পর্কে না জানলে ধরা খেয়ে যাবেন। মুখস্থবিদদের খাতায় আপনার নাম লেখা হয়ে যাবে।

আপনি কি বিজ্ঞানমনস্ক? কী, কেন, কীভাবে প্রশ্ন করতে ভালোবাসেন? তাহলে পরবর্তী অংশটুকু আপনার জন্য।

নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে যখন শেষ পর্যন্ত আয়রন সৃষ্টি হবে, তখন আয়রনের পরমাণুগুলো মিলে মিলে একটা আয়রনের গোলক সৃষ্টি করবে; যা নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন করে না। কারণ আয়রনের নিউক্লিয়াস সবচেয়ে স্থায়ী।

অর্থাৎ, বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করবে না। ফলে মহাকর্ষ বলের কারণে এই গোলক সংকুচিত হতে শুরু করবে।

আয়রনের এই সংকুচিত গোলককে দাঁড় করিয়ে রাখবে এক বিশেষ ধরনের চাপ যাকে ফার্মি প্রেসার বলে।

প্রতিটি আয়রনের নিউক্লিয়াসের সাথে কিছু ইলেকট্রন যুক্ত থাকে। এই ইলেকট্রনরা ফার্মিয়ন। ফার্মিয়নরা একটু চঞ্চল। তারা স্থিরভাবে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। অর্থাৎ, এক অবস্থায় থাকতে পছন্দ করে না। ফলে খুব বেশি কাছাকাছি চলে এলে এদের মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপটাকেই বলে ফার্মি প্রেসার; যা নক্ষত্রের ভিতর ওই আয়রনের গোলকটাকে টিকিয়ে রাখে।

কিন্তু সবসময় ফার্মি প্রেসার আয়রনের গোলককে টিকিয়ে রাখতে পারে না। কারণ নক্ষত্রের ভেতরের আয়রনের গোলকের ভর যখন বাড়তে বাড়তে একটি নির্দিষ্ট ভরকে অতিক্রম করে, তখন তাকে ফার্মি প্রেসার দিয়ে আর টিকিয়ে রাখা যায় না। যে ভরের সীমা পর্যন্ত ফার্মি প্রেসার আয়রনের গোলককে টিকিয়ে রাখতে পারে, তাকে চন্দ্রশেখর লিমিট বলে।

এখন আয়রনের গোলকটি সংকুচিত হতে হতে নিউট্রন বলে পরিণত হবে। তাহলে ইলেকট্রন আর প্রোটন কোথায় গেল?

উত্তরটি হলো – খুব বেশি ঘনত্বের কারণে আয়রনের নিউক্লিয়াসগুলো ইলেকট্রনদের খুব কাছে পেয়ে যাবে। আর তাদের খেয়ে নেওয়া শুরু করবে। একে বলে K-ক্যাপচার প্রসেস। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো তো K, L, M এইসব কক্ষপথে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে, K-টা সবচেয়ে কাছে। K-ক্যাপচার পদ্ধতিতে নিউক্লিয়াস K কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলোকে খেয়ে নেয়। তো সেই K-ক্যাপচারের মতোই একটা পদ্ধতিতে আয়রনের নিউক্লিয়াসগুলো ইলেকট্রনগুলোকে খেতে শুরু করে। নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে প্রোটন আছে, তারা ইলেকট্রনের সাথে মিলে নিউট্রনে পরিণত হয়।

এই পরিবর্তনটা ইলেকট্রো-উইক ফোর্সের মাধ্যমে হয়। তবে এটা এমনি এমনি হয় না। কোনো কিছু পেতে হলে যেমন কোনো কিছু দিতে হয়, ঠিক তেমনই নিউক্লিয়াসকে কিছু দিতে হবে। সেটা হলো একটা নিউট্রিনো। এই নিউক্লিয়াসগুলো থেকে সেই নিউট্রিনোগুলো বেরোতে থাকে। এইভাবে একটা নিউট্রনের গোলক তৈরি হয়। নক্ষত্রের কেন্দ্র এখন নিউট্রন স্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার আসি মূল কথায় —
মানুষ যেমন মৃত্যুর আগে তার উত্তরসূরি রেখে যায়, ঠিক তেমনই যখন সুপারনোভার মাধ্যমে নক্ষত্রের জীবনের সমাপ্তি ঘটে, তখন সেও তার উত্তরসূরি রেখে যায়। তার এই উত্তরসূরির নাম নিউট্রন স্টার।
অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, নক্ষত্রটি সংকুচিত হতে হতে এর ব্যাস ২০ কিলোমিটার হলেও এর ভর সূর্যের চেয়ে ১.৪ গুণ বেশি! খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে স্টারটির ঘনত্ব কী পরিমাণ বেশি! এই বিষয়টাকে বোঝার সুবিধার্থে তুলনা করা যাক। মনে করুন, হিমালয় পর্বতের যে ভর সেটা একটি চিনির স্ফটিকের মধ্যে রয়েছে!

এখন চলুন, বিষয়টাকে আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করি।
কীভাবে এত ছোটো জায়গায় এই বিশাল পরিমাণ ভর থাকে?

দেখুন, একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেই এর মূল ভর থাকে। আমরা চারপাশে যেসব জিনিস দেখি, তার আকার কিন্তু নিউক্লিয়াসের আয়তন নয়, পরমাণুর আয়তন। আর একটি নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ থেকে পরমাণুর ব্যাসার্ধ প্রায় ১ লক্ষ গুণ বড়ো। বোঝাই যাচ্ছে যে পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা।

নিউট্রন স্টারের এক্ষেত্রে বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়। এটা কিন্তু পরমাণু দিয়ে তৈরি নয়। নিউট্রন স্টারের সব জায়গাতেই কিছু না কিছু নিউট্রন আছে। অর্থাৎ, এর বেশিরভাগ জায়গাই নিউট্রন দিয়ে পূর্ণ। এর মানে সহজ ভাষায়, পরমাণুর ফাঁকা স্থানের যে আয়তন সেটি কিন্তু নিউট্রন স্টারে নেই। এজন্যই এত কম জায়গায় এত বেশি ভর রয়েছে।
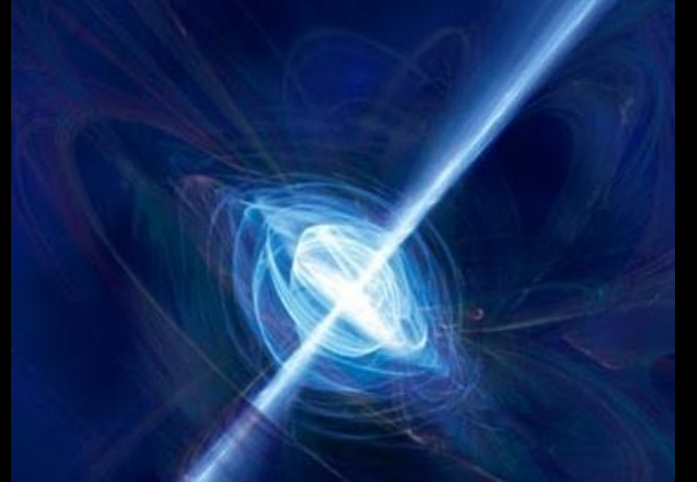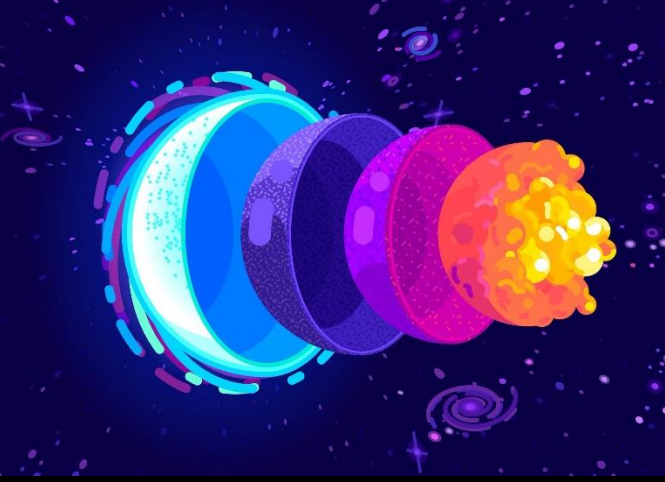
এবার নিউট্রন স্টারের গ্র্যাভিটি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যাক। যেহেতু এর ঘনত্ব অনেক অনেক বেশি, তাই এর গ্র্যাভিটিও অনেক বেশি। নিউট্রন স্টারের গ্র্যাভিটি পৃথিবীর চেয়ে $২×১০^{১১}$ গুণ বেশি শক্তিশালী। আপনি যদি সেখানে পা রাখেন, তাহলে আপনি অবশ্যই ভেঙেচুরে যাবেন। সেখানে আপনার ওজন বেড়ে হবে প্রায় কয়েক ট্রিলিয়ন।
সুপারনোভার আগে নিউট্রন স্টারের স্পিন কম থাকে। কিন্তু সুপারনোভার পর এর স্পিন অনেক বেড়ে যায়।
কেন?
সুপারনোভার আগে নিউট্রন স্টারটির ভর অনেক বেশি থাকে। কিন্তু সুপারনোভা বিষ্ফোরণের পর সংকুচিত হতে হতে এর ভর কমে যায়। কিন্তু আমরা কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি অনুসারে জানি, "কোনো বস্তুর ওপর টর্কের লব্ধি শূন্য হলে বস্তুটির কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।"

যেহেতু ভর কমে গিয়েছে তাই সংরক্ষণশীলতা ধরে রাখার জন্য এর স্পিন অনেক বেড়ে যায়।

এটিকে আইস স্কেটারদের স্পিনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যখন তারা হাত ২টি ছড়িয়ে রাখে, তখন তাদের জড়তার ভ্রামক বেশি হয়। কিন্তু যখনই হাত দুটিকে কাছে এনে ফেলে, তখন জড়তার ভ্রামক কমে যায়। ফলে কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি অনুসারে ভরবেগ একই রাখতে এদের কৌণিক ঘূর্ণনবেগ বেড়ে যায়, তথা স্পিন বেড়ে যায়।

সুপারনোভার আগে সপ্তাহে একবারের মতো স্পিন করত। কিন্তু সংকুচিত হতে হতে এর ব্যাস ২০ কিলোমিটার হয়ে যাওয়ায় এর স্পিন অনেক বেড়ে যায়। এর স্পিন সর্বোচ্চ সেকেন্ডে ৭১৬ বার হতে পারে। এর পাশাপাশি এর ম্যাগনেটিক ফিল্ডও শক্তিশালী হয়ে যায়। এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড পৃথিবীর চেয়ে ১০০ মিলিয়ন থেকে ১ কোয়াড্রিলিয়ন শক্তিশালী।

এখন আপনার মনে একটি প্রশ্ন জাগার কথা যে নিউট্রন স্টারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে কেন? এখানে তো কোনো চার্জিত কণা নেই, পুরোটাই তো নিউট্রাল নিউট্রন দিয়ে তৈরি।

আসলে নিউট্রন স্টার পুরোটাই নিউট্রন দিয়ে তৈরি নয়। এর মধ্যে প্রায় ১০% ইলেকট্রন এবং ১০% প্রোটন থাকে। এই চার্জিত কণাগুলো, নিউট্রন স্টারের স্পিনের ফলে চলমান হয়, যার ফলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সৃষ্টি হয়।

আচ্ছা নিউট্রন স্টারকে কীভাবে পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়?
১৯৬৭ সালে যোসেলিন বেল রেডিয়ো টেলিস্কোপ বানানোর কাজ করছিল। সে তাদের সংগৃহীত ড্যাটার মধ্যে ক্রমাগত একটা শব্দ শুনতে পারছিল। ডেটার মধ্যে সমস্যা থাকায় এরকম শব্দ হচ্ছিল, না কি অন্য কিছুর কারণে তা হচ্ছিল, জানার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। পরিশেষে তিনি জানতে পারলেন, এই শব্দটি ড্যাটার

সমস্যার কারণে সৃষ্টি হয়নি; এই শব্দটি মহাজাগতিক কোনো বস্তু থেকে এসেছে। এই বস্তুটি হলো পালসার।

পালসার কী?

নিউট্রন স্টারই হচ্ছে পালসার। নিউট্রন স্টার যখন তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড-সহ খুব দ্রুত ঘুরতে থাকে, তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দুই পোল থেকে লাইট বিমের বিকিরণ ঘটে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হিসেবে।

নিউট্রন স্টারের অক্ষ এবং দুই ম্যাগনেটিক পোল একই সরলরেখায় থাকে না বলে দ্রুত ঘোরে এবং লাইট বিম বিকিরণের ফলে নিউট্রন স্টারকে লাইটহাউজের মতো পৃথিবী থেকে ঝিকিমিকি করতে দেখা যায়। একেই পালসার বলে। যোসেলিন বেলই সর্বপ্রথম পালসার ডিটেক্ট করে। এই পালস গামা-রে টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যায়।

আরেক ধরনের নিউট্রন স্টার রয়েছে। এদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড সাধারণ নিউট্রন স্টারের চেয়ে ৬,০০০ গুণ বেশি। এ ধরনের নিউট্রন স্টারকে ম্যাগনেটার বলা হয়। ম্যাগনেটারদের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী ম্যাগনেটিক অবজেক্ট বলা হয়। এদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেন এত শক্তিশালী, তা এখনো পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হয়নি।

নিউট্রন স্টারের (ম্যাগনেটার) ক্রাস্টের (ভূ-ত্বক) পুরুত্ব খুবই কম এবং এটি খুবই শক্ত। নিউট্রন স্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ক্রাস্ট (ভূত্বক) পরস্পরের সাথে লেগে থাকে। তাই এ দুইটার মধ্যে সামান্য পরিবর্তন এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটাতে পারে। ক্রাস্ট, গ্র্যাভিটি আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ঘোরার জন্য খুব জোরে একটা টান অনুভব করে। যদি এই ক্রাস্টের সামান্য বিচ্যুতি ঘটে তাহলে এটা একটা earthquake এর মতো Star-quake সৃষ্টি করবে, যা earthquake-এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কারণ ক্রাস্ট খুবই ঘনত্বপূর্ণ এবং গ্র্যাভিটিও অনেক বেশি। তাই যদি মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার ক্রাস্ট এদিক-ওদিক হয়, তাহলে এত বিশাল পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হবে যা সূর্যের ৬,৫০,০০০ বছরে নির্গত শক্তির চেয়েও বেশি।

নিউট্রন স্টারের শেষ পরিণতি কী?

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন করতে করতে নিউট্রন স্টারের স্পিন ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে কমে যেতে থাকে। একসময় ডেডলাইন এসে পড়ে। ডেডলাইন বলতে সেই সীমাকে বোঝায়, যখন আর পালসার দেখা যায় না। পালসার দেখা না গেলে তখন নিউট্রন স্টার সম্পর্কে আর জানা যায় না। তবে সময়ের সাথে সাথে বিকিরণ করতে করতে নিউট্রন স্টার ঠান্ডা হতে থাকে। এটাই এখন পর্যন্ত জানা নিউট্রন স্টারের শেষ পরিণতি।

নিউট্রন স্টারকে কতক্ষণ পালসার হিসাবে শনাক্ত করা যায়, তা সাম্প্রতিক ক্যাটালগ দেখলে জানা যায়। সবচেয়ে বয়স্ক পালসার ৬০,০০০,০০০,০০০ বছরেরও বেশি পুরনো। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ পালসারগুলির বয়স ৬০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০,০০০ বছরের মধ্যে।
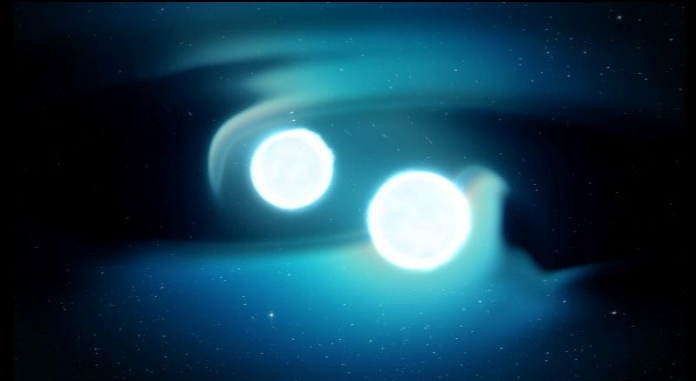
বাইনারি নিউট্রন স্টারের পরিণতি-

বাইনারি নিউট্রন স্টারও দেখা যায় মহাবিশ্বে। দুইটি নিউট্রন স্টার নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে। এভাবে মহাকর্ষীয়

তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তি বিকিরণ করে তারা স্পেইস-টাইমকে তরঙ্গায়িত করে। ফলে আস্তে আস্তে তাদের কক্ষপথ ক্ষয় হতে হতে ছোটো হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং একটি বড়ো বিস্ফোরণ ঘটে। এভাবে যে বিস্ফোরণটি হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে কিলোনোভা।

২০১৫ সালে লাইগো অবজারভেটরিতে প্রথম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল দুইটি নিউট্রন স্টারের সংঘর্ষের কারণে।

কিলোনোভার সময়ে পদার্থের অবস্থা এতটাই চরম হয় যে তারা আরো ভারী পরমাণু তৈরি করতে পারে। এটা নক্ষত্রের ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় না, বরং বিপুল পরিমাণ নিউট্রনে ভরা পদার্থ ছিটকে যেতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম, প্লাটিনাম, গোল্ডের মতো মহাবিশ্বের বেশিরভাগ ভারী পরমাণুগুলোর সৃষ্টি হয়।

সুপারনোভা ও কিলোনোভার পর ছিটকে বের হওয়া পরমাণুগুলো অনেক মিলিয়ন বছর ধরে গ্যালাক্সির মধ্যে ভেসে বেড়ায়। এদের মধ্যে কেউ হয়তো ধীরে ধীরে মেঘের মতো একটা আস্তরণ তৈরি করে, যেটি মহাকর্ষের প্রভাবে নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে নতুন কোনো নক্ষত্রের জন্ম দেয়। এর আশেপাশে হয়তো অনেকগুলো গ্রহ তৈরি হয়ে সে নক্ষত্রকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। আমাদের সৌরজগৎ এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন।

আমাদের চারপাশে যে জটিল মৌলগুলো দেখা যায়, তার সবই হয়তো অতীতে কোনো নক্ষত্রের মৃত্যুর সময়ে তৈরি হয়েছিল।

ভাবতেই অবাক লাগে যে আমাদের দেহের জটিল জটিল পরমাণুগুলো তৈরি হয়েছে সেই নক্ষত্রের অভ্যন্তরে!
এজন্যই বলা হয়ে থাকে আমরা নক্ষত্রের সন্তান।
একদিন আমি আমার মাকে বলেছিলাম, "আমি নক্ষত্রের সন্তান।"
মা বলেছিল, "নক্ষত্র তো তোরে গর্ভধারণ করছিল, তাই না?"
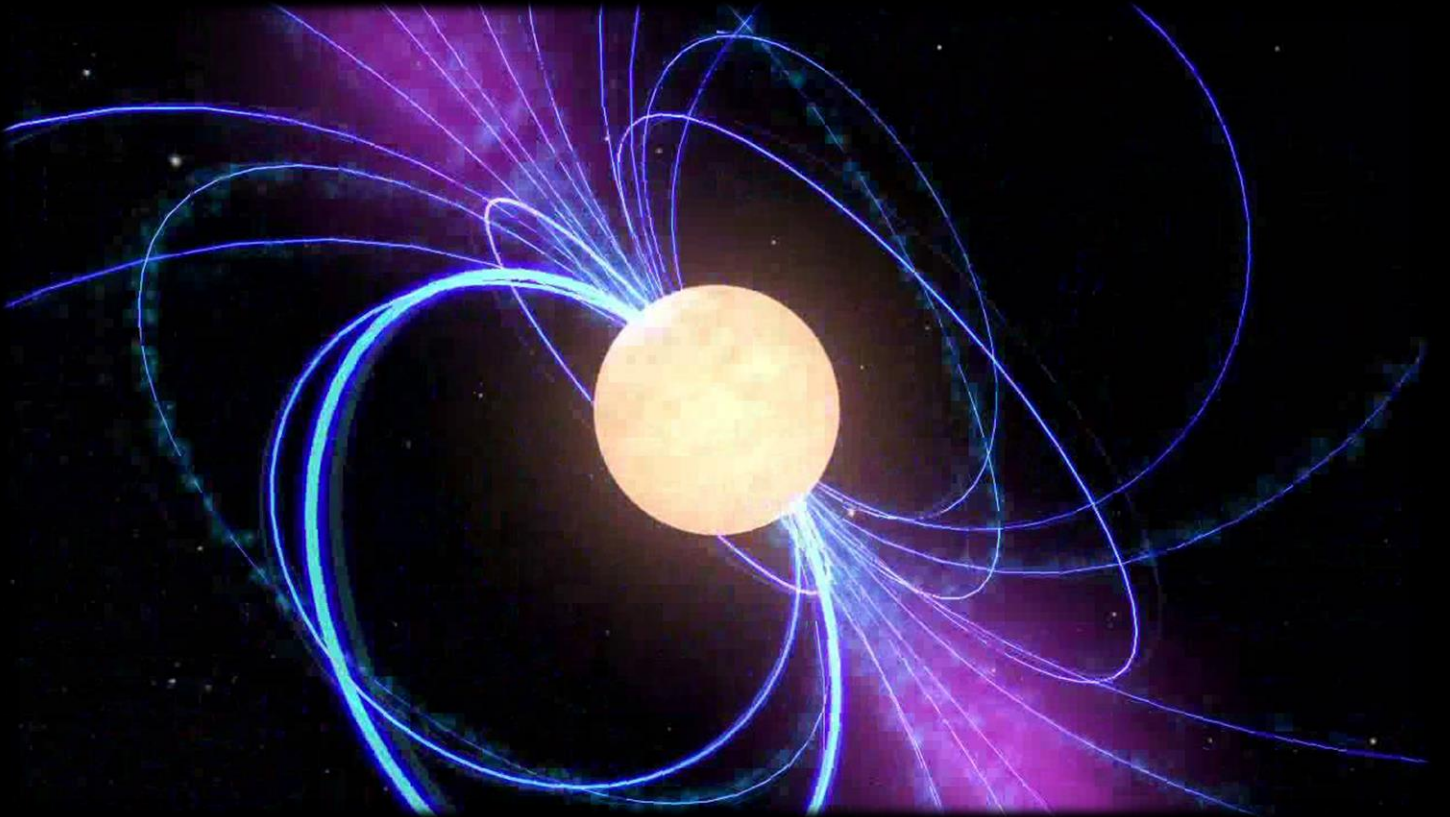
তারা ও তারামণ্ডল নিয়ে নতুনদের কিছু প্রশ্নের সহজ উত্তর।

উত্তর দিয়েছেন: সজিব হোসেন

১. রাতের আকাশে কি শুধু মিল্কিওয়ের তারাই দেখা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ। আসলে মিল্কিওয়েরও অল্প একটু অংশই আমরা দেখতে পাই। উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল মোটামুটি ৫,০০০ তারা আমরা দেখি খালি চোখে।

আর মিল্কিওয়ের বাইরে বলতে গেলে অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমালার দিকে M31 বা অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিকে বিলিয়ন বিলিয়ন তারাসহ অস্পষ্টভাবে দেখা যায় আমাদের উত্তর গোলার্ধ থেকে।

২. বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন তারামণ্ডল দেখা যায় কেন?

উত্তর: বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময় পৃথিবী সূর্যের চারদিকে তার বেঁধে দেওয়া পথের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে।

সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, পৃথিবী ১ বছরে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে। মার্চ মাসে পৃথিবী যেখানে আছে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তো সেখান থেকে আরও এগিয়ে যাবে, আর পরের বছর মার্চে আবার ওখানেই ফিরে আসবে। এখন পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আছে (প্রতিনিয়তই এগুচ্ছে)। এই জায়গায় যে পাশে সূর্য তার বিপরীতে যেসব নক্ষত্র আছে, আমরা সেগুলো দেখতে পাব। আবার যখন পরে পৃথিবী আরেকটু এগিয়ে যাবে তখন সেখানকার সূর্যের বিপরীতের তারামণ্ডলসমূহকে দেখতে পাব। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তারামণ্ডল দেখা যায়।

৩. সব তারা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়, ধ্রুবতারা যায় না কেন?

উত্তর: আসলে কোনো তারাকেই আমরা রাতের আকাশে নিজের স্থান থেকে নড়তে দেখি না। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে নিজ অক্ষে ঘোরার কারণে আমরা আকাশের বস্তুগুলোকে তথা সূর্য ও তারাগুলোকেকে উলটো দিকে ঘুরতে দেখি অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি। তাহলে ধ্রুবতারাকে কেন দেখি না ঘুরতে?

পৃথিবী যে অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘোরে, সেই অক্ষের সোজাসুজি ধ্রুবতারা অবস্থিত। তাই পৃথিবীর যে অংশে আপনি দাঁড়িয়ে, তা চব্বিশ ঘণ্টায় ঘুরে প্রতিনিয়ত তারাদের সাথে থাকা সোজাসুজি অবস্থান হারালেও অক্ষ ধ্রুবতারার সোজাসুজিই থাকে।

৪. তারামণ্ডলের প্রতিমাণ নকশা পাল্টে যায় না কেন?

উত্তর: আগে বলি, একজনের মনে কেন এই প্রশ্ন জাগবে?

কারণ একটা constellation-এ আমরা যে তারাগুলো দেখি, তা পরস্পরের থেকে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। অনেক বলতে বহু আলোকবর্ষ দূরে দূরে। আর মিল্কিওয়ের সকল তারা তাদের নিজেদের কক্ষপথে, তাদের গ্রহসমেত, নিজস্ব গতিতে মিল্কিওয়ের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। তাহলে তারামণ্ডলের তারারা কেন নিজেদের থেকে দূরে দূরে গিয়ে প্যাটার্ন পরিবর্তন করে না?

এবার উত্তরে আসি। হ্যাঁ, constellation-এর আকার পরিবর্তন হয়। In fact, প্রতিনিয়তই হচ্ছে। এমনকি এক্স্যাক্টলি এখন Orion-এর এই আকারে নেই, যেই আকার আমরা দেখছি। কারণ অতদূর থেকে আলো আসতে অনেক সময় লাগে। তাই তারামণ্ডলের প্যাটার্নের অল্প পরিবর্তন পৃথিবী থেকে দেখতে অনেক সময় লেগে যায়।
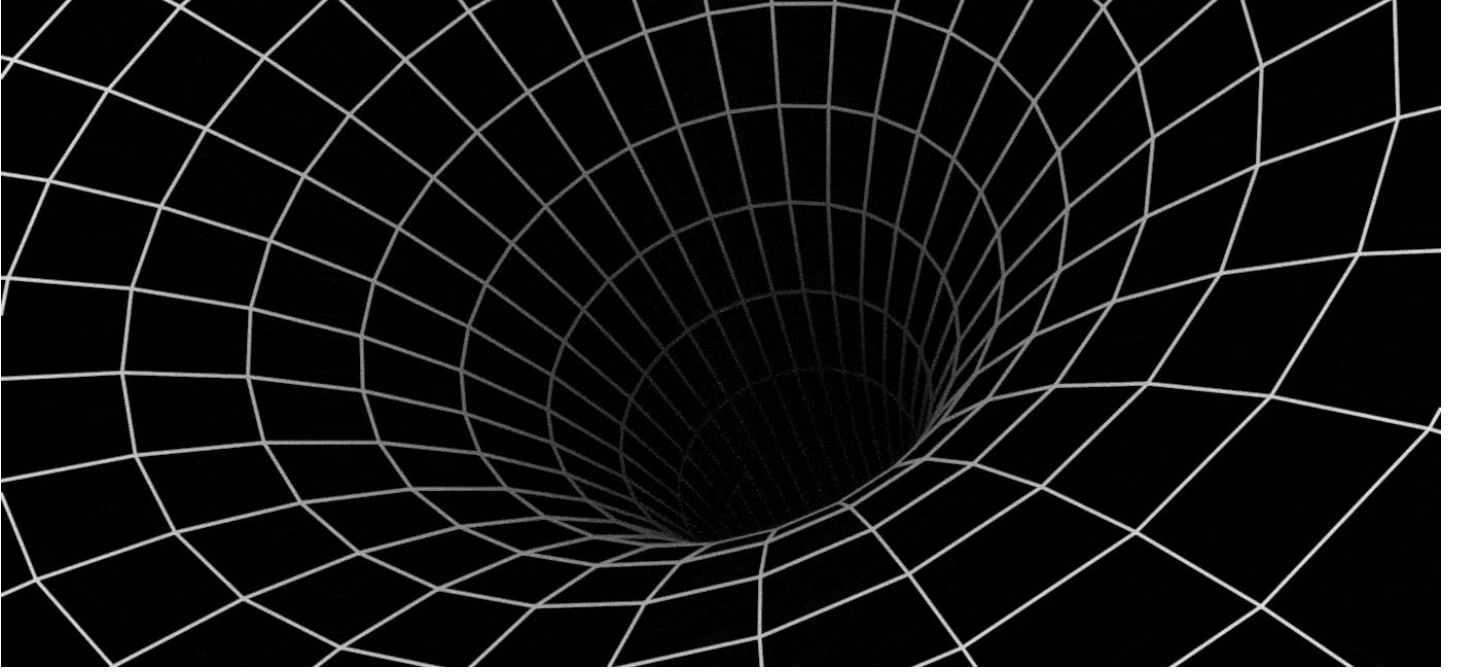
মহাবিশ্ব বা বিগ ব্যাং-এর শুরু: সিঙ্গুলারিটি কী?

(1÷0=?)

রিপন বিশ্বাস

অনেককেই জিজ্ঞেস করতে দেখা যায়, যেহেতু বিগ ব্যাং-এর আগে কোনো স্থান বা স্পেইস ছিল না; আবার যেহেতু বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন বিগ ব্যাং একটি বিন্দু থেকে শুরু হয়েছিল, তাহলে সেই বিন্দুটি কোথায় ছিল?

এটি আসলেই একটি জটিল প্রশ্ন। আজ এটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক।

বিগ ব্যাং অনুযায়ী, আজ থেকে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের সমস্ত স্থান সংকুচিত অবস্থায় একটি বিন্দুতে ঘনীভূত ছিল, বিজ্ঞানে যেটিকে বলা হয়ে থাকে সিঙ্গুলারিটি (singularity)।

সেটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সিঙ্গুলারিটি আসলে কী জিনিস? এটা বোঝার জন্য আমরা একটা সিম্পল উদাহরণ চিন্তা করতে পারি।

ধরা যাক, কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করল, একটা সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল কত হয়?

একটু ভেবে বলুন তো উত্তরটা কত?

কোনো একটা সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কী হয়, প্রশ্নটি শুনতে অতি সরল মনে হলেও এর সমাধান কিন্তু বিরাট রহস্যময়। উপরন্তু, এর ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে মহাবিশ্বের অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর!

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, যদি আমরা এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারতাম, তাহলে আমরা এই মহাবিশ্বের অনেক অজানা রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে ফেলতে পারতাম!

আমাদের সকল চিন্তা-ভাবনার জগৎ আটকে গিয়েছে এই ছোট্ট একটা ভাগে অর্থাৎ, যে-কোনো সংখ্যা (শূন্য বাদে) ÷০ ভাগটিতে।

আজ আমরা দেখব, কোনো একটা সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত পাওয়া যায় এবং কোথায়, কীভাবে আটকে গিয়েছে আমাদের প্রকৃতিকে বোঝার ক্ষমতা।

আমরা একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে শুরু করি।

ধরা যাক, আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো ১০কে ১০ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত হবে?

খুব সহজ। এর উত্তর ১, অর্থাৎ ১০÷১০=১।

এত সহজ ম্যাথ কে না জানে!

এবার জিজ্ঞেস করা হলো, ১০কে ৫ দ্বারা ভাগ করলে কত হবে?

উত্তর: ২।

১০÷৫=২

আচ্ছা, ১০কে ২ দ্বারা ভাগ করলে কত হবে?

১০কে ২ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হবে ৫।

এবার ১০কে ১ দ্বারা যদি ভাগ করি, ভাগফল কত হবে?

উত্তর: ১০।

১০কে ০.১ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত হবে?

উত্তর: ১০০।

১০÷০.১=১০০।

১০কে ০.০১ দ্বারা ভাগ করলে?

উত্তর হলো ১,০০০।

এবার আমরা উপরিউক্ত ভাগগুলোকে পর পর সাজিয়ে একটু লিখে দেখি কেমন সুন্দর লাগে দেখতে ওদের! কী বলেন?

১০÷১০=১

১০÷৫=২

১০÷২=৫

১০÷১=১০

১০÷০.১=১০০

১০÷০.০১=১,০০০

১০÷০.০০১=১০,০০০

১০÷০.০০০০১=১০০,০০০

১০÷০.০০০০০১=১,০০০,০০০

১০÷০.০০০০০০১=১০,০০০,০০০

- -

১০÷০.০০০০০০০০০০০১=১০০,০০০,০০০,০০০

আচ্ছা,ওপরের ভাগগুলোর দিকে আপনি কি একটু ভালোমতো খেয়াল করে দেখেছেন? বলুন তো, কী ঘটে চলেছে উক্ত ভাগগুলোতে?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা যদি ভালোমতো লক্ষ করি, তাহলে একটা মজার জিনিস দেখতে পাই। আর সেটি হলো, ১০কে ঠিক রেখে আমরা যদি ১০কে যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করছি, সেটি ক্রমাগত ছোটো করতে থাকি, তাহলে আমাদের ভাগফল ততই বড়ো হতে থাকে!

বেশ সুন্দর, তাই না?

আচ্ছা, এখন আমি যদি আপনাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, আপনি কি দয়া করে আমার প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারবেন?

বলুন তো, দেখি 'শূন্যের' একেবারে কাছাকাছি সংখ্যা কত?

০.০০১?

কেন, আমি তো দশমিকের পরে আরও শূন্য যোগ করে আপনার বলা সংখ্যার চেয়ে আরও ছোটো সংখ্যা কল্পনা করতে পারি!

যেমন, দশমিকের পরে দুই বিলিয়ন শূন্য তারপরে এক।

এতেও আমি সন্তুষ্ট নই, আমি তো আরও ছোটো সংখ্যা কল্পনা করতে পারি।

যেমন:

০.০০০০০০০০০.....(এক ট্রিলিয়ন শূন্য)...০০০০০১

আসলে আমার জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো আমরা প্রকৃতপক্ষে জানি না শূন্যের একেবারে নিকটবর্তী সংখ্যা কত।

আমরা দশমিকের পরে ক্রমাগত শূন্য বসিয়ে আমাদের কল্পনাকৃত সংখ্যাটিকে আরও ছোটো চিন্তা করতে পারি এবং এই প্রসেসের কোনো শেষ নেই।

ওকে, ফাইন।

এবার তাহলে মূল আলোচনায় আসা যাক।

আচ্ছা, আমরা যদি ১০কে একেবারে শূন্যের কাছাকাছি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে পারতাম, তাহলে ভাগফল কত পেতাম?

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ভাগফলগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা সহজেই এর উত্তরটি দিতে পারি। আমরা বিরাট এক সংখ্যা পেতাম। এমন বড়ো এক সংখ্যা পেতাম, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

সেই সংখ্যাকে আমরা পর পর ডিজিট আকারে লিখেও কোনোদিন শেষ করতে পারতাম না।

আমি আরেকটু বাড়িয়ে বলি, কেমন?

লিট্যারালি যদি আমরা ১০কে শূন্য দ্বারা ভাগ করতে পারতাম, তাহলে আমরা এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সংখ্যাটি পেতাম!

সেই বড়ো সংখ্যাটি কত?

আমি আপনাদের নিকট খুবই দুঃখিত, আমি আসলে জানি না। আমি কল্পনাও করতে পারছি না, সে সংখ্যাটি আসলে কী।

ধরা যাক, সংখ্যাটির নাম দিলাম অসীম (যার কোনো শেষ নেই)।

অর্থাৎ, আমি বললাম,“১০কে ০ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পাওয়া যায় অসীম।”

১০÷০=অসীম।

কিন্তু, এই বিবৃতিটিতেও রয়ে গেছে এক বিরাট ঘাপলা।

আপনি কি ভালোমতো খেয়াল করেছেন, সমস্যাটা কোথায়? না বুঝলে নিচের ভাগটির দিকে তাকান।

১৮÷৩=৬

অর্থাৎ, ১৮কে ৩ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল পাওয়া যায় ৬।

বিপরীতক্রমে আমরা বলতে পারি, ৩কে ৬ দ্বারা গুণ করলে গুণফল ১৮ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, আপনি যদি তিনটি ছয় বা ছয়টি তিন এক জায়গায় জড়ো করেন, তাহলে আপনি ঠিক আগের ভাগের ভাজ্যটি অর্থাৎ, আঠারো পাবেন।

কিন্তু ১০÷০ =অসীম-এটার দিকে তাকালে আমরা তো এক বিরাট গ্যাঞ্জামে পড়ে যাই। অসীম সংখ্যক শূন্যকে যোগ করে তো আমরা ১০ পাই না। কেননা, আমরা এক কোটি কেন, দশ কোটি শূন্যকে যোগ করলেও শূন্যই পাই।

কী এক মহাগ্যাঞ্জাম!

তাহলে এখানে কী ঘটে চলেছে?

We don't know. আমরা জানি না এর সঠিক উত্তর কী। আমাদের ব্রেইনের সেই ক্যাপাবিলিটি নেই। হয়তো অন্য কোনো জগতে এটার উত্তর আছে, but our brain can't process that division in this world.

হয়তোবা হায়ার ডাইমেনশনের জগতে কিংবা আমাদের চেয়ে কোটি কোটি গুণ উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার প্রাণীদের এই প্রশ্নের উত্তর জানা আছে। Who knows the deepest mystery of this universe!

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন গণিতবিদরা কেন বলে থাকেন, “যে-কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল অসংজ্ঞায়িত।”

অর্থাৎ, ১÷০=অসংজ্ঞায়িত (তার মানে, আমাদের এই জগতে এই ভাগের উত্তর জানা নেই, আমরা এটাকে কোনোভাবেই সংজ্ঞায়িত করতে পারি না, আমাদের ব্রেইনের সেই ক্যাপাবিলিটি নেই)।

শুরুতেই কী যেন বলেছিলাম?

এই ছোট্ট একটি ম্যাথে আটকে গিয়েছে মহাবিশ্বের অনেক জটিল জটিল প্রশ্নের উত্তরগুলো।

আপনি এবার নিশ্চয়ই সিঙ্গুলারিটি (singularity) কী, এ সম্পর্কে একটু হলেও আঁচ করতে পেরেছেন।

বিভিন্ন বইতে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিগ ব্যাং পড়ে থাকলে আপনার অনেকবারই এই শব্দটির মুখোমুখি হওয়ার কথা।

আগেই বলেছি, অনেককেই আপনি হয়তো বলতে শুনেছেন, মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি সিঙ্গুলারিটি থেকে। আপনি যদি সময়ের অতীত দিকে এই মহাবিশ্বকে পরিচালিত করেন, তাহলে এই মহাবিশ্বের আকার ছোটো হতে থাকবে এবং এক সময় সমস্ত স্পেইস বা স্থান সংকুচিত হয়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হবে। সেই বিন্দুটিতে তখন এই মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত থাকবে।

তখন স্পেইসের বা শূন্যস্থানের এনার্জি ডেনসিটি বা শক্তির ঘনত্ব কত হবে?

মহাবিশ্বের সব শক্তি÷বিন্দুর ন্যায় ছোটো স্থানের আয়তন~অসীম শক্তি ঘনত্ব

(তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে বিন্দুর সংজ্ঞানুযায়ী বিন্দুর আসলে কোনো আয়তন নেই।)
আসলে আমরা জানি না, ওই অবস্থায় মহাবিশ্বের শক্তির ঘনত্ব কত ছিল।
আমাদের সমস্ত ম্যাথ-ফিজিক্সই এই জায়গায় গিয়ে আটকে যায়!
এবার আসা যাক আরেকটি উদাহরণে।
ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন? ব্ল্যাক হোলের ব্যাখ্যায় আমরা এই একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হই। ব্ল্যাক হোলের ব্যাখ্যায় আইনস্টাইনের যে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণটি আসে, তার সমাধান করতে গিয়ে শূন্য দ্বারা ভাগ সম্বলিত দুটো টার্ম আসে। আর সেখান থেকেই যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত (এদের ভেতর একটা টার্ম থেকে পাওয়া যায় ঘটনা দিগন্ত বা ইভেন্ট হরাইজন (event horizon), আরেকটা নির্দেশ করে একেবারে ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রের বিন্দুটি। লেখা সহজ করার জন্য আমি ওটার বিস্তারিত আলোচনায় গেলাম না এবং ইকুয়েশনও ব্যবহার করলাম না)।
এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, লেখার শুরুতে আমি কেন বলেছিলাম, যদি আমরা কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করার পদ্ধতি এবং প্রাপ্ত ভাগফল জানতাম, তাহলে আমরা এই মহাবিশ্বের বিরাট বিরাট রহস্যের সমাধান বের করে ফেলতে পারতাম!

এখন থেকে নিশ্চয়ই আপনার মনে থাকবে সিঙ্গুলারিটি কী জিনিস এবং যে-কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফলকে কেন অসংজ্ঞায়িত ধরা হয়।

গ্রহান্তরের মৃত্যুদূত

তাজউদ্দীন আহমেদ

১.
মার্চ ২০৩০
Keplar 12 b

KASA-র বিজ্ঞানীরা গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁদের সামনে ঘোর বিপদ।

– "তো মহামান্য সভ্যগণ, খুব জরুরি ভিত্তিতে আজকের এই সভা ডাকা হয়েছে। আশা করি ইতোমধ্যেই সবাই জেনে গিয়েছেন ইন্টারগ্যালাক্টিক ডিটেকটিভ অ্যাজেন্সি থেকে যে খবরটা এসেছে, তার সম্পর্কে।" গম্ভীর গলায় বললেন প্রধান বিজ্ঞানী ক্লাউস মরগ্যান।
"গ্যালাক্সির সবচেয়ে ভয়ানক গ্রহ থেকে আমাদের গ্রহের প্রতি কুনজর দেওয়া হয়েছে।"

বলা হচ্ছে C 246 অর্থাৎ Earth এর কথা।

– হ্যাঁ, আসলে গ্রহটি তো দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু ভয়ানক হচ্ছে সেই গ্রহের প্রাণীরা।

"মূলত একটি প্রজাতির প্রাণীরাই ভয়ানক। হোমো স্যাপিয়েন্স। " কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন জীববিজ্ঞানী রুশেভ।

– ওরা নিজেরাই নিজেদের ভয়ানক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। নিজেদের গ্রহকে বসবাসের অযোগ্য করে এখন ওরা আমাদের দিকে নজর দিয়েছে।

– এদের থামাতে হবে। এদের ওপর হামলা করতে হবে,” বললেন পদার্থবিজ্ঞানী জুয়ান।

– না, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ওরা অনেক উন্নত। আমাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকলেও ওরা অন্য অনেক গ্রহের চেয়ে উন্নত। ওদের কাছে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে।

– আমরা নিজেদের কোনো ধরনের ক্ষতি চাই না।

“একটা অ্যান্টিম্যাটার বোমা পাঠিয়ে ওদের পুরোপুরি ভ্যানিশ করে দিলে কেমন হয়?” বললেন রসায়নবিদ ক্রিস্টিনা, তাঁর চোখে উৎসাহী ভাব।

“না, তাতে অন্য প্রাণীরাও মারা যাবে। আমরা এক জাতির জন্য সবাইকে মারতে পারি না। ” মরগ্যানের কণ্ঠে নেতিবাচক সুর।

– আমি একটি উপায় পেয়েছি।

সবাই উৎসাহ নিয়ে তাকাল জীববিজ্ঞানী রুশেভের দিকে।

– ওই গ্রহে স্পাই অ্যানহিলেটর পাঠিয়েছিলাম। ওরা চুপিসারে কাজ সম্পন্ন করেছে। অভিযান সফল হয়েছে। ওরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছে। আমি স্টাডি করে জানতে পেরেছি, সেই গ্রহের প্রাণীদের ইমিউন সিস্টেম অনেক দুর্বল আমাদের চেয়ে। ২০১৯-২০ সালে একটা মহামারি দেখা দিয়েছিল ওখানে, যেটা ওরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর মানে বুঝতে পারছেন?

“জীবাণু অস্ত্র!” চকচক করে উঠল মরগ্যানের চোখ।

– হ্যাঁ। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। আমি আজই ভাইরাস ল্যাবরেটরি থেকে একটি শক্তিশালী ভাইরাস বাছাই করছি।

২.

পৃথিবীতে বসে আলোচনায় মেতেছেন NASA-র বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী এখন প্রায় বসবাসের অযোগ্য, তাই তাঁরা তাঁদের পরবর্তী গন্তব্যের ব্যাপারে ভাবছেন।

তাঁরা জানেনও না, পৃথিবীর দিকে ভয়ানক ভাইরাস SADIAMU-2426 নিয়ে রওনা দিয়েছে কেপলার ৬২-বি-এর দুটি ইনভিজিবল স্কাউটশিপ, যা এযাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী ভাইরাস SARS-COV 2-এর চেয়েও হাজার গুণ বেশি ভয়ানক।

গাছের জগতে

গণি

১.

সূর্যের প্রখর তাপে ঝলসে যাচ্ছে পৃথিবী। কান্নায় ভেঙে পড়েছে মহাকাশযানে করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা মানুষগুলো।

"কতদিন থাকা যাবে এখানে?" মৃদু কণ্ঠে অজানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে জানতে চাইলেন প্রফেসর তিনু।

চোখের সামনে ঝলসে যেতে থাকা পৃথিবী দেখতে দেখতে প্রফেসর হনর বললেন, "জানি না।" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের করলেন তিনি। পকেটে হাত গুঁজে দিয়ে তিনি স্থিরভাবে তাকিয়ে আছেন ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবীর দিকে।

২.

তিনদিন বা ৭২ ঘণ্টা পর মহাকাশযান নড়াচড়া করতে শুরু করল প্রচণ্ডভাবে। প্রচণ্ড গতিতে কিছু একটা তাদের আঘাত করে চলেছে। কিন্তু কী?

প্রফেসর হনর অনেক চেষ্টার পরও সমস্যাটা যে কী, তা বের করতে পারলেন না। সবকিছু ঠিক আছে চারদিকে। কিছুক্ষণ পর একটা শব্দ সবাইকে স্তব্ধ করে দিলো।

"শোনো, পৃথিবীবাসী! আমরা তোমাদের নিতে এসেছি।"

শব্দ বাক্য যা-ই হোক না কেন মহাকাশযান দ্রুত চলতে শুরু করেছে।

পাঁচশত পাঁচজন মহাকাশচারী ভয়ে তটস্থ হয়ে আছেন। কীহচ্ছে?

কিছু সময় পরপর ভয়ংকরভাবে হেলে উঠছে মহাকাশযান। হনর বা তিনু কেউই কোনোভাবে কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। কিছু যে করবেন তার নিয়ন্ত্রণটাও নেই তাঁদের।

দীর্ঘ এক ঘণ্টা এরকমই চলল। এবার মহাকাশযান যেন কোথাও অবতরণ করেছে। এর স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে একটা সুন্দর উদ্ভিদে ভরপুর জায়গা। চারপাশে মানুষ আর মানুষ; যেন জীবন্ত সেই অতীত পৃথিবী!

হনর মহাকাশচারীদের বাইরের দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দিলেন। কত সুন্দর! কী অপূর্ব একটি জায়গা! সবুজ আর সবুজ।

এসবের মাঝে আবারও একটি শব্দ। শব্দ অথবা বাক্য, “স্বাগত পৃথিবীবাসী! নতুন পৃথিবীতে স্বাগত!"

মহাকাশচারীরা হনরকে অনুরোধ করলেন যেন মহাকাশযানের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

তিনু নিষেধ করে বললেন, “না, আপনি দরজা খুলবেন না।”

হনর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, “কেন? কী হয়েছে?”

তিনু কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে দেখিয়ে বললেন, “এটা মিথ্যাও হতে পারে!”

“মিথ্যা! আচ্ছা, তাহলে রোবট ড্রোন পাঠিয়ে পরীক্ষা করে নাও, তোমার যেহেতু এতই প্রবলেম!”

রোবট ড্রোন পাঠানো হলো, রিপোর্ট এলো, কোনো সমস্যা নেই, সবার বডি স্ক্যান করেও কোনো সমস্যা নেই। সব ঠিক আছে, বাতাসেও পর্যাপ্ত অক্সিজেন আছে।

এবার তিনু সম্মতি জানালেন। তাঁর আর কোনো আপত্তি নেই। হনর দরজা খুলে দিলেন।

কিন্তু, এ কী! বাইরের আলোয় বেরিয়ে সবাই মরণ চিৎকার দিতে শুরু করেছে। ঝলসে যাচ্ছে প্রতিটা দেহ।

হাসির শব্দে গগন হাসছে যেন। এক দিকে হাসি অন্য দিকে মরণ চিৎকার মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না হনর বা তিনু। দুজনেই রোবট ফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছেন বাইরে।

বাইরে মানুষের হাসাহাসির আওয়াজ আসছে এখনো।

হনর আর তিনু গোলকধাঁধাতে পড়েছেন যেন।

তাঁরা কি বেরোবেন? সবাই যে দিব্যি ভালো আছে!

তাহলে যে মরণ চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন?

“আমরা কাল বেরোই?” ভয়-ধরা কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনু।

“দেখি, রোবট ফোর্স ফেরত আসুক।” উত্তর দিলেন হনর।

রোবট ফোর্স ফেরত এলো না।

হনর এবং তিনু দুজনেই মহাকাশযান লক করে বসে রইলেন। বাইরের দৃশ্য দেখে বেরোনোর লোভ পেয়ে যাচ্ছে হনরের।

তিনু বারবার বাইরের দৃশ্যে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন। সবাই আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। একটা সময় চোখ লেগে এলো দুজনের।

হঠাৎ করে জরুরি অ্যালার্ট করার এলার্মটা বেজে উঠল। বাইরে থেকে আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে। গরমে গলে যেতে শুরু করেছে মহাকাশযানের নিচের অংশ। তিনু ও হনর ওপরের দিকে ছিলেন, তাই তাঁদের কাছে আগুন পৌঁছাল কিছুক্ষণ পরে।

হনর ও তিনু দৌড়ে পালানোর পথ হারিয়ে ফেলেছেন। প্রচণ্ড তাপে গায়ে আগুন লেগেছে। যন্ত্রণায় চিৎকার দিচ্ছেন দুজনে।

সাগরে জাহাজ ডুবে যাওয়ার মতো করে মহাকাশযানও ডুবে গেল পৃথিবীতে।

৩.

“এই যে পৃথিবীটা দেখছ, এটা ৬,৪০০ বছর আগে মানুষের অবহেলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারপর ওইটা ধ্বংস হয়েছিল ২,৫০০ বছর পূর্বে।” ম্যাডাম নিরু তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের একে একে সব পৃথিবীর ছবি দেখিয়ে সেগুলো ধ্বংসের সাল ও কারণ জানালেন।

প্রশ্ন করল তিন্নী, “মিস, আপনি বললেন যে এগুলো ধ্বংসের কারণ মানুষ! কিন্তু এরা ঠিক কী করেছে?

ম্যাডাম নিরু বললেন, “এরা গাছ কাটত, বাড়িয়ে দিত কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নষ্ট করে দিত খাদ্য শেকল।”

“আমরা কত দিন ভালো থাকব মিস?” আবারও প্রশ্ন করল তিন্নী।

“যতদিন আমরা গাছ লাগিয়ে যাব, যতদিন আমরা প্রকৃতিকে ভালোবেসে প্রকৃতিকে নিয়ে থাকব, ততদিন আমরা ভালো থাকব, পৃথিবী ভালো থাকবে, ভালো থাকবে গাছেদের জগৎ।”

আবারও তিন্নী বলল, “আর যদি গাছ নষ্ট করে ফেলে? যদি পশুপাখি মেরে ফেলে? যদি বাড়িয়ে দেয় পরিবেশচক্রের কোনো উপাদান অথবা কমিয়ে দেয় কোনো উপাদান?”

ম্যাডাম নিরু কোনো উত্তর দিতে পারলেন না এ প্রশ্নের।

মহাজাগতিক স্বপ্ন

রাজেশ মজুমদার

অসীম মহাবিশ্বের পানে তাকিয়ে আফসোস করে উঠল প্রাণীটি। কেমন করে টিকবে সে এই মৃত জগতে? চারদিকে শুধু ধূ-ধূ মরুভূমি; যেন মৃত এক প্রাণী জীবাশ্ম হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। বাতাসের গতিবেগও মন্থর হয়ে আসছে। কিছু সময়ের মধ্যে সেটাও হয়তো থেমে যাবে। পুরো গ্রহটি হয়ে উঠবে মৃত্যুপুরী। অবশ্য গ্রহটি টিকবে না সেসময় পর্যন্ত। কত আর সময়?

হয়তো কয়েক ঘণ্টা হাতে আছে। এর মধ্যেই কোনো অস্তিত্ব থাকবে না সৌরজগৎ পরিবারটির। অবশ্য অন্যান্য পরিবার থেকে আলাদা এই পরিবারটি। মাত্র দুটো গ্রহ নিয়ে গড়ে উঠেছে সিস্টেমটি, যেন দুই সহোদর ভাই। আশেপাশে কোনো উপগ্রহও নেই। তবে দুই সহোদরের টান অত্যন্ত বেশি। মাত্র কয়েক মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করছে গ্রহ দুটি। মহাজাগতিক ব্যবধানে খুবই অল্প দূরত্ব। তবে তাদের মা তথা নক্ষত্রটি যে খুবই ক্ষুব্ধ! পারলে যেন তাদের গিলে খায়।

এই পরিবারের মধ্যে এসে পড়েছে প্রাণীটি। ওর অবশ্য কিছু করার ছিল না। অদ্ভুত সময়ে এসে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মহাকাশযানটি। ভ্রমণে বেরিয়েছিল সে; মহাকাশ ভ্রমণ। উদ্ধার করতে মহাকাশের রহস্য। তবে রহস্যই থেকে গেল সবকিছু। কেন এসেছিল সে এখানে?

সে নিজেও জানে না। এই তো মাস দুয়েক আগের কথা। নিজস্ব মহাকাশযানটি নিয়ে নক্ষত্রদের প্রকৃতি জানার চেষ্টা করছিল সে।

হঠাৎই দেখা গেল নক্ষত্রটির(যেটি এখন গ্রহটির আকাশের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত বড়ো হচ্ছে এবং গ্রহটিকে গিলে খাওয়ার চেষ্টা করছে।) যেটির ভর অত্যন্ত বেশি। মূল কথা হলো এটি এর সুপারনোভা অবস্থা শুরু হওয়ার একেবারে শেষে পৌঁছে গেছে। কিছু দিনের মধ্যেই ঘটবে বিস্ফোরণটি। আর মাত্র দেড়-দুই মাস পর। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সে জানল, এই নক্ষত্রটির আবার দুটি গ্রহ রয়েছে, যেগুলোর একটি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে, যেখান থেকে কোনো প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়া বিস্ফোরণ দেখা সম্ভব।

কী কারণে সে ভুল সংকেত পেল সে নিজেও জানে না। হয়তো গ্রহটি একা একা মরতে চায়নি। তাকেও তাই আকর্ষিত করেছে। কারণ গ্রহটি নক্ষত্রটির একেবারে কাছে। বিস্ফোরণে গ্রহটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ আগে গ্রহটির সহোদর ভাইটিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন তার পালা। কীভাবে নষ্ট হলো মহাকাশযানটি?

এখানে যখন এলো তখন বিভ্রম সৃষ্টি হলো যে গ্রহটি নিরাপদ। অবতরণ করল সে গ্রহটিতে। কিন্তু সেসময়ই ঘটল দুর্ঘটনাটা। উৎক্ষেপণ মডিউলটি নষ্ট হয়ে গেল, যেটি ছাড়া সে কোনোভাবেই মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করতে পারবে না। মহাকাশযানটি থেকে নেমে আসার পর তার বিভ্রম দূর হলো। গ্রহটির খুব কাছেই নক্ষত্রটি। আর কিছুই করার নেই! এসব আর ভাবতেও ইচ্ছা করছে না। একটু পর বিস্ফোরণ হবে। হয়তো এর থেকে সৃষ্টি হবে নতুন কোনো নক্ষত্র। সেখানে সৃষ্টি হবে কোনো গ্রহ, কোনো প্রাণ, থাকবে তার অস্তিত্ব।

আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে। হাতের ওপর চোখ নিয়ে বসে পড়ল সে। গ্রহটির গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে, ধুলো উড়ছে, গলে যাচ্ছে তার শরীর, হয়তো এভাবেই শেষ হবে সৃষ্টিজগৎ এবং নতুন করে আবার বিনির্মাণ হবে।

“এই সুজন ঘুম থেকে ওঠ।”
বন্ধুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল সুজনের।

“কী হয়েছে?” জিজ্ঞেস করল সে।
“আরে, আর্দ্রা অতি নবতারায় পরিণত হবে। দেখবি আয়।”

“কী? আর্দ্রা কী? আর অতি নবতারা কী?”
“সব ভুলে গেলে কী করে হয়? আরে ‘বিটেলজিউস’ সুপারনোভায় পরিণত হবে।”
“ওহ, চল দেখি গিয়ে।”

বাইরে বেরিয়ে এলো তারা। কিছুক্ষণ পরই এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি। পুরো আকাশ ঝলমলিয়ে উঠল। মনে হলো রাতের আকাশ যেন দিনের আকাশে পরিণত হয়েছে! হঠাৎ মনে পড়ল স্বপ্নের কথা, প্রাণীটি কি এই সুপারনোভা বিস্ফোরণের কথাই বলছিল?

না, তা তো সম্ভব নয়। ওই বিস্ফোরণের সাথে বিটেলজিউস বিস্ফোরণের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ সেই নক্ষত্র সিস্টেমে নেই কোনো গ্রহ!
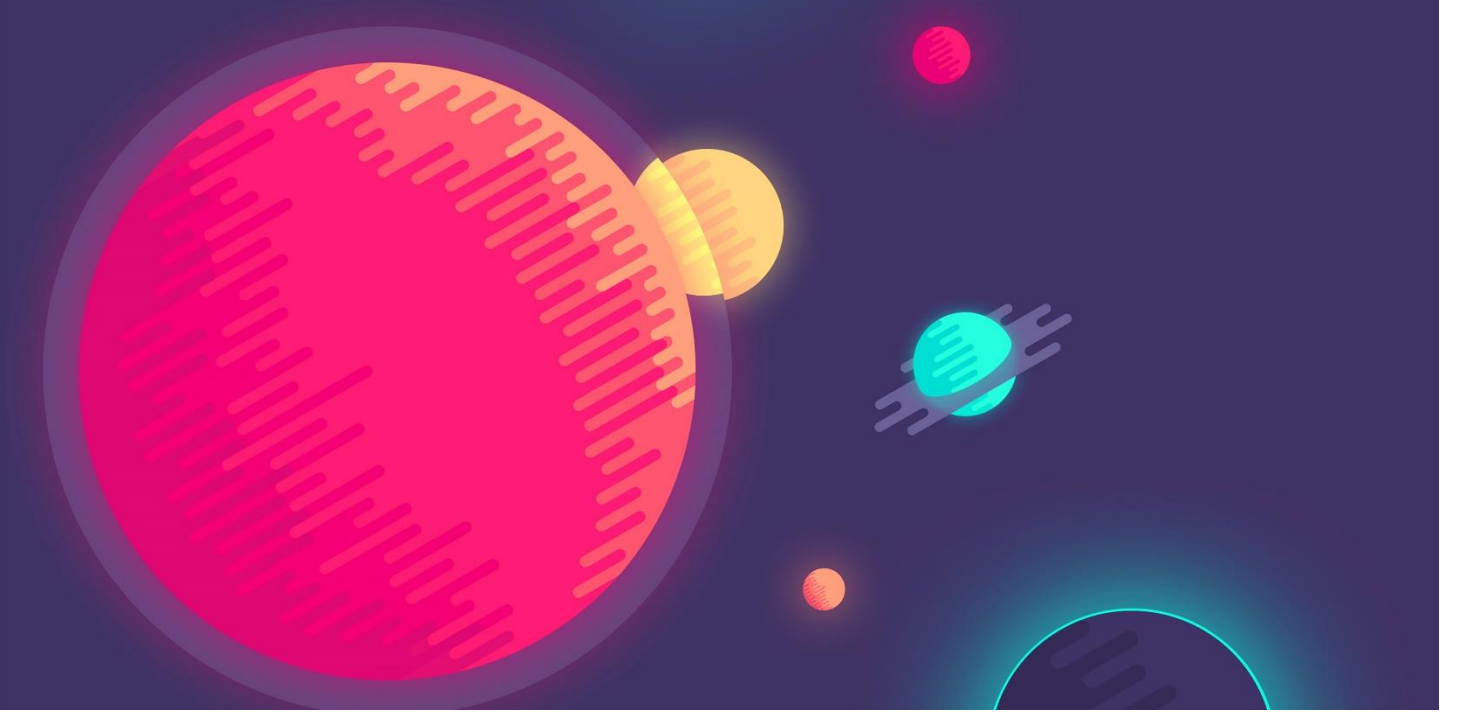
বিষমতারা

নিবির রহমান

অমাবস্যার পরিষ্কার রাতে আকাশে হাজার হাজার মিটমিট করে জ্বলা তারা অভূতপূর্ব মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। আপনি একটি খোলা মাঠে ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশে তাকালে দেখবেন ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি তারা, সারা আকাশ ভর্তি। সবগুলোই দেখতে একইরকম লাগে। কিন্তু আসলে তা না। ওখানে আছে কল্পনাতীত বৈচিত্র্য, হাজারো রহস্য! এখান থেকে যে তারকাগুলোকে এত ছোট্ট লাগছে তারা আসলে অনেক বড়ো বড়ো! যাদের দেখতে হুবহু একরকম লাগছে, সেগুলোই একটা আরেকটা থেকে কত আলাদা! কত বিচিত্র!

তারাগুলো দেখলে মনে হয় এরা একইভাবে জ্বলছে তো জ্বলছেই কিন্তু বেশিরভাগ তারাই আসলে একইভাবে জ্বলতে থাকে না। এদের ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন হয়। এই তারাগুলোকে বলা হয় বিষমতারা।

বিষমতারার উজ্জ্বলতা সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়। কোনোটা নিয়মিত, কোনোটা প্রায় নিয়মিত, কোনোটা অনিয়মিত। কোনো তারা হঠাৎ করেই অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে যায়, কোনোটা কয়েক ঘন্টা, কয়েক দিন বা মাস ধরেও ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে পারে। আবার কোনোটা ঘড়ির কাটা ধরে চেইঞ্জ হয়, কোনোটা কোনো নিয়ম-নীতির থোরাই কেয়ার করে। উজ্জ্বলতার এই পরিবর্তন কিন্তু বায়ুমণ্ডল বা আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। তারাদের অভ্যন্তরীণ কারণে তাদের উজ্জ্বলতার চেইঞ্জ হয়।

বিষমতারাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়:
১.প্রকৃত বিষমতারা, এবং
২. অপ্রকৃত বিষমতারা।

প্রকৃত বিষমতারা হলো যেগুলো আসলেই বিষমতারা, মানে ভেজাল নেই। যদি ভেজাল থাকে, তাহলে সেগুলো হলো অপ্রকৃত। কী ভাবছেন? এখানেও ভেজাল! কীভাবে সম্ভব?

আসলে সম্ভব। জোড়া তারা আছে না? জোড়া তারাগুলো একটা আরেকটাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। ধরুন, ঘুরতে ঘুরতে দুইটা তারা পাশাপাশি চলে এসেছে, যেহেতু তারা দুটো খুব কাছাকাছি অবস্থিত। তাই পৃথিবী থেকে তাদের আলাদা করে বোঝা যাবে না, একটা উজ্জ্বল তারা মনে হবে। আবার ঘুরতে ঘুরতে একটা আরেকটার পিছনে চলে গেল, তখন গ্রহণের মতো ব্যাপার হয়। তখন তাদের উজ্জ্বলতা অনেক কমে গেছে মনে হবে। আসলে কিন্তু কোনো তারার উজ্জ্বলতার কম-বেশি হয়নি, কিন্তু মনে হয় হয়েছে। এইখানেই হলো ভেজাল।

এখন তাহলে প্রকৃত বিষমতারাগুলোর রকমফের একটু দেখি চলুন।

প্রকৃত বিষমতারা প্রধানত দুই প্রকার —

১. স্পন্দিত বিষমতারা, এবং
২. বিস্ফোরক বিষমতারা।

স্পন্দিত তারা – নাম শুনেই বুঝতে পারছেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এগুলোর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়, স্পন্দনের মতো এবং প্রতিবার এই হ্রাস-বৃদ্ধির সময়কাল একইরকম থাকে।

বেশ কয়েক ধরনের স্পন্দিত বিষমতারা আছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো শেফালি (Cephied) জাতীয় বিষমতারা। এই তারাগুলো বিশাল–দানবাকৃতির। সূর্যের চেয়ে এরা প্রায় ৫০০ থেকে ৩,০০,০০০ গুণ বড়ো হয়ে থাকে। আর এদের উজ্জ্বলতা খুব কম সময়ের মাঝে চেইঞ্জ হয়। মাত্র ১ থেকে ১০০ দিনের মাঝে।

এরকম শর্ট পালসেটিং পিরিয়ড কিন্তু একটু ছোটো সাইজের পুরানো তারা নিয়ে আছে – আর আর লেয়রি (RR Lyrae) তারা।

আরভি টাউরি (RV Tauri) টাইপ তারাও স্পন্দিত তারা, এরা সাইজে অনেক বড়ো হয় এবং এদের আলোর অনেক ভেরিয়েশন আছে।

আরেক ধরনের তারা আছে যাদের স্পন্দনের পর্যায়কাল অনেক দীর্ঘ। এই লং পিরিয়ড ভেরিয়েবলসের মাঝে আছে দুই ধরনের তারা। একটা হলো মিরা, এরা রেড সুপারজায়ান্ট, বিশাল সাইজের কিন্তু তাপমাত্রা কম। এদের দীর্ঘ সময় নিয়ে উজ্জ্বলতার অনেক চেইঞ্জ হয়।

আর আছে সেমিইরেগুলার। এরা হলো
মিডল বেঞ্চারদের মতো, যতই ট্রাই করুক টাইমলি সব শেষ করবে কিন্তু শেষমেশ পুরোপুরি আর হয় না। এরা সুপারজায়ান্ট বা রেড জায়ান্ট হয় এবং এদের পিরিয়ড রেইঞ্জ ৩০ থেকে ৬,০০০ দিনের হয়ে থাকে।

বিস্ফোরক (Eruptive) তারার কাজ-কারবারও নাম শুনেই বোঝা যায়। ওই যে দুড়ুম দুড়ুম করে অনুজ্জ্বল একটা তারাকে মুহূর্তে উজ্জ্বল করে ফেলে!

হ্যাঁ, তাই আসলে। এই তারাগুলোর উজ্জ্বলতা খুব কম সময়ের মাঝে অনেক চেইঞ্জ হয়।

উদাহরণ হিসেবে আছে আমাদের প্রিয় সুপারনোভা।

কোনো তারার ভর যথেষ্ট বেশি হলে জীবনের শেষ দিকে যখন লোহা সংশ্লেষণও শেষ হয়ে যায়, তখন নিজের প্রচণ্ড ভর সহ্য করতে না পেরে এক অতি ভয়ংকর মহাজাগতিক বিস্ফোরণের
মধ্য দিয়ে তারাটা ব্ল্যাক হোল বা নিউট্রন স্টারে পরিণত হয়। আর তখন এর উজ্জ্বলতা একশ মিলিয়ন গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

আরও আছে নোভা, রিকারেন্ট নোভা। কোনো ক্লোজ বাইনারি সিস্টেমে শ্বেত বামনে যদি একবার বিস্ফোরণ হয় তবে তাকে ক্লাসিক্যাল নোভা বলে। আর কোনো কোনো শ্বেত বামনে যদি বার বার এমন বিস্ফোরণ হয়, তাহলে তাকে রিকারেন্ট নোভা বলে। এদের ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পায়। মূলত এদের সার্ফেসে ঘটা বিস্ফোরণের কারণে এমন হয়। আর এদের উজ্জ্বল অবস্থার স্থায়িত্বও কম হয়।

আর হ্যাঁ, আপনি কি জানেন আমাদের সূর্যও একটা বিষমতারা?

সমুদ্রের চেয়েও বেশি পানি আছে যে পাথরের মধ্যে

মোহাম্মদ নেওয়াজ উদ্দিন

অবশেষে আমরা পৃথিবীর অন্যতম বড়ো আরেকটা পানির উৎসের সন্ধান পেয়েছি। আর তা হলো- এনস্ট্যাটাইট কনড্রাইটস (enstatite chondrites) নামের মেটাল। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এমনটাই দাবি করেছেন। তো চলুন, এই এনস্ট্যাটাইট কনড্রাইটস সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত জানা যাক।

এই এনস্ট্যাটাইট কনড্রাইটসগুলো হলো মূলত প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্কের অবশিষ্ট অংশ যা থেকে পাথুরে গ্রহগুলো গঠিত হয়েছিল। এগুলো পৃথিবীর সাথেও সাদৃশ্যযুক্ত, তবে পূর্বে এগুলোতে পানি থাকলেও এর পরিমাণ বেশ কম মনে করা হতো।

তবে সম্প্রতি লরেট পিয়ানির নেতৃত্বে ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি অব লরেন-এর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পানি সঞ্চিত আছে যা কিনা সমুদ্রও ভরাট করে দিতে সক্ষম।

তো, অ্যাস্টেরয়েডের পানি কি পৃথিবীর পানির মতোই একই কি না, তা দেখতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আইসোটোপগুলোর ওপর বহু পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে পৃথিবীর পানি এবং এই এনস্ট্যাটাইট কনড্রাইটস-এর পানি এক নয়।

গবেষণায় জানা যায়, এই এনস্ট্যাটাইট কনড্রাইটস গ্যাসীয় কার্বন এবং অক্সিজেন যৌগ সমৃদ্ধ পরিবেশে সূর্যের কাছাকাছি, সৌরজগতের প্রথম মিলিয়ন বছরে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আরও বিস্তর গবেষণায় দেখা গেছে যে- অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, টাইটানিয়াম, নিয়োডিমিয়াম, ক্রোমিয়াম, নিকেল, মলিবডেনাম এবং রুথেনিয়ামসহ বেশ কয়েকটি উপাদান এনস্ট্যাটাইট কনড্রাইটসকে পৃথিবী ও চাঁদ থেকে আলাদা করেছে।

পিয়ানি ও তাঁর দল বিরল এনস্ট্যাটাইট মিটিয়োরাইটসের ১৩টি নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে জানায় এই উল্কাপিণ্ডে পানির পরিমাণ ০.০৮% থেকে ০.৫%। তবে পিয়ানি বলেছেন যে,"সর্বাধিক মানসম্মত পাথরে ৯০% পর্যন্ত পানি থাকতে পারে।"
তো, এখন হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের কাছে কি পর্যাপ্ত পরিমাণ এনস্ট্যাটাইট আছে যা দিয়ে সমুদ্র ভরে ফেলতে সক্ষম হবো? তবে তার উত্তর হলো - 'না'। আকাশ থেকে পৃথিবীতে পড়া সামান্য পরিমাণ উল্কাই আমাদের কাছে আছে।

তবে অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশ থেকে এগুলো সংগ্রহ অসম্ভব নয়, যা কিনা পৃথিবীর পানীয় জলের অন্যতম বড়ো উৎস হতে পারে।

এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো, পানি কীভাবে পাথরে পরিণত হয়েছিল? তাত্ত্বিকভাবে এটি বাষ্পীভূত হওয়া উচিত ছিল। এটি জানতে পিয়ানির গোষ্ঠীটি উল্কাগুলোতে হাইড্রোজেন বহনকারী উপাদানগুলোর আরও অধ্যয়ন করতে এবং এর আচরণের পাশাপাশি সৌরজগতে উপস্থিত থাকা অন্যান্য উদ্বায়ীগুলোর তদন্ত করার জন্য একটি নতুন সিরিজ পরীক্ষার পরিকল্পনা করেছেন।

Periodic Table of The Elements

Atomic Number / Symbol / Name

1 IA 1A	2 IIA 2A	3 IIIB 3B	4 IVB 4B	5 VB 5B	6 VIB 6B	7 VIIB 7B	8	9 VII 8	10	11 IB 1B	12 IIB 2B	13 IIIA 3A	14 IVA AA	15 VA 5A	16 VIA 6A	17 VIIA 7A	18 VIIIA 8A
1 H Hydrogen																	2 He Helium
3 Li Lithium	4 Be Beryllium											5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon
11 Na Sodium	12 Mg Magnesium											13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon
19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton
37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon
55 Cs Cesium	56 Ba Barium	57-71	72 Hf Hafnium	73 Ta Tantalum	74 W Tungsten	75 Re Rhenium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platinum	79 Au Gold	80 Hg Mercury	81 Tl Thallium	82 Pb Lead	83 Bi Bismut	84 Po Polonium	85 At Astatine	86 Rn Radon
87 Fr Francium	88 Ra Radium	89-103	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	113 Uut Ununtrium	114 Fl Flevorium	115 Uup Ununpentium	116 Lv Livermorium	117 Uus Ununseptium	118 Uuo Ununonctium

Lanthanide Series	57 La Lanthanum	58 Ce Cerium	59 Pr Praseodymium	60 Nd Neodymium	61 Pm Promethium	62 Sm Samarium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium	71 Lu Lutetium
Actinide Series	89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Proactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium

Alkali Metal | Alkaline Earth | Transition Metal | Basic Metal | Semimetal | Nonmetal | Halogen | Noble Gas | Lanthanide | Actinide

মৌলের নামকরণের গল্প

রাকিন শাহরিয়ার

ধরো, তুমি একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী। আরও ধরে নাও যে তুমি একটা নতুন মৌল আবিষ্কার করে ফেলেছ। ১১৯ নাম্বার মৌলটাই তুমি আবিষ্কার করেছ। এখন এটাকে একটা নাম দিতে হবে। তোমার আবার বিনোদ নামটা খুব পছন্দ, তাই তুমি মৌলটার নাম দিলে বিনোদিয়াম। তুমিই তো আবিষ্কারক, তাই না? তুমি যা ইচ্ছা নাম দেবে, সেটাই তো ওই মৌলের নাম হওয়ার কথা, তাই না?

উত্তর হচ্ছে – না। আবিষ্কারক হিসেবে তোমার মৌলটার নাম দেওয়ার অধিকার আছে ঠিকই, কিন্তু সেই নামটাকে অ্যাপ্রুভ করতে পারবে শুধুমাত্র IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry)।

রসায়নবিদগণ অতিগুরুত্বপূর্ণ এই মৌলগুলোর যৌক্তিক নামকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন অনেক আগে থেকেই। মোটামুটি ১৭৮০ সালের দিকে, আধুনিক পর্যায় সারণি তৈরি হওয়ার প্রায় ১০০ বছর আগে। নতুন নতুন মৌলের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল, ততই এদের নামকরণের গুরুত্ব বাড়তে লাগল। কিন্তু যে-কোনো একটা নাম হলেই তো হবে না! নাম হতে হবে এমন যা মনে রাখা সহজ হবে এবং যা হবে অনন্য।

বহু আলোচনা, সমালোচনা ও বাগবিতণ্ডার পর অবশেষে ১৯১৯ সালে IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) প্রতিষ্ঠিত হলো। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে রসায়নের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড গড়ে তোলা; মৌল আর যৌগের নামকরণের নিয়ম তৈরি করাও যার অন্তর্ভুক্ত হবে।

তো সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু...

মোটামুটি ১৯৪০ সালের মধ্যেই প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন সবগুলো মৌল আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই সবগুলোর প্রোটন-সংখ্যা ছিল ভিন্ন এবং অনন্য। কিন্তু কোয়ান্টাম রসায়নের কিছু জটিল নিয়ম থেকে ধারণা করা যাচ্ছিল যে আরও মৌলের অস্তিত্ব থাকা উচিত। তো বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, "যদি প্রকৃতিতে আর কোনো মৌল না পাই, তাহলে আমাদের নিজেদেরই সেই মৌল তৈরি করতে হবে।"

এটা করা তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার নয় আসলে। ইতোমধ্যে যে মৌলগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর প্রোটন-সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলেই তো হয়ে গেল! এটা যদি সফলভাবে করা যায় তাহলেই তো আরও নতুন মৌল আবিষ্কার করা সম্ভব! তবে সেরকম করলে এগুলো আর প্রাকৃতিক থাকবে না, এগুলো হয়ে যাবে কৃত্রিম মৌল।

তো আমেরিকা আর রাশিয়ার (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) বিজ্ঞানীরা এসব কৃত্রিম মৌল তৈরি করতে উঠেপড়ে লাগল। IUPAC ঠিক করল, যে দেশ কৃত্রিম মৌল তৈরিতে সফল হবে, নামকরণের অধিকারও সে দেশই পাবে আর সে নাম তো অবশ্যই IUPAC দ্বারা অ্যাপ্রুভড হতে হবে।

এমনিতেই আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে দা-কুমড়া সম্পর্ক, তার ওপর আবার এই ধরনের ঘোষণা আসায় দুই দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হতে লাগল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে মনে পড়ল ট্রান্সফারমিয়াম যুদ্ধের (transfermium wars) কথা। ষাটের দশকের দিক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত এই ট্রান্সফারমিয়াম যুদ্ধ চলেছে।
ভ্রু কুঁচকে হয়তো ভাবছ, ট্রান্সফারমিয়াম যুদ্ধ আবার কী জিনিস?

ট্রান্স মানে পরে আর ফারমিয়াম (fermium) হচ্ছে পর্যায় সারণির ১০০ নাম্বার মৌল। এই যুদ্ধটা হয়েছে ১০০ নাম্বার মৌলের পরের মৌলের নামকরণ নিয়ে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ১০৪ থেকে ১০৯ নাম্বার মৌলগুলো নিয়ে। রাশিয়া, আমেরিকা আর জার্মানির বিজ্ঞানীরা প্রায় একই সময়ে এই মৌলগুলো আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তাঁরা এগুলোকে নিজেদের পছন্দমতো নামকরণ করতে চেয়েছিলেন। এ বলে আমার নাম রাখব, ও বলে আমার নাম রাখব। এ নিয়েই এঁদের মধ্যে শুরু হয় কথার লড়াই। ঝগড়া-বিবাদ, বাগবিতণ্ডা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৯৭ সালে IUPAC ঝগড়া থামাতে এলাকার বড়োভাইয়ের মতো এগিয়ে আসে। এসে বলে, "তোরা এত ঝামেলা করিস না। এক কাজ কর। ১০৪ থেকে ১০৯ পর্যন্ত ছয়টা মৌল তোরা তিন দেশ ভাগ করে নে। এই আমেরিকা, তুই ১০৪ আর ১০৬ নিবি। যা এখন। রাশিয়া এদিকে আয়। তুই ১০৫ আর ১০৭ নিয়ে যা। জার্মানি ১০৮ আর ১০৯ নে। এখন যা তো! আবার যদি ঝগড়া করিস, তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না।"

তো IUPAC ১৯৯৭ সালের এই ঝগড়া থেকে শিক্ষা নিয়ে ২০০২ সালে নতুন মৌলের নামকরণ নিয়ে কিছু নিয়ম তৈরি করে।

১। IUPAC-এর সিদ্ধান্তানুযায়ী যারা আবিষ্কারক হিসেবে গণ্য হবে, তাদেরই অধিকার থাকবে কোনো একটা নাম সুপারিশ করার।

২। মৌলের নামকরণ করা হয় সাধারণত কোনো পৌরাণিক বিষয় বা চরিত্র, কোনো একটা জায়গা বা ভৌগোলিক অঞ্চল, মৌলটির কোনো একটা ধর্ম অথবা কোনো বিজ্ঞানীর নামের সাথে মিল রেখে। নামগুলোকে অনন্য হতে হবে এবং এর ঐতিহাসিক আর রাসায়নিক গুরুত্ব থাকতে হবে।

পৌরাণিক চরিত্রের উদাহরণে বলা যায় প্রোমিথিয়ামের (promethium) কথা। নামটা নেওয়া হয়েছে গ্রিক পুরাণের একটা চরিত্র (prometheus) থেকে। পুরাণমতে, এই লোক গডদের থেকে আগুন চুরি করে মানুষদের দিয়েছিলেন এবং এজন্য তাঁর ভয়াবহ শাস্তি হয়েছিল। নামটা দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে যে কৃত্রিম মৌল তৈরি করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

জায়গার নামে মৌলের নাম রাখা হলে সাধারণত জায়গার নামটা হয় মৌলটা যেখানে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে। সুইডিশ গ্রাম Ytterby-এর নামে চারটি মৌলের নাম রাখা হয়েছে। Ytterbium, Yttrium, Erbium ও Terbium.

আইনস্টেনিয়াম (einsteinium), হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত এই মৌলটির নাম রাখা হয় বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নামে।

৩। নামগুলোর শেষে 'ium' থাকতে হবে। (যদিও ২০৬৫ সালের সুপারিশ অনুযায়ী ১১৭তম ও ১১৮তম মৌলের শেষে যথাক্রমে ‘ine’ ও ‘on’ রাখা হয়েছে)

৪। কোনো একটা মৌলের আবিষ্কার যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে IUPAC-এর অ্যাপ্রুভালের আগে একে এর সংখ্যা অনুযায়ী নামে ডাকতে হবে। যেমন – ১১৮তম মৌল ওগানেসনের নাম আবিষ্কারের পূর্বে একে বলা হতো element 118.

৫। একেবারে ফাইনাল নামটা নির্ভর করছে IUPAC-এর অ্যাপ্রুভালের ওপর। IUPAC চাইলে আবিষ্কারকের সুপারিশ করা নাম বাতিল করে দিতে পারে।

৬। অ্যাপ্রুভ হওয়ার পূর্বে অনুমোদনহীন অবস্থায় একে যে নামে ডাকা হতো, সে নাম যদি অ্যাপ্রুভ না হয়, তাহলে সে নাম পরবর্তী আর কোনো মৌলের জন্য দেওয়া যাবে না।
তোমার আবিষ্কৃত মৌল বিনোদিয়ামের কথাই ধরো। তুমি নিজের খুশির জন্য এর নাম দিলে বিনোদিয়াম। কিন্তু IUPAC সে নাম নাকচ করে দিলো। তাহলে এরপরে আর যত মৌল আবিষ্কৃত হবে, তার কোনোটার নামই বিনোদিয়াম দেওয়া যাবে না।

নামকরণের ব্যাপারটা আসলে অতটা সহজ নয়। মৌলের আবিষ্কারকরা প্রথমে কোনো একটা নাম সুপারিশ করবে। এরপরে IUPAC যদি ঠিক মনে করে, তাহলে সেটা অ্যাপ্রুভ করবে। এরপরে পাঁচ মাসের একটি পাবলিক রিভিউ হবে। এরপরে ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হবে। অ্যাপ্রুভালের ঝামেলা মিটে গেলে ‘Pure and Applied Chemistry’ নামক একটা বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেই নামটা প্রকাশ করা হবে।

সুতরাং, বুঝতেই পারছ একটা মৌলের নামকরণ করতে গেলে অনেকগুলো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসতে হয়।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী, জায়গার নাম ও পৌরাণিক চরিত্রের নামে বিভিন্ন মৌলের নাম রাখা হলেও আজ পর্যন্ত কোনো মৌলের আবিষ্কারক নিজের নামে কোনো মৌলের নাম রাখেননি। এটা দিয়েই বোঝা যায়, প্রকৃত বিজ্ঞানীরা নিজেদের স্বার্থকে পাশে সরিয়ে রেখে দেশ ও দুনিয়ার জন্য কাজ করে যান।

রক্তদানে আত্নীয়দের নিষেধাজ্ঞা

মাহতাব মাহদী

কেন কেউ তার পরিবারের সদস্যদের থেকে রক্ত নিতে পারে না?

আসলে এটা একটা দারুণ প্রশ্ন। রক্তদান সম্পর্কে এটা অনেক জিজ্ঞাসিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। ছোটো করে উত্তর শুনতে হলে বলি — আপনজনের কাছ থেকে রক্ত নিলে transfusion-associated graft versus host disease (TA-GvHD) ছড়ানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রক্রিয়াটি একটু জটিল কিন্তু এটাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

যখন আপনি কোনো অপরিচিত যথেচ্ছ ডোনার থেকে এক প্যাকেট রক্ত নেন, তখন আসলে আপনি যা নেন তা হচ্ছে প্যাকেট ভর্তি লোহিত রক্তকণিকা। তখন প্লাজমা, শ্বেত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা সরিয়ে ফেলা হয় যতটা পারা যায়। একেবারে নিখুঁত করা যায় না, কিছু পরিমাণ লোহিত রক্তকণিকা আর প্লেইটলেট প্যাকেটে থেকেই যায়। এগুলো রক্তগৃহীতার জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যা মাঝে মাঝে জীবন বিপন্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঝুঁকিগুলোর একটা অংশ আসে ডোনারের শ্বেত রক্তকণিকা থেকে। নির্দিষ্ট করে বললে T-cells থেকে।

T-cell হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা সিস্টেমের বস। T-lymphocyte এর অপর নাম। এইটা দেহের লাস্ট লাইন ডিফেন্স সিস্টেম বা টি-সেল, সবচাইতে শক্তিশালী প্রতিরোধ সিস্টেম। এরা বোঝে কোন কোষটা আমাদের দেহের ভিতরের, আর কোনটা দেহের বাইরের। যখন আমাদের দেহের বাইরে থেকে রক্ত আসে, তখন ডোনারের

দেওয়া রক্তে থাকা T-cellগুলো রোগীর দেহে এসে তার দেহের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে, কারণ সেটা তো তার চেনা না।

এখন দেখেন, আপনার অর্ধে একটা অ্যাটাকার ঢুকে গেছে। ডিফেন্ডার হিসেবে আপনি যদি তাকে না আটকান কী হবে? ফাঁকতালে গোল দিয়ে আসবে। ঠিক এভাবেই যখন ডোনারের রক্ত থেকে আসা T-cell গুলোকে না আটকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আপনার দেহের T-cell গুলোকে ধ্বংস করে দেবে। এটাকে 'Graft versus host effect' বলা হয়। এখানে graft হচ্ছে ডোনারের দেওয়া রক্ত, আর host হচ্ছে রোগী। যখন রক্ত সঞ্চালনের সময় এটা হয় তখন এটাকে আর এই নামে না ডেকে transfusion-associated graft versus host disease (TA-GvHD) নামে ডাকা হয়।

এর ফলে যেটা হতে পারে, আমাদের দেহের ডিফেন্সে ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে যেমন কেমোথেরাপি বা অন্য কোনো চিকিৎসা বা রোগ থাকলে রক্ত নেওয়া ভেজাল হবে, কারণ তখন ডিফেন্স সিস্টেম এমনিতেই দুর্বল থাকে। আর ডোনারের রক্তের টি-সেল এই সুযোগটা কাজে লাগায়। একবার ডোনারের টি লিম্ফোসাইট জিতে গেলে খেল খতম। TA-GvHD-তে ভুগতে হবে। কোনো সেকেন্ড লেগ মানে রিকভারের অপশন নেই।

এখন দেখেন, যিনি রক্ত নিবেন, তারও দেহে তো T-cell আছে এবং তার দেহে T-cell এর সংখ্যা ডোনারের রক্তের সাথে আসা T-cell এর থেকে অনেক অনেক বেশি। সে তো আর অ্যাটাকারকে ফেলে রাখবে না! (ম্যাগুয়েরের টাইপ ডিফেন্ডার না হইলে!) সে কী করবে? অ্যাটাকারকে তার ডিফেন্স দিয়ে ধরে অকার্যকর করে ফেলবে।

একটা সাধারণ প্রশ্ন, মাঠে ২২ টা প্লেয়ার থাকে, ২ ভাগে ভাগ করে কী দিয়ে? জার্সি দিয়ে? এখন মনে করেন আপনার অ্যাটাকার আপনার হাফে আপনার জার্সি নিয়ে ঘুরছে। আপনি কি তাকে অ্যাটাকার ভাববেন? অবশ্যই না!

এটা হবে যখন আমরা ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভের কাছ থেকে রক্ত নেব! তাদের রক্তের আর আমাদের রক্তের গঠন তো প্রায় একই। ফলে আপনার ডিফেন্ডার, মানে আপনার দেহের T-cell বিপরীত পক্ষের অ্যাটাকার অর্থাৎ, ডোনারের T-cell কে চিনতে পারবে না। চিনতে না পারলে আটকানোর প্রশ্নই আসে? বিষয়টা এমন হবে আপনার দলের জার্সি পড়ে বিপক্ষ দলের অ্যাটাকার আপনার হাফে আর আপনার ডিফেন্ডার কিছু করার আগেই বিপক্ষ দলের গোল! অর্থাৎ (TA-GvHD) হয়ে যাবে!

তো কথা হচ্ছে আমরা কি এটা আটকাতে পারি না? অবশ্যই পারব! কেন না? দেখেন ঘটনার মূল কোথায়? ফুটবল মাঠে আপনার হাফে অ্যাটাকার না আসলে গোল হবে? তাই আমরা যে প্যাকেট থেকে রক্ত নিচ্ছি তা 25 Gy Gamma radiation দিয়ে দিলে আর ঝুঁকি থাকছে না।

এখন অনেকে বলবেন, আমরা তো পরিচিতজনের মধ্যে রক্ত দিই কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না। কেন হয় না? দেখেন, সবসময় তো এমন না যে আপনার ডিফেন্স ডোনারের টি-সেলকে চিনতে পারবে না! চিনবে কিন্তু কিছু মাঝে মাঝে মিস হওয়ার চান্স থাকে। আর ক্যান্সার বা এইডস বা দেহের প্রতিরক্ষা সিস্টেম দুর্বল থাকলে তো নিজেদের মধ্যে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। র‍্যান্ডম ডোনার থেকে নেওয়াই ভালো। তবে অবশ্যই ক্রস চেক করে নিতে হবে।

অনির্ণেয় আকার এবং অসীমের গল্প

ইসমাইল হোসেন রিফাত

প্রথমে একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। এক কৃষক তার দুই পুত্র রেখে মারা গেল। তার সকল সম্পত্তির সবই দুই পুত্রের সন্তুষ্টিতে সমান ভাগে ভাগ হলো। কিন্তু ঝামেলা বাঁধল একটা সোনার কুড়াল নিয়ে। দুই ভাই-ই দাবি করে সেটা তার। এ নিয়ে বিশাল ঝগড়া, দ্বন্দ্ব। পরে তারা গ্রামের মোড়লের কাছে বিচারের জন্য গেল। তখন মোড়ল দেখল, এদের দুজনকে একসাথে সন্তুষ্ট করা কোনোভাবেই সম্ভব না। তাই সে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত দিলো, এই কুড়োল কারোরই নয়। এটা জাদুঘরে রাখা হবে।

এবার আসি আসল কথায়। আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফ এবং টিউশন-এ টিচার লাইফে যেসব টপিকস-এ গিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, তার মধ্যে একটা হলো এই অনির্ণেয় আর অসীম নিয়ে। পোলাপান কোনোভাবেই মানতে চায় না, $0.\infty$ এর মান কখনোই বের করা সম্ভব না। এটার মান বের করতে গণিতবিদরা ব্যর্থ হয়েই বলে দিয়েছে, "না ভাই! আর সম্ভব না। এটার মানই হবে মান জানি না বা অনির্ণেয়।" তখনই পোলাপান তর্ক জুড়ে দেয়, "ইয়ে ব্রো! এটা তো সহজ হিসেব। ছোটোকাল থেকে পড়ে এসেছি শূন্য হচ্ছে একটা বিশাল রাক্ষস। এর সাথে যা-ই গুণ করা হোক না কেন, সে তাকে খেয়ে শূন্য বানিয়ে ফেলে। শূন্য এর সাথে পৃথিবী গুণ করে দিলেও শূন্য হবে।"

হ্যাঁ ভাই! অবশ্যই এটা ঠিক কথা। কিন্তু সকল ঠিক জিনিসের একটা সীমা আছে। আজ আমরা গল্প শুনব এই ঠিক জিনিসের সীমার বাইরের এক অসীম জগৎ নিয়ে।

অসীম:

আসলে এই অনির্ণেয় আকারটা ফিল করতে না পারার কারণ হচ্ছে এই হতচ্ছাড়া অসীম। 0, 1, 2, 3, 4, 100, 900, -700 এমন সব বাস্তব সংখ্যার এবং এদের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগকে সংক্ষেপে অপারেশন বলব এখন থেকে) আমরা ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ে আসছি। তাই 0.\infty এর মান প্রথম আমাদের মাথায় আসে শূন্য। ঠিক তেমনই 1^∞ এর মান প্রথম মাথায় আসে 1। কিন্তু অন্য দিকে অসীমের ধারণা প্রথম পাই

ইন্টারে এসে অথবা তার কিছু আগে। তাই এই ইনিফিনিটি আমাদের মনে এতটা জায়গা করে নিতে পারে না। কারণ এই মনে আগেই জায়গা দখল করে আছে বাস্তব সকল সংখ্যা এবং তাদের অপারেশন।
তাহলে ইনফিনিটি কী?

আসলে ইনিফিনিটির সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা হলো, 'Infinity is Infinity'।
একে আসলে কারও সাথে তুলনা করা সম্ভবই না। এটা এত বড়ো বা এত দূরের একটা জিনিস যা আমাদের জন্য কল্পনা করাও সম্ভব না। সবচেয়ে বড়ো যেই সংখ্যাটি তুমি চিন্তা করতে পার, তার থেকেও এটি অনেক বড়ো। আমার এই কথাটিও আসলে ভুল। ইনফিনিটিকে কারও সাথে তুলনা করাই সম্ভব না। এটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে মনে ফিল করা যেতে পারে। একটা হালকা তুলনা হতে পারে, বড়ো এক সাগরের সাথে। অনেক অনেক বড়ো একটা সাগর। যেখানে সামান্য পানি দিলে বা নিলে সাগরের পানির উচ্চতার কোনো পরিবর্তনই হয় না।

এবার আলোচনা করা যাক অসীমের কিছু অপারেশন নিয়ে। যারা নতুন তাদের একটু মানতে কষ্ট হলেও এটাই সত্যি।

১. অসীমকে কোনো সংখ্যা দিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করলে অসীমের কোনো পরিবর্তন হয় না।
কেন?
ওই যে বললাম, এটা সাগরের মতো। এখান থেকে কিছু নিলে বা দিলে কিছুই হয় না। আবার কোনো সংখ্যা থেকে অসীম বিয়োগ করলে রেজাল্ট ঋণাত্বক অসীম আসে।

২. কোনো সংখ্যাকে অসীম দিয়ে ভাগ করলে শূন্য হয়ে যায়?
চলো, অনুভব করি। ধরো, $\frac{1}{x}$একটা ফাংশন।
এখন x এর বিভিন্ন মান দিয়ে দেখি ফাংশন এর মান কত হয়!
x=1 হলে, ফাংশনের মান হবে 1।
x=100 হলে,, ফাংশনের মান হবে 0.01।
x=100,000 হলে, ফাংশনের মান হবে 0.00001।
খেয়াল করো, x এর মান যত বাড়ছে, ফাংশনের মান তত কমছে। তাহলে x যদি বাড়তে বাড়তে বাড়তে বাড়তে ইয়া বড়ো একটা জিনিস হয়ে যায় যা আমাদের কল্পনার বাইরে, তাহলে ফাংশনের মান কত হবে? ইয়েস! কমতে কমতে কমতে এত এত ছোটো হবে অর্থাৎ,ক শূন্য হয়ে যাবে।

৩. কোনো সংখ্যার ওপরে (-1 থেকে 1 পর্যন্ত ছাড়া) অসীম ঘাত দিলে রেজাল্ট অসীম আসে। এটাকেও আগের অপারেশন এর মতো চিন্তা করো। কিন্তু 1 এর থেকে ছোটো কোনো সংখ্যা হলে, এর ওপর পাওয়ার দেওয়া মানে রেজাল্ট আরও কমে যায়। পাওয়ার বাড়তে বাড়তে অসীম হলে, রেজাল্ট কমতে কমতে শূন্য হয়ে যায়।

৪. অসীমের ওপর কোনো পাওয়ার দিলে রেজাল্ট অসীম হয়।
কেন?
এই অসীম এমনিই কল্পনার বাইরের একটা জিনিস। একে পাওয়ার দিয়ে বড়ো করলে আর কিই-বা হবে! কল্পনার বাইরেই থাকবে।

এই চারটা অপারেশন মাথার ভিতর সেট করে নাও। মানতে কষ্ট হলে একটু রিল্যাক্স করে নাও। কারণ একটু পর আসতে চলছে একটা অপ্রিয় সত্য।

অসীমের জন্ম:
এই অসীম আসলে কই থেকে পাওয়া যায়? হ্যাঁ! কোনো সংখ্যাকে 0 দ্বারা ভাগ করলে অসীম পাওয়া যায়। এটাকেও এর আগের দুই নং অপারেশন এর মতো, 1/x একটা ফাংশন ধরে x এর মান আস্তে আস্তে কমিয়ে 0 এর কাছাকাছি নেও। দেখবে, x কমলে 1/x এর মান বাড়ছে। x এর মান কমতে কমতে কমতে শূন্য হয়ে গেলে 1/x এর মান বাড়তে বাড়তে বাড়তে অসীম হয়ে যাবে।

অনির্ণেয়র আগমন:
এই পার্ট হলো মেইন পার্ট। এই পার্ট পড়ে অনেকেই বলবা, ”My whole life was lie!”
অনেকেই ক্যালকুলাসে লিমিট করে এসেছ। এই লিমিট এর উৎপত্তিই আসলে অনির্ণেয় এর ধারণা থেকেই। সবচেয়ে কমন একটা লিমিট হলো,

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$$

খেয়াল করে দেখো, x এর মান যদি 3 হয়, তাহলে রাশিটির মান আসবে 0/0। ব্যাপারটাকে এখানেই রেখে দিলে হতো না? লিমিটের ঝামেলায় কেন এলাম? ঘটনা এখানেই। 0/0 হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে গনিতবিদ এবং স্টুডেন্টরা পরাজিত। এই জিনিসটা আসা মানেই, দৌড় খতম।
হ্যাঁ! this is indeterminate form!

চলো, এবার এই সকল অনির্ণেয় আকার নিয়ে আলোচনা করা যাক।
একটা গাণিতিক অপারেশনে একটি নির্দিষ্ট রেজাল্ট আসে। যদি এমন হয়, এই রেজাল্ট বিভিন্নভাবে চিন্তা করলে বিভিন্ন হচ্ছে তখন সেটি অনির্ণেয় আকার। অর্থাৎ, যার রেজাল্ট নিয়ে বন্ধুর সাথে তোমার কোপাকুপি-চাপাতি লাগার সম্ভাবনা আছে, সেটাই অনির্ণেয় আকার। যদি বলা হয়, 10/5= কত? আমরা এই ভাগ অপারেশনে সংখ্যা দুইটার দিকে খেয়াল করি। ওপরের ১০ বলছে আমাকে যদি ৫ ভাগ করা হয়, তাহলে রেজাল্ট ২ আসবে। আবার নিচের ৫ বলছে আমি যদি ১০ কে ভাগ করি, তাহলে ২ রেজাল্ট দেবো। এখানে তাদের দুজনের রেজাল্ট একই। কিন্তু অনির্ণেয় আকারের বেলায় এমনটা হবে না।

অনির্ণেয় আকার মোট ৭টি। এগুলোকে এখন আমরা ফিল করার চেষ্টা করব।

১. $0/0$
অনেকেই বলবা, “আরেব্বাই শূন্য শূন্য কাটা। এর মান তো ১।”
দেখতে খুব সুন্দর লাগলেও এটা একটা অনির্ণেয় আকার। কেন? খেয়াল করো, ওপরের শূন্য বলছে, “ভাইরে ভাই, কে তুমি? কতজনে আমাকে ভাগ করতে এলো, সবাইকে আমি শূন্য বানায় দিই।”
কিন্তু এই নিচের 0 বলছে, ”I am magician। আমি যাকেই ভাগ করি সে হয়ে যায় অসীম।”
প্রথমের সেই গল্পের মতো এই সমস্যা নিরসনে তাদের কাউকেই সন্তুষ্ট করতে না পেরে গণিতবিদরা বলল, “এটা একটা অনির্ণেয় আকার।”

আরেকটু ইজিলি চিন্তা করি:
$0 \times 0 = 0\ or, 0/0 = 0$
$0 \times 1 = 0\ or, 0/0 = 1$
$0 \times 2 = 0\ or, 0/0 = 2$

এভাবে 0/0 এর মান যে-কোনো সংখ্যা হতে পারে। এক হৃদয় আর কতজনকে দেবো রে ভাই! তোরাই থাক! আমি যাই। আমি অনির্ণেয় হয়ে গেলাম।

২. $\frac{\infty}{\infty}$
ওপরের অসীম বলছে, “আমি তো ভাই সাগরের মতো। আমাকে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ যাই দিস না কেন, আমি অক্ষয়।” নিচের অসীম বলছে, “ভাইরে ভাই! কে তুমি? আমি তো সবাইকে ভাগ করে শূন্য বানায়া দিচ্ছি।”
একইভাবে সমস্যার সমাধান হলো, সমস্যা নিয়ে চিন্তাই না করা। অর্থাৎ, অনির্ণেয় বলে দেওয়া।

এখানে একটা গল্প বলি। কয়েকদিন আগে কোন জানি এক দেশে কোনো করোনাভাইরাস এর রোগী নেই। সবাই তো অবাক! জনাব, সব দেশ যেখানে হিমশিম খাচ্ছে আর আপনার দেশে কোনো রোগীই নেই! কী যাদু করেছেন? তখন রাষ্ট্রপ্রধান উত্তর দিলো, “আসলে আমরা কোনো টেস্টই করাই না। রোগী আসবে কোথা থেকে?”
কী বুঝলাম? সমস্যা নিয়ে চিন্তা না করলে আসলে কোনো সমস্যাই থাকে না।

৩. $0 \times infinity$
এরপর থেকে একটু শর্টে বলি। কারণ টেকনিক তোমরা ক্র্যাক করে ফেলেছ।
0 বলছে, “আমার সাথে যাই গুণ কর না কেন আমি শূন্য রেজাল্ট দেবো।”
অন্য দিকে অসীম বলছে, “আমি অক্ষয়।”
অন্যভাবে,
$1/0 = infinity\ so, 0 \times infinity = 1$
$2/0 = infinity\ so, 0 \times infinity = 2$

এভাবে 0×infinity যে-কোনো সংখ্যাই হতে পারে।

৪. 1^{∞}

এটা নিয়ে এক ভাইয়ের সাথে বহুত তর্ক। সে কোনোভাবেই মানবে না। তোমরা মানো কি না মানো দেখা যাক!

বেজ ১ বলছে, "আমি তো ভাই একটা চিজ! আমার ওপর কেউ কর্তৃত্ব করতে পারে না। করতে চাইলে (পাওয়ার দিলে) তাকে আমার পথে (রেজাল্ট ১) আসতে হয়।"

কিন্তু এদিকে অসীম? আগেই বলেছিলাম, এ এক হতচ্ছাড়া। সে অক্ষয়। সে ঘাত হয়ে অসীম বানিয়েই ছাড়বে (অথবা শূন্য বানিয়ে ফেলবে)।

অন্যভাবে,

log1=0,

so

$$\frac{1}{\log 1} = \infty or, 1 = \log(1^{\infty})$$

or, $1^{\infty} = 10$

$$\frac{2}{\log 1} = \infty or, 2 = \log(1^{\infty})\ or, 1^{\infty} = 100$$

এভাবে 1^{∞} যে-কোনো সংখ্যা আসতে পারে।

৫. $\infty - \infty$

বামের অসীম বলে, "আমার থেকে যাই বিয়োগ করিস না কেন আমি অক্ষয়। অসীমই থাকব।" ডানের অসীম বলছে, "আমি বিয়োগ হয়ে গেলে রেজাল্ট ঋণাত্মক অসীম দিই।"

৬. 0^0

বেজ 0 বলে, "আমি বেজ থাকা মানে রেজাল্ট 0।"

কিন্তু ঘাত 0 বলছে, "আমি ঘাত মানে রেজাল্ট 1।"

৭. ∞^0

বেজ অসীম বলছে, "আমি তো সবকিছুকে অসীম বানিয়ে দিই। আমার ওপর পাওয়ার দিলেও অসীম।" কিন্তু ঘাত 0 বলছে, "আমি ঘাত মানে রেজাল্ট 1।"

কিছু ধারনা এবং ট্রুথ:

১. অসীম বা অসংজ্ঞায়িত এবং অনির্ণেয় এক নয়। অসীম বা অসংজ্ঞায়িত এর একটা দিশা থাকে। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কনভার্জ বা ডাইভার্জ হয়। কিন্তু অনির্ণেয় পুরোটাই দিশেহারা।

২. $Infinity + Infinity = Infinity$ (অনির্ণেয় না)। কারণ দুই অসীমই একটাই রেজাল্ট দিবে। এবং তা হলো 'অসীম'।

৩. $\lim_{x\to\infty} 1^x = 1$ (অনির্ণেয় না)। কারণ, $x\ tends\ to\ Infinity$ মানে, x এর মান অসীমের নিকটবর্তী কিন্তু অসীম না। আর অসীম ছাড়া 1 এর ওপর যেই পাওয়ারই দেওয়া হোক না কেন রেজাল্ট 1।

৪. $\lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1$, কারণ x এক্স্যাক্ট শূন্য না, শূন্যের কাছাকাছি। আর শূন্য ছাড়া যে-কোনো সংখ্যার জন্য x কাটাকাটি গিয়ে 1,

একইভাবে আরও কিছু লিমিট বের করা যায় যারা আসলে এক্সিস্ট করে। অনির্ণেয় না।

L'Hospital's Rules:

মাঝে মাঝে এই হাসপাতালকে আমার চুমা দিতে ইচ্ছে করে। পুরো লিমিটের ম্যাথকে এই হাসপাতাল এতটাই ইজি করে দিছে! অনেকেই বলবা, "এই এল হপিটাল এখানে কই থেকে আসলো?"

আসলে L'Hopital তখনই apply করা যায়, যখন $x\ tends\ to\ a$ লিমিটের জন্য $f(a)/g(a)$এর মান দুইটি অনির্ণেয় আকার পাওয়া যায়। আর তারা হলো, 0/0 এবং $\frac{\infty}{\infty}$ এবং বাকি পাঁচটি অনির্ণেয় আকারকেও কোনো না কোনোভাবে এই দুইটি ফর্ম এ আনা যায়।

জিন রিপ্রোগ্রামিং ও দেহঘড়ির প্রতিবিম্ব

নোশিন সাইয়ারা রামিসা

দেহঘড়ির কাঁটা ক্রমাগত ঘুরছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে। শরীরের প্রতিটি কোষ এই ঘড়ির সময় মেনে চলে। পুরোনো কোষে একসময় নানা ত্রুটি দেখা দেয়। এই ঘড়ির কাঁটার গতি কি কমানো সম্ভব? কিংবা সম্ভব কাঁটাকে উলটো দিকে ঘোরানো?

জেরি মধ্যবয়স্ক এক ইঁদুর। বার্ধক্যজনিত চোখের সমস্যা 'গ্লকোমা' দেখা দিয়েছে তার। লেন্স দিয়ে আলো প্রবেশ করে তার চোখের ভেতর রেটিনায় যে প্রতিবিম্ব তৈরি হতো, তা মস্তিষ্কে বহন করত অপটিক নার্ভ। সেই নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আর মস্তিষ্কে সংকেত দিতে পারছে না। তার ওপর রেটিনার গ্যাংলিয়ন কোষগুলোও বৃদ্ধ হয়ে গেছে, আর ঠিকমতো কাজ করে না। জেরির ভীষণ দুঃখ হয় সুস্থ স্বাভাবিক চোখে ঝকঝকে পৃথিবীটা মন ভরে দেখতে না পারায়...

বার্ধক্যে জেরির এরূপ চক্ষু সমস্যার কারণ কী? এক্ষেত্রে এপিজেনেটিক্সের সামান্য আলোচনা আবশ্যক।

আমাদের শরীরে প্রতিটি কোষে ডিএনএ-তে যেসব জিনোম আছে, সেগুলো আমাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই জিনোমগুলোর বিন্যাস সারাজীবন একই থাকে। তবুও আমাদের শরীরের গঠনে বয়সের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় কেন?

এখানে ভূমিকা রাখে এপিজিনোম। এপিজিনোম হচ্ছে ডিএনএ-তে থাকা প্রোটিনযুক্ত রাসায়নিক যৌগ যা জিনের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে, কোনো জিনকে প্রকাশে বাধা দেয়।
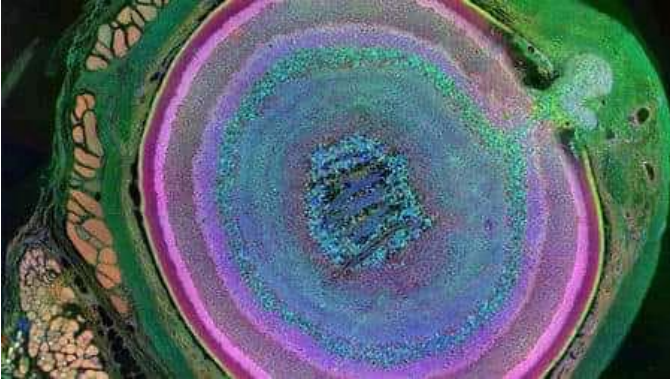
কোষে DNA-এর সাথে থাকে এক প্রকার কার্বন যৌগ মিথাইল গ্রুপ। জিনকে প্রকাশ হতে হলে বা জ্বলে উঠতে হলে তার সুইচ অন করার ব্যবস্থা করতে হবে। মিথাইল গ্রুপটি যে জিনের সাথে যুক্ত হয়, সেই জিন প্রকাশ হতে পারে না। সেই জিনের জ্বলে ওঠার সুইচ অফ হয়ে যায়। একেক সময় মিথাইল গ্রুপ একেক জিনের সাথে যুক্ত হতে থাকে।

একারণে সব কোষে একই জেনেটিক সিক্যুয়েন্স থাকার পরও চোখের কোষ, জিহ্বার কোষ ও ত্বকের কোষে পার্থক্য দেখা যায়।
এছাড়াও DNA অণুটি যে হিস্টোন প্রোটিনে প্যাঁচানো থাকে, তা ঢিলেঢালা না কি জোরালো প্যাঁচ, সেটিও বিবেচ্য বিষয়। ঢিলেঢালা প্যাঁচ হলে বেশি সংখ্যক জিন তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে। এই মিথাইলেশন আর হিস্টোন প্যাটার্ন এপিজেনেটিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।
শিশু প্রাণীর এপিজেনেটিক বৈশিষ্ট্য বয়স বৃদ্ধির সাথে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। জীবের জৈবিক ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে থাকে, পরিবর্তন বাড়তে থাকে। পূর্বে নবীন কোষ যেভাবে কাজ করত, নিজের ক্ষতি সারিয়ে নিতে পারত – বয়স্ক কোষে তা দেখা যায় না।
ডিএনএ মিথাইলেশনের প্রাথমিক প্যাটার্ন হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কোষের কিছু দরকারি জিনের প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ও দৃষ্টির সমস্যা দেখা দেয়।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের জিনতত্ত্ববিদ ডেভিড সিনক্লেয়ার। তাঁর বক্তব্য: যদি বার্ধক্যের চালিকাশক্তি হয় এপিজেনেটিক পরিবর্তন, আমরা কি এপিজিনোমকে পুরোনো রূপে নিয়ে যেতে পারব? অর্থাৎ, রিসেট করতে পারব?

এপিজিনোমকে প্রাথমিক চেহারায় নিতে পারলে এপিজেনেটিক পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট অসুস্থতা দূর করা সম্ভব হবে। নবীন কোষে যেভাবে জিন নিয়ন্ত্রিত হতো, তেমনইভাবে জিন নিয়ন্ত্রিত হবে এবং কোষ তার পুরোনো কর্মক্ষমতা ফিরে পাবে।

এপিজিনোমকে প্রাথমিক চেহারায় নিয়ে যেতে হলে চারটি জিন ব্যবহার করা হয়। জিন চারটি হলো Oct4, sox2, klf4 এবং c-myc। এগুলোকে একত্রে ইয়ামানাকা ফ্যাক্টরস (Yamanaka factors) বলে। এগুলো জিনকে প্রকাশের বেলায় সুইচ অন-অফ করার মাধ্যমে একটা পুরোনো কোষকে স্টেম কোষে রূপান্তর করে এবং এভাবে জেনেটিক রিপ্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে স্টেম কোষ থেকে এপিজেনেটিক পরির্বতনগুলো সরিয়ে নবীন সতেজ কোষ উৎপন্ন করা যায়।

যাহোক, জেরি মাউসের সমস্যাটা কিন্তু বিজ্ঞানীদের নজর এড়ায়নি। হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা অপটিক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত এমন ইঁদুরের চোখে অক্ষতিকর ভাইরাসের মাধ্যমে তিনটি জিন ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করান। জিন তিনটি হলো Oct4,

Sox2,এবং Klf4। এই পরীক্ষাটির সাফল্য যে একদম নিশ্চিত ছিল তা নয়। কোনো ভুলের কারণে জিনে এক্সট্রা কপি থাকলে বা জিন এক্সপ্রেশন বেশি হলে টিউমার হবার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা জিনের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নিলেন। 'ইয়ামানাকা ফ্যাক্টরস' এর চতুর্থ জিন c-myc এখানে ব্যবহার করলেন না।

প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর দেখা গেল, রেটিনাল গ্যাংলিয়ন কোষ সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমান চিকিৎসাগুলো ড্রপ, সার্জারি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষতির মাত্রা কিছুটা কমাতে পারত, কিন্তু পূর্বের সেই দৃষ্টিশক্তি কখনো ফিরিয়ে আনতে পারত না। 'জিন রিপ্রোগ্রামিং'-এর এই গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায়, ক্ষতিগ্রস্ত রেটিনাল গ্যাংলিয়ন কোষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নতুন অ্যাক্সন গড়ে উঠতে উদ্দীপনা তৈরি করা সম্ভব।

মধ্যবয়স্ক একটি ইঁদুর বয়সের কারণে তার ৯৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। জিন রিপ্রোগ্রামিং প্রক্রিয়ায় চার সপ্তাহ অতিবাহিত করার পর তার ওপর পরীক্ষা চালানো হলো। ইঁদুরটি এবার ৫ মাস বয়সী ইঁদুরের মতোই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল।

ব্যাপারটা এমন যেন কোষের ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে ঘুরে তার সেই তারুণ্যের সময়ে চলে গেছে। জেনেটিক প্রোগ্রামিং দেহঘড়ির সামনে আয়না দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফলে প্রতিবিম্বে মনে হচ্ছে ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে ঘুরছে, বার্ধক্য হতে তারুণ্যে পদার্পণ ঘটছে।

বাবার সাথে কসমিক ডাস্ট

আবু সালেহ্ মহিবুল্লাহ্

– বাবা, কোলে নাও।
– আসো।
– আচ্ছা বাবা, আকাশে দিগন্তের কাছে ওই উজ্জ্বল জিনিসটা কী?
– কোনটা?
– আরে ওই যে।
– ওহ ওটা! ওটাকে বলে জোডিয়াক্যাল লাইট (Zodiacal Light)।
– সেটা কী?
– জানতে চাও? আচ্ছা, কসমিক ডাস্ট (Cosmic Dust) এর নাম শুনেছ?
– ডাস্ট? ডাস্ট মানে তো ধুলা। ক্লাসে পড়েছি।
– আচ্ছা, তাহলে একটা গল্প শুনো।
– গল্প! বলো, বলো।
– অনেক-অনেক দিন আগেকার কথা!
– কতদিন আগে বাবা?
– উম... তা প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছর আগে। তখনও মহাবিশ্বের জন্ম হয়নি। একসময় একটি বিন্দু থেকে জন্ম হলো আমাদের মহাবিশ্বের।
– একটি বিন্দু থেকে! কীভাবে সম্ভব?
– হ্যাঁ, বিজ্ঞানীগণ এমনটাই ধারণা করেন। আসলে সেই বিন্দু ছিল খুবই ঘন এবং ভারী। এখন মহাবিশ্বে যত উপাদান আছে তার সবই ওই বিন্দুতে কমপ্রেসড ছিল। একসময় সেই বিন্দু প্রসারিত হতে শুরু করল। সেই বিন্দু থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ধুলোবালি এবং গ্যাস। একে বলা হয় বিগ ব্যাং। সময়ের সাথে মহাকর্ষের টানে ধূলিকণাগুলো একত্রিত হয়ে গঠিত হলো গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ।

কিন্তু ধুলোর সবটা এই মহাবিশ্বের গঠনে ব্যবহৃত হয়নি। কিছু আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ে, যা এখনও মহাবিশ্বে সবজায়গায় ছড়িয়ে আছে। এই ধুলোকে বলে কসমিক ডাস্ট।
– আচ্ছা! তারপর?
– কার্বন, আয়রন, অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়ামের মতো উপাদান যেগুলো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের চেয়ে ভারী, সেগুলোই মহাকাশে ঘুরছে। সাথে আছে বিভিন্ন গ্যাস। সূর্যোদয়ের আগে কিংবা সূর্যাস্তের পরে সূর্যের আলো এই কসমিক ডাস্টে বিকিরিত হয়। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দিগন্তের কাছের একটা অংশ। একেই বলে জোডিয়াক্যাল লাইট।
– এই ধুলো কি এমনই থাকবে?
– না, এই ধুলো মহাকর্ষের টানে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রে পতিত হয়। পৃথিবীর ওপর প্রতিদিন প্রায় ৬০ টন কসমিক ডাস্ট পতিত হয়। আবার মহাকাশের নক্ষত্রগুলোর জ্বালানি একসময় শেষ হয়ে যায়। তখন মহাকর্ষের টানে সংকুচিত হয়ে পরবর্তীতে বিস্ফোরিত হয়। এতে করে মহাকাশে আবার কসমিক ডাস্ট ছড়িয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে আবার নতুন নক্ষত্র তৈরি করে।
– বাবা, আমরাও কি এই কসমিক ডাস্টে তৈরি?
– হ্যাঁ, আমাদের দেহের বেশিরভাগ উপাদান কসমিক ডাস্ট থেকে এসেছে। চলো, আমরা এবার ঘরে ফিরি। এতক্ষণে বিদ্যুৎ চলে এসেছে মনে হয়।
– আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাই। তুমি আমাকে মহাকাশ নিয়ে আরও কিছু বলো।

পিতা তার সন্তানের একের পর এক কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। সন্তান অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে রহস্যে ঘেরা বিশাল ওই মহাকাশের দিকে।

ছবি– Amazing Sky Photography (Edited a bit)।

লাল দানব

গোলাম মোরশেদ ইফতি

আমরা এটা জানি যে, নক্ষত্রের মাঝে প্রতিনিয়ত নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া চলতে থাকে। এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম, লিথিয়াম, অক্সিজেন, কার্বন এভাবে ক্রমেই ভারী ধাতু গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। নক্ষত্রের তাপমাত্রা যখন ২০-৩০ লক্ষ কেলভিন হয়, তখন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। হাইড্রোজেন ভেঙে প্রোটন আর ইলেকট্রনের স্যুপ তৈরি হয়। এটা পদার্থের প্লাজমা অবস্থা। প্রোটন আর ইলেকট্রন মিলিত হয়ে নিউট্রন ও নিউট্রিনো সৃষ্টি হয়।

$p + e^{-} \longrightarrow n + v$

অতঃপর দুটি প্রোটন আর দুটি ইলেকট্রন মিলে গঠিত হয় হিলিয়াম। এই হিলিয়াম পরমাণুর ভর হাইড্রোজেনের চেয়ে কম হয়। বাকি ভরটুকু তাপ ও আলোক শক্তি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে কেন্দ্রমুখী চাপ আর নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার কারণে কেন্দ্রবিমুখী চাপ সৃষ্টি হয়। এই ভারসাম্য রক্ষা করলে নক্ষত্র সাম্যাবস্থায় আসে। এরা প্রধান ধারার তারা (main sequence star)। কিন্তু একসময় নক্ষত্রের কেন্দ্রের হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে যায়, তৈরি করে হিলিয়াম। তখন নিউক্লিয়ার ফিউশন চাপের চেয়ে কেন্দ্রমুখী মাধ্যাকর্ষণ চাপ বৃদ্ধি পায় , কেন্দ্র ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যায় এবং তাপ ও চাপ বৃদ্ধির ফলে হিলিয়াম থেকে তৈরি হয় কার্বন ও অক্সিজেন। একে হিলিয়াম ফ্ল্যাশ বলে। তখন ব্যাপক কেন্দ্রবিমুখী চাপ সৃষ্টি হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে আটকে রাখে সংকুচিত না হতে। এই ধারাবাহিক মৌল তৈরির ক্রিয়া একসময় বন্ধ হয়ে যায়, যখন ভারী মৌল (লোহা, কোবাল্ট) তৈরি হয়।

নক্ষত্রের কেন্দ্র তখন প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে সংকুচিত হতে শুরু করে, আর বাহিরের লেয়ারে থাকা হাইড্রোজেন ঠান্ডা ও সম্প্রসারিত হয়। তখন তা লাল দেখায়। একে 'লাল দানব' বলে। আমাদের সূর্যও ৭০০ কোটি বছর পর এরকম লাল দানব তারায় (red giant star) পরিণত হবে।

ক্রপ সার্কেল

তাজউদ্দিন আহমদ

শরতের শুভ্র সকাল। ঘুরতে বেরিয়েছেন আপনি। ফুরফুরে বাতাস, ক্ষেতের আল ধরে আপনি সকালের মনোমুগ্ধকর পরিবেশে গুনগুন করে গাইতে গাইতে হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ আপনার চোখে পড়ল কে যেন ধানক্ষেতের ফসলগুলোকে মুচড়ে অদ্ভুতুড়ে সব নকশা করে রেখেছে।

বিচিত্র সেসব নকশা। বৃত্তাকার, ত্রিভুজাকার, চতুর্ভূজাকার, পিরামিডাকার, ডিম্বাকার আরও কত কী!

কোনো কোনো নকশা এত পারফেক্ট শেইপে করা যে, দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। অবাক হলেন আপনি। কে করেছে এসব? ভূত? এলিয়েন? কোনো উচ্চ মাত্রার জীব?

যাক, এসব ভেবে লাভ নেই। আমি আমার নতুন ইউটিউব ভিডিয়োর কন্টেন্ট পেয়ে গেছি। এখন মনগড়া কাহিনি বানিয়ে লোকের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হলো। মিলিয়ন ভিউ কামিয়ে নেওয়া সময়ের ব্যাপার।

মুচকি হেসে বাড়ির পথ ধরলেন আপনি।

ক্রপ সার্কেল রহস্যের সূত্রপাতটা কিছুটা এমনই। ক্ষেতে বানানো অদ্ভুত সব নকশা, তার সাথে এলিয়েনের সংযোগ জুড়ে দিয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের এক মহা ধাপ্পাবাজি।
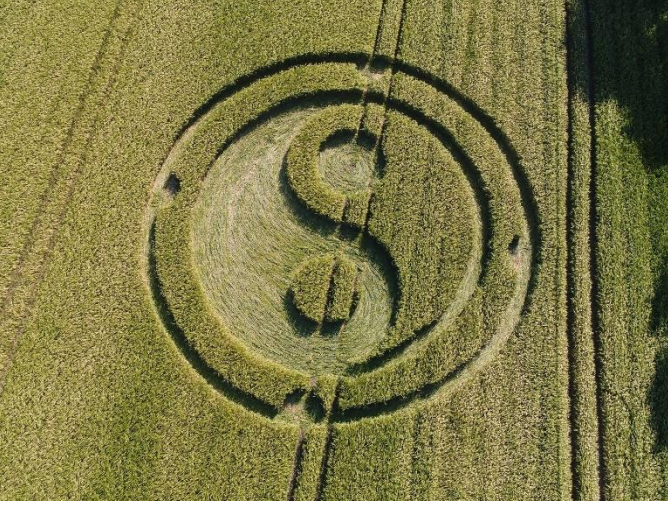
চলুন, এর ইতিহাসটা জেনে নিই।

১৬৭৮ সালে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের এক পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। মাটির ওপর অদ্ভুত কিছু নকশার।

কেউ কেউ দাবি করেন, এটিই পৃথিবীর প্রথম ক্রপ সার্কেল ছিল। পরে এই বিষয়টা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে জানা যায় যে, এটা আসলে মাটির ওপর কিছু প্রাচীন নকশা ছিল। তাই ক্রপ সার্কেলের ব্যাপারটি উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বহুদিন সেটা চাপা পড়ে থাকে।

আধুনিক ক্রপ সার্কেল রহস্যের শুরু আশির দশক থেকে। ইংল্যান্ডে হঠাৎ এই ক্রপ সার্কেলগুলোর উদয় হয়।

১৯৮০-৯০ সালের দিকে ইংল্যান্ডের উইটশায়ারের গ্রামগুলোতে বিভিন্ন ফসলের ক্ষেতে ক্রপ সার্কেল দেখা যেতে থাকে। বিচিত্র নিখুঁত জ্যামিতিক আকৃতিতে তৈরি নানা ধরনের নকশা। ক্রপ সার্কেলগুলো এত বড়ো ছিল যে, বিমান থেকেও সেগুলো দেখা যেত। মুখরোচক সংবাদ তৈরির বিষয়বস্তু পাওয়া গিয়েছে যেন। এরিয়া ৫৬, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মতো এলিয়েন সম্পর্কিত যেসব গুজব রটানো হয়েছে, তার মতো করেই এই ক্রপ সার্কেলগুলোকেও এলিয়েনের তৈরি বলে চালানো হয়। চারদিকে এগুলোর কথা ছড়িয়ে যায়। হোক্সাররা তাদের কারসাজি দেখায়।

উৎসুক লোকেরা ভিড় জমায় নানা আকৃতির ক্রপ সার্কেলগুলো দেখার জন্য। কিন্তু রহস্যের কূলকিনারার ব্যাপারে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই।

অনেক হাইপোথিসিস চলে আসে। এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল বিয়িং, এলিয়েনস, হায়ার ডাইমেনশনাল বিয়িংস, গ্লোবাল সাইকিক পাওয়ার ভুগিচুগি। মানুষ না কি এসব সার্কেল তৈরি করতে পারে না। কিছু লোক স্ব-উদ্যোগে ক্রপ সার্কেল বানানোর চেষ্টা করে প্রমাণ করতে চান যে, এগুলো মানুষের দ্বারাই বানানো। তাঁদের চেষ্টা জলে যায়। ধাপ্পাবাজি চলতেই থাকে। কারণ তখন এগুলোর পেছনে আসলে কে দায়ী তা জানা যায়নি।

১৯৯১ সালে এসে জানা যায় আসল কাহিনি। দুজন আর্টিস্ট রড ডিকিনসন এবং জন লুন্ডবার্গ স্বীকার করে নেন তারা এসব ক্রপ সার্কেল বানাচ্ছিলেন এবং পরে আরও কিছু আর্টিস্ট যেমন: উইল রাসেল ও রব ইরভিং এ ধরনের ক্রপ সার্কেল বানানোর কথা স্বীকার করেন।

পরে আরও অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা এসব কাণ্ড করছিল। কান্ট্রিসাইডগুলোতে রাতে ফসলের ক্ষেতগুলো নির্জন থাকত। অত রাতে কে-ই বা ক্ষেতে যাবে বলুন?

গ্রাম হওয়ায় সেখানে নজরদারিও তেমন ছিল না। এই সুযোগ এসব কীর্তি করে বেড়াচ্ছিল কিছু লোক।

তারা রশি, পাইপ, শাবল, তক্তা ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে এমনভাবে ফসল মুচড়ে ও ভেঙে সার্কেলগুলো বানাত, যেগুলোর অনেকগুলোতে কাঁচি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ত না। কেউ তাদের আর্ট প্র্যাকটিসের অংশ হিসেবে এসব বানাচ্ছিল। আবার কেউ ক্রপ সার্কেলের এসব কাহিনি শুনে ধাপ্পাবাজি চালু রাখার জন্য নিজেরাই এসব ক্রপ সার্কেল বানানো শুরু করে, যাতে লোকেরা মনে করে এসব জায়গায় এলিয়েন এর যান (UFO) অবতরণ করেছে। কিছু লোককে শাস্তির আওতায়ও আনা হয়। ক্রপ সার্কেলের রহস্য উদঘাটিত হয়।

এরপর মানুষের কাছে এটি আর অন্য যে-কোনো স্বাভাবিক বিষয়ের মতোই মনে হয়। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় ক্রপ সার্কেল তৈরি করার প্রতিযোগিতা পর্যন্ত আয়োজন করা হয়। ২৯৯২ সালে ৩০০০ ইউরোর প্রাইজমানি জিতে নেন উইটশায়ার হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ার্সের একটি দল। তারা পিভিসি পাইপ, তক্তা, মই ও দড়ি ব্যবহার করে এসব সার্কেল তৈরি করেন যা কাঁচি দিয়ে কেটে তৈরি করা হয়নি। ওই প্রতিযোগিতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এসব ইমপ্রেসিভ ক্রপ সার্কেল মানুষের দ্বারা সহজেই তৈরি করা সম্ভব।

২০০২ সালে ডিসকভারি এমআইটি স্টুডেন্টদের দ্বারা তৈরিকৃত ক্রপ সার্কেলের ডকুমেন্টারি প্রকাশ করে।
'দ্যা গার্ডিয়ান' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় নানা সময় এ স্টোরির আসল কাহিনি লেখা হয়। এই মিস্ট্রি তো পৃথিবীবাসীর কাছে সলভড হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু মহামান্য গুজব রচনাকারী, বিজ্ঞানকে ভুল প্রমাণকারী, এলিয়েন গবেষক ইউটিউবারদের কাছে এগুলো আজও যেন রহস্য। মানুষের কাছে এগুলোকে এলিয়েনের কারসাজি হিসেবে উপস্থাপন করে চোখে ঠুলি পড়িয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। কামিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ ভিউ। আজও দেশের অনেক লোকই জানে, ক্রপ সার্কেল এলিয়েনের তৈরি। এসব মানুষের কর্ম নয়, হতেই পারে না।
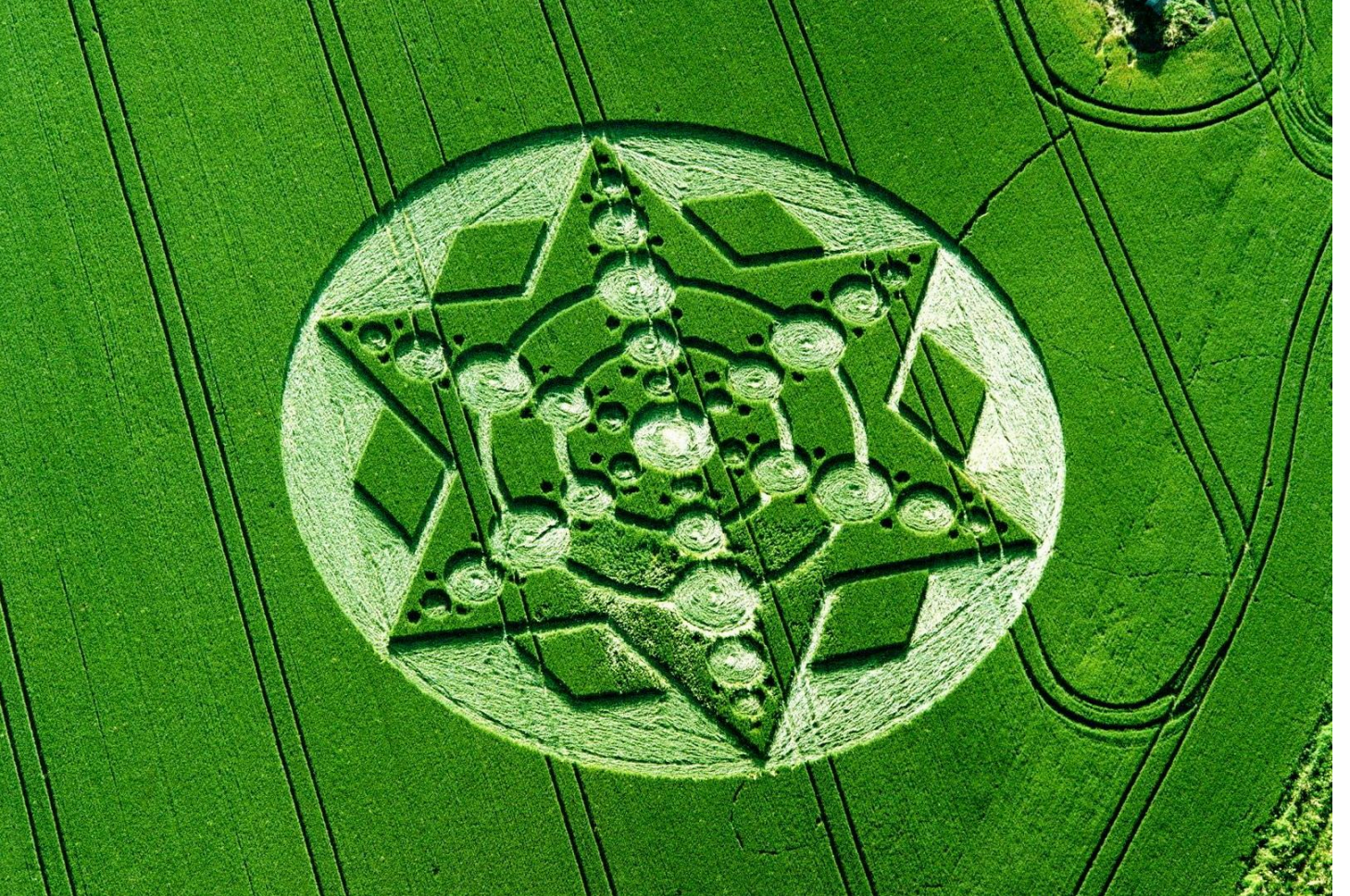
ছায়াপথের গল্প

তাজউদ্দিন আহমদ

বিশাল এই মহাবিশ্বের পৃথিবী নামক এক ক্ষুদ্র গ্রহের বাসিন্দা আমরা। মাথার ওপর তাকালে দেখতে পাই বিশাল মহাকাশ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে এই অসীম মহাকাশের শুরু, দূর থেকে দূরে তাকালে এর কোনো সীমানা খুঁজে পাই না আমরা। বেশিরভাগ অংশই নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা। এর মাঝে আছে ছোটো ছোটো কুপির মতো জ্বলে থাকা কিছু নক্ষত্র, যাদেরকে ঘিরে ঘুরে চলেছে কিছু গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু। এই বিশাল বস্তুপুঞ্জের সমষ্টি নিয়ে গঠিত গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ।

ইংরেজি গ্যালাক্সি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ 'Galaxias' থেকে যার অর্থ — রাস্তা বা পথ।

অর্থাৎ, গ্যালাক্সি হলো নক্ষত্রের সমন্বয়ে তৈরি বিশাল আলোকিত রাস্তা।

মহাকাশের বিভিন্ন জায়গায় বিশাল দূরত্বব্যাপী মহাকাশীয় বস্তুসমূহ গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূলিকণা, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসসমূহ ও প্রচুর পরিমাণ অদৃশ্য হাইপোথিটিক্যাল ডার্ক ম্যাটার তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি অবস্থানে থেকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাকে আমরা বলি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ।

আমরাও এমন একটি ছায়াপথেরই অংশ যা পরিচিত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নামে।

ধারণা করা হয়, আজ হতে প্রায় ১৩.৬ বিলিয়ন বছর আগে গ্যালাক্সি তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল। বিগব্যাং-এর ফলে সৃষ্ট পদার্থসমৃদ্ধ শিশু মহাবিশ্ব প্রথম দিকে অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অস্থিতিশীল ছিল। ক্রমে এই বস্তুপুঞ্জ শীতল হতে শুরু করল এবং একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে শুরু করে তৈরি হয় জায়ান্ট মলিকিউলার ক্লাউড ও ইন্টারস্টেলার ডাস্ট বা ধূলিকণার ভাণ্ডার। এই ক্লাউডগুলোর অভ্যন্তরে কিছু জায়গায় গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জের ঘনত্ব অত্যধিক বেশি। এদের আমরা চিনি নীহারিকা বা নেবুলা নামে। নীহারিকাগুলোই প্রথমে নক্ষত্রের জন্ম দিয়েছিল। নক্ষত্রগুলো নিজেদের নিয়ে বিভিন্ন আকৃতিতে গঠন করে বিশাল পরিবার।

এ পরিবারকে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। একটি গ্যালাক্সি কয়েক আলোকবর্ষ থেকে প্রায় কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

গ্যালাক্সির বেশিরভাগ নক্ষত্রের উৎপত্তি ঘটেছে নীহারিকা থেকে।

নীহারিকাগুলো প্রতিনিয়ত তারাদের জন্ম দেয়। নীহারিকার কিছু অঞ্চল, যেখানে গ্যাসের ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি তা আপন মহাকর্ষের প্রভাবে সংকুচিত হতে থাকে, জন্ম হতে থাকে নতুন নতুন নক্ষত্রের।

নক্ষত্রগুলো নিজেদের নিয়ে গঠন করতে থাকে গ্যালাক্সি। অনেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে তারাগুলো অত্যধিক ঘনত্বে থাকে। তদের সংঘর্ষে তৈরি হয় দৈত্যাকৃতি কৃষ্ণগহ্বর বা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল। ব্ল্যাক হোলগুলো একাধিক মাঝারি বা ছোটো ব্ল্যাক হোলের সমন্বয়েও তৈরি হতে পারে। যেসব গ্যালাক্সিতে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল সৃষ্টি হয়, সে গ্যালাক্সির তারাগুলো তাদের সৌরজগৎগুলোকে নিয়ে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলকে ঘিরে পরিভ্রমণ শুরু করে। এভাবে একটি সুশৃঙ্খল নক্ষত্রব্যবস্থা বা গ্যালাক্সি গঠিত হয়।

সমগ্র মহাবিশ্বে প্রায় ১০০ বিলিয়ন বা তারও বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে। এদের মধ্যে আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্নতা রয়েছে যার ভিত্তিতে গ্যালাক্সিগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্যালাক্সির শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যাকে বলা হয় হাবল সিকুয়েন্স। হাবল সিকুয়েন্সে গ্যালাক্সিগুলোকে আকৃতির ওপর নির্ভর করে প্রধান কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

স্পাইরাল গ্যালাক্সি বা সর্পিলাকার ছায়াপথ:
সাধারণভাবে গ্যালাক্সি শব্দটা শুনলে আমাদের চোখে স্পাইরাল গ্যালাক্সির চিত্রই ফুটে উঠে। কারণ গ্যালাক্সির উদারহণ হিসেবে আমরা স্পাইরাল গ্যালাক্সির ছবি দেখেই অভ্যস্ত।

এ গ্যালাক্সিগুলোর আকার কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো। গ্যালাক্টিক সেন্টার হতে স্পাইরাল আর্মগুলো বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারিদিকে রোটেটিং স্টারের একটি ডিস্ক থাকে। একে বলা হয় হ্যালো। স্পাইরাল গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল। গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে স্টার ডেনসিটি অনেক বেশি থাকে। এই অংশকে বলা হয় বাল্জ বা স্ফীত অংশ। স্পাইরাল আর্মগুলো বাকি সব অংশের চাইতে তুলনামূলক উজ্জ্বল দেখায়। কারণ এখানে রয়েছে নতুন নতুন নক্ষত্র। আর্মগুলোতে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস ও ধূলিকণা থাকে। এর ফলে স্পাইরাল আর্মগুলো প্রতিনিয়ত নতুন নতুন নক্ষত্র তৈরি করে।

আমরা যে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে বাস করছি এটিও একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি। এর ব্যাস প্রায় ১,০৫,৭০০ আলোকবর্ষ। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রায় ১০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র

রয়েছে। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে রয়েছে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল – স্যাজিটেরিয়াস-এ, যার ব্যাস প্রায় ৪৪ মিলিয়ন কিলোমিটার। মিল্কিওয়ের প্রধান চারটি স্পাইরাল আর্ম হলো সিগন্যাস, স্যাজিটেরিয়াস, স্কোটাম ক্রাক্স এবং পারসিয়াস আর্ম।

আমাদের সৌরজগৎটি গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে ২৫,০০০ আলোকবর্ষ দূরে একটি ছোট্ট স্পাইরাল আর্মে অবস্থিত, যার নাম অরিয়ন স্পার।

আমাদের প্রতিবেশী স্পাইরাল গ্যালাক্সি হলো অ্যান্ড্রোমিডা বা M31। এটি অত্যন্ত বৃহৎ এবং এর ব্যাস প্রায় ২,২০,০০০ আলোকবর্ষ! এর প্রায় ৬০০ ট্রিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে।

প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন বছর পরে মিল্কিওয়ে ও অ্যান্ড্রোমিডা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। তৈরি হবে মিল্কোমিডা নামের একটি ইলিপটিক্যাল বা উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি।

ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি বা উপবৃত্তাকার ছায়াপথ:
বেশিরভাগ ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সিই গঠিত হয়েছে দুটি স্পাইরাল গ্যালাক্সির সংঘর্ষের ফলে। তাই এদের আকৃতি বিশাল হয়। গ্যালাক্সিগুলোর আকৃতি ডিম্বাকার বা ফুটবলের মতো হয়।

বড়ো ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল – যাকে ঘিরে নক্ষত্রসমূহ পরিভ্রমণ করতে থাকে। উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সির কোনো বাহু থাকে না। বরং নক্ষত্রগুলো মিলে উপবৃত্তাকার বাল্ব বা স্ফীত অংশ তৈরি করে থাকে। ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সির বেশিরভাগ নক্ষত্রই পুরোনো হয়, যার ফলে একে নিষ্প্রভ দেখায়। অর্থাৎ, স্পাইরাল গ্যালাক্সির চেয়ে এদের উজ্জ্বলতা কম হয়ে থাকে। গ্যালাক্সিগুলোতে ইন্টারস্টেলার ম্যাটার (গ্যাস, ধূলিকণা) খুব কম থাকে বলে নতুন নক্ষত্র তেমনভাবে তৈরি হয় না। ফলে তারাগুলো পুরানো হতে থাকে ও গ্যালাক্সির উজ্জ্বলতা কমে যায়। মহাবিশ্বের বড়ো বড়ো গ্যালাক্সিগুলোর বেশিরভাগই উপবৃত্তাকার। এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড়ো গ্যালাক্সি – IC 1101 একটি সুপারজায়ান্ট ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি যার ব্যাস প্রায় ৩৬,৯৬,৩৯০ আলোকবর্ষ।
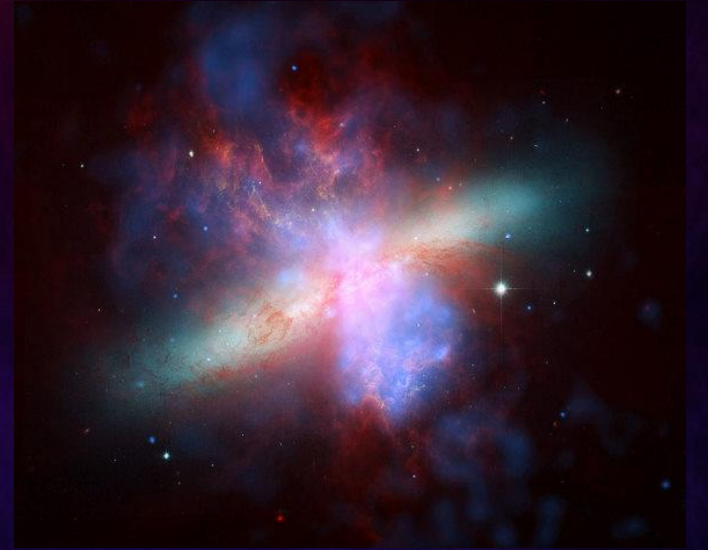
ইরেগুলার গ্যালাক্সি বা অনিয়তাকার ছায়াপথ:
যেসব গ্যালাক্সিগুলো হাবল সিকুয়েন্সে পড়ে না, তাদের বলা হয় ইরেগুলার গ্যালাক্সি বা অনিয়তাকার ছায়াপথ। এসব গ্যালাক্সিগুলো অ্যাসিমেট্রিক আকৃতির। গ্যালাক্সিগুলোর কোনো পার্ফেক্ট শেইপ নেই। নক্ষত্রগুলো বিশৃঙ্খলভাবে থাকে, কোনো বাল্ব (স্ফীত অংশ) বা আর্ম (বাহু) গঠন করে না। ধারণা করা হয়, স্পাইরাল বা ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সির কিছু অংশ মহাকর্ষের প্রভাবে বেরিয়ে গিয়ে এই ধরনের গ্যালাক্সি গঠন করে। এজন্য বেশিরভাগ ইরেগুলার গ্যালাক্সিই বামন বা অনেক ছোটো গ্যালাক্সি। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী – ক্যানিস মেজর একটি বামন, অনিয়তাকার গ্যালাক্সি, যেটি মিল্কিওয়ের কেন্দ্র থেকে ৪২,০০০ আলোকবর্ষ ও সূর্য থেকে মাত্র ২৫,০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এর ব্যাস মাত্র ২৫ থেকে ২৬ আলোকবর্ষ।

লেন্টিকুলার গ্যালাক্সি বা মসুরাকার ছায়াপথ:
এদের অনেক ক্ষেত্রে ইরেগুলার শ্রেণির মধ্যেই ফেলা যায়, তবে অনেক জায়গায় এদের আলাদা একটি শ্রেণি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। লেন্টিকুলার গ্যালাক্সি একটি স্পাইরাল ও ইলিপটিক্যালের মাঝামাঝি আকৃতির গ্যালাক্সি।

এর কেন্দ্রে স্পাইরালের মতো স্ফীত অংশ থাকে, কিন্তু কোনো বাহু থাকে না। আবার এরা ইলিপটিক্যাল এর মতো অর্ধবৃত্তাকৃতিও নয়। অনেকটা লেন্স আকৃতির ডিস্কের মতো দেখতে। তাই একে ডিস্ক গ্যালাক্সিও বলা হয়। ধারণা করা হয় এরা স্পাইরাল থেকে কোনো গ্যালাক্সির আকর্ষণে এদের বাহুগুলো হারিয়ে এই আকৃতি পেয়েছে। এদের চ্যাপটা ডিস্কগুলোতে অধিক পুরোনো নক্ষত্রগুলো থাকে এবং ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সির মতোই কম ইন্টারস্টেলার ম্যাটার থাকায় নতুন নতুন নক্ষত্র তৈরি করতে পারে না। ফলে এরাও কম উজ্জ্বল হয়। এরা আকৃতিতে তুলনামূলক ছোটো হয়। NGC 5866 একটি সুপরিচিত লেন্টিকুলার গ্যালাক্সি, যার ব্যাস মাত্র ৬০,০০০ আলোকবর্ষ।

এই ছিল ছায়াপথের কেচ্ছাকথন।

গ্যালাক্সিদের জীবন থেমে নেই।

একসাথে সমাবেশ সৃষ্টি করে অনেকগুলো গ্যালাক্সি মিলে তৈরি হয় গ্যালাক্সি ক্লাস্টার। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও ভার্গো সুপারক্লাস্টারের একটি লোকাল গ্রুপের অন্তর্গত একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি।

গ্যালাক্সিরা থেমে থাকে না, একে অপরকে আকর্ষণ করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গ্যালাক্সিদের মিলনে তৈরি হয় নতুন নতুন বিশালাকৃতির গ্যালাক্সি। আবার কোনো কোনো গ্যালাক্সি তাদের চেয়ে ছোট গ্যালাক্সিকে নিজের দিকে টেনে নেয়। কেউবা অন্য গ্যালাক্সি থেকে কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।

এভাবেই চলতে থাকে গ্যালাক্সিদের খেলা — রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে যাদের সৌন্দর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হই, উপলব্ধি করি মহাবিশ্বের বিশালতা।
এখন পর্যন্ত অসংখ্য গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হয়েছে। যতই জেনেছি, ততই অবাক হয়েছি। কত বিশাল এই মহাবিশ্ব! অথচ এখনও অনেক গ্যালাক্সিই আবিষ্কৃত হওয়া বাকি আছে – প্রতিনিয়ত হচ্ছে। আমরা যতই মহাবিশ্বকে জানব, ততই আমাদের ক্ষুদ্রতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সমগ্র মহাবিশ্বের তুলনায় গ্যালাক্সি একটি ক্ষুদ্র উপাদান, আমাদেরকে নিজেদের সীমা বুঝিয়ে দেবার জন্য।

মহাবিশ্ব মাপার ফিতে

এ.আর মুবিন

আপনি নিশ্চয়ই সিলেট থেকে ঢাকার দূরত্বটা ইঞ্চিতে মাপতে চাইবেন না। এই দূরত্ব মাপতে হলে আপনাকে কিলোমিটার বা মাইলে মাপতে হবে। কারণ পরিসর যত বেশি তার পরিমাপের একক তত বড়ো হতে হবে, তবেই মাপতে সুবিধে।

জ্যোতির্বিদ্যার পরিসর আমাদের চেনা-জানা পরিবেশ থেকে অনেক অনেক বড়ো। তাই এখানে সময় ও দূরত্বের বিশাল বিশাল একক ব্যবহার করা হয়।

কিলোমিটার বা মাইলে নয়, এখানে দূরত্বের পরিমাপ হয় আরও বড়ো এককে। এমন কয়েকটি এককের সাথে আজ আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই:

আলোর গতিবেগ হচ্ছে সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এই বিপুল গতিবেগ নিয়ে আলো ১ বছরে যতটুকু দূরত্ব পাড়ি দেয় সেটাকেই ১ আলোকবর্ষ বলে। কথা হচ্ছে আলো ১ বছরে ঠিক কতটা পথ পাড়ি দেয়? হিসেব করে দেখা গেছে আলো এক বছরে পাড়ি দেয় 9×10^{12} কিলোমিটার বা নয় মিলিয়ন মিলিয়ন কিলোমিটার! এভাবে বললে অনেকেরই মাথায় ঢুকবে না, তাই একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝাই:

• পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার। তো, আলোকে পৃথিবীর চারপাশে চক্কর দিতে বললে সে ১ সেকেন্ডের মধ্যেই সাতবারের বেশি পৃথিবীকে চক্কর দিয়ে আসবে!

• পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব প্রায় ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার কিলোমিটার। তার মানে আলো পৃথিবী থেকে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে পৌঁছুতে দেড় সেকেন্ডও লাগবে না!

• পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। আলো এই দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় নিবে মাত্র ৮ থেকে সাড়ে ৮ মিনিট!

• সৌরজগতের দূরতম গ্রহ প্লুটো হচ্ছে একটি বামন গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৫৯০ কোটি কিলোমিটার। কিন্তু এই অভাবনীয় দূরত্বও পাড়ি দিতে আলোর লাগবে মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা!

• সূর্য থেকে প্লুটোর যে দূরত্ব, সেই দূরত্বকে ১,৬০০ বার গুণ করলে যে বিশাল রাস্তা তৈরি হবে, সেই রাস্তাকেই এক আলোকবর্ষের দূরত্ব বলা যায়। আলোর এই দূরত্ব পাড়ি দিতে ১ বছর সময় লাগবে। এবার হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছেন ১ আলোকবর্ষ মানে ঠিক কতটা দূরত্ব?

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের সৌরজগতের ভেতর দূরত্বের হিসেব কষার ক্ষেত্রে আলোকবর্ষের এককটা ঠিক খাটে না; এর জন্য আলোকবর্ষের চাইতে ছোটো এককের দরকার। ঠিক এই কারণে শুধু সৌরজগতের ভেতর দূরত্ব পরিমাপের জন্য আরেকটা একক আছে। সেটাকে বলে 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট'। সংক্ষেপে—AU।
পৃথিবী থেকে সূর্যের যে দূরত্বসেই দূরত্বকে ১ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট ধরা হয়। সেই হিসেবে সূর্য থেকে সৌরজগতের সর্বশেষ গ্রহ প্লুটোর দূরত্ব সাড়ে ৩৯ অ্যাস্টোনমিক্যাল ইউনিট এবং প্রায় ৬০ হাজার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটে হয় ১ আলোকবর্ষ।

জ্যোতির্বিদরা প্রায়শই আলোকবর্ষের বদলে আরেকটি একক ব্যবহার করেন যাকে 'পারসেক' বলা হয়। ১ পারসেক মানে ৩.২৬ আলোকবর্ষ। পারসেকের হিসেবটা কীভাবে আসে সংক্ষেপে বলি:

চোখের সামনে একটা আঙুল ধরুন; এবার প্রথমে ডান চোখ বন্ধ করে বাম চোখ দিয়ে আঙুলটা দেখুন। তারপর আবার বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখ দিয়ে আঙুলটা দেখুন। কী ঘটছে সেটা নিজেই বুঝতে পারবেন। বাম চোখ বন্ধ করে তাকালে আঙুলটাকে একটু বামে সরতে দেখবেন। আবার ডান চোখ বন্ধ করে তাকালে আঙুলটাকে একটু ডানে সরতে দেখবেন। লক্ষ করবেন আঙুলটা চোখের কাছে নিয়ে এলে পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাপেক্ষে আঙুলের ডানে-বায়ে সরে যাওয়া বেড়ে যাচ্ছে এবং আঙুল দূরে নিলে সরে যাওয়াটাও কমে যাচ্ছে। এই ঘটনাকে বলা হয় প্যারালাক্স।

তো, এই পর্যবেক্ষণ থেকে কী কী বেরিয়ে আসে দেখি:

• চোখ দুটো আসলে আলাদা দুটো ভিউপয়েন্ট।

• একটা বস্তু ভিউপয়েন্টের যত কাছে আসবে ভিউপয়েন্ট পরিবর্তনের সাথে তার অবস্থান পরিবর্তন অর্থাৎ, কৌণিক বিচ্যুতিও তত বাড়বে। দূরে গেলে কমবে।

• দুটো ভিউপয়েন্টের (যেমন এক চোখ থেকে অন্য চোখের) মধ্যবর্তী দূরত্ব যত বেশি হবে, কৌণিক বিচ্যুতি ততই স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তাই নক্ষত্রের দূরত্ব বের করার সময় হিসেবের সুবিধার জন্য পৃথিবীকে একটি ভিউপয়েন্ট এবং সূর্যকে আরেকটি ভিউপয়েন্ট ধরা হয়।

• কোনো বস্তুর দূরত্ব জানতে হলে দুটো ভিউপয়েন্টের মধ্যকার দূরত্ব এবং দুটো ভিউপয়েন্ট থেকে ওই বস্তুতে যে কোণ উৎপন্ন হয় তার মাপ জানা থাকতে হবে। কোণ পরিমাপ করার যন্ত্রকে 'সেক্সট্যান্ট' বলে। এটা নিয়ে আরেকদিন লিখব।

• একটি নক্ষত্র বছরে ১ আর্কসেকেন্ড পরিমাণ কৌণিক বিচ্যুতি ঘটালে সেই নক্ষত্রটি ১ পারসেক বা ৩.২৬ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। বছরে ০.৫ আর্কসেকেন্ড পরিমাণ কৌণিক বিচ্যুতি ঘটলে ধরে নিতে হবে নক্ষত্রটি ২ পারসেক দূরে রয়েছে। নক্ষত্র যত দূরে থাকে, তার কৌণিক বিচ্যুতি তত কম হয়।

• ৩৬০ ডিগ্রি মিলে হয় একটি বৃত্ত। এবং ১ আর্কসেকেন্ড হলো ১ ডিগ্রির ৩৬০০ ভাগের মাত্র এক ভাগ। বোঝাই যাচ্ছে এটি খুবই ক্ষুদ্র একটি একক।

• প্যারালাক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে ৬৫০ আলোকবর্ষের মধ্যকার যে কোনো বস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করা যায়।

• ১ মিলিয়ন পারসেককে ১ মেগাপারসেক বলা হয়।

সূর্যের পর আমাদের সবচেয়ে কাছের স্টার সিস্টেম হলো আলফা সেন্টরাই। এর কৌণিক বিচ্যুতি হলো বছরে ০.৭৫ আর্কসেকেন্ড। তার মানে হচ্ছে আলফা সেন্টরাই আমাদের থেকে ১.৩৩ পারসেক বা ৪.৩৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

মৌল সৃষ্টির গল্প

পার্থিব রায়

১.

মেন্ডেলিফের মহান আবিষ্কার, পর্যায় সারণির দিকে তাকালেই এক অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করে। অবশ্য তার একটা কারণও আছে। খুব মজা লাগে যখন পর্যায় সারণি দেখে চট করে কোনো একটি মৌলের পরমাণুর গঠন, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি নিখুঁত একটা ধারণা পাওয়া যায়। পর্যায় সারণির ১১৮টি মৌলের কেবল একটি বিষয়ই সারণি থেকে পাওয়া যায় না। কী এদের সৃষ্টি রহস্য? গড়ে বলা হয়, ১১৮টি মৌলের মধ্যে ৯৪টি প্রাকৃতিক, বাকিগুলো আমাদের তৈরি অর্থাৎ মানবসৃষ্ট। কিন্তু সহজ কথায় মন কি ভরে? মনের মধ্যে জাগে নানান রকমের প্রশ্ন। কীভাবে এদের সৃষ্টি হলো? প্রকৃতিতে এদের উৎপত্তি কীভাবে? বিজ্ঞানীরাই বা কীভাবে বানালেন এদের?

আমাদের এই চিরপরিচিত বিশ্বজগতের সূচনা প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে। অসীম ঘনত্ব ও তাপসম্পন্ন একটি বিন্দুর প্রসারণের মাধ্যমে এই জগতের জন্ম। বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে যেমন এ জগতের জন্ম, তেমনি মৌল সৃষ্টির গল্পের জন্মও এই সময়। বিগ ব্যাং ঘটার ৩ মিনিট পর শুরু হয় এ কর্মযজ্ঞ, যা চলতে থাকে পরের ১৭ মিনিট অব্দি। এসময় প্রোটন ও নিউট্রন সমন্বয়ে মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি হতে থাকে। এই নিউক্লিয়াস গঠনের ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানীরা বলেন বিগ ব্যাং নিউক্লিয়োসিনথেসিস(Big Bang Nucleosynthesis)। এরপর রিকম্বিনেশনের সময়ে ইলেকট্রনকে সঙ্গী করে নিউক্লিয়াসগুলো। আর এভাবে তৈরি হয় আস্ত এক একটা পরমাণু। তবে পর্যায় সারণির সবকটা মৌল এসময় তৈরি হয়নি। ধারণা করা হয়, বড়োজোর ৫টি মৌল এসময় তৈরি হয়েছিল। এসময় যত মৌল তৈরি হয়েছিল তার প্রায় 75% হাইড্রোজেন, 24%হিলিয়াম আর বাকি 1% এ রয়েছে লিথিয়াম, বেরিলিয়াম ও বোরন। এর পরে কেটে যায় বহু বহু বছর। মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে হাইড্রোজেন গ্যাস ঘনীভূত হয়ে তারার জন্মের প্রস্তুতি চলতে থাকে। বিগ ব্যাং

ঘটবার প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর পরে প্রথমবারের মতো জ্বলে ওঠে আদিম তারাদের আলো। সাথে সাথে নতুন করে শুরু হয় মৌল তৈরির কর্মযজ্ঞ। এবার আর বিগ ব্যাং নয়, রাতের আকাশের তারাগুলো কিংবা দিনের আকাশের সূর্য শোনাবে মৌল সৃষ্টির গল্প।

২.

আকাশের তারা কিংবা দিনের সূর্য সবই নক্ষত্র। সাধারণভাবে নক্ষত্রদের ছোটো, মাঝারি আর বড়ো এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সব রকমের তারাই মৌল তৈরি করে, কিন্তু কারো ভূমিকা একটু বেশি, আবার কারো একটু কম।

ছোট্ট আর মাঝারি তারাদের থেকেই বরং শুরু করি (এ ক্যাটাগরিতে আমাদের সুয্যিমামাও শামিল)। এ তারাগুলো পর্যাপ্ত তাপমাত্রা পেলে এদের ভেতরে থাকা হাইড্রোজেনে ফিউশন শুরু করে। এর ফলে তৈরি হয় হিলিয়াম এবং শক্তি। এই তাপীয় শক্তি মহাকর্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যার ফলস্বরূপ তারাটি টিকে থাকে।
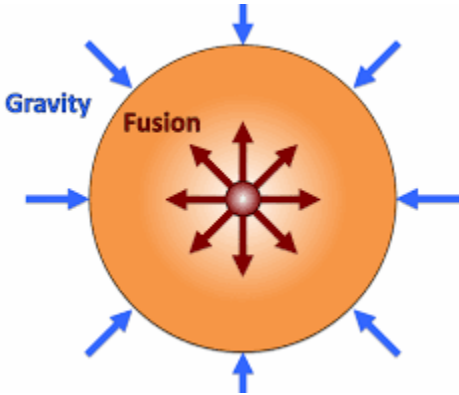
তারাদের জীবনের শুরু থেকেই তাদের নিজেদের তাপীয় চাপ আর মহাকর্ষের মধ্যে ভারসাম্য ধরে রাখার খেলা শুরু হয়! মহাকর্ষের পরিবর্তন হয় না, কিন্তু তাপীয় চাপ কমলেই শুরু হয় তারাদের মৃত্যুপথে যাত্রা।

বিলিয়ন বছর ধরে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একসময় কেন্দ্রের সব হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যায়, তখন তাপীয় চাপ আর মহাকর্ষের সাথে লড়াই করে পেরে ওঠে না। মহাকর্ষ বিজয়ীর বেশে পুরো নক্ষত্রটিকে সংকুচিত করতে শুরু করে। এই সংকোচন তারাটির ভেতরের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে এমন অবস্থায় নিয়ে যায়, যা হিলিয়ামকে ফিউজ করার উপযোগী। আর সত্যি সত্যিই হিলিয়ামের ফিউশন শুরু হয়, তাপীয় চাপ বেড়ে গিয়ে নক্ষত্রটির আকার স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এ অবস্থাকে বলে জায়ান্ট ফেইজ। একটা সময় হিলিয়ামও শেষ হয়ে যায়। নক্ষত্রের ভেতরে থাকে ফিউশন প্রোডাক্ট হিসেবে সৃষ্ট কার্বন আর অক্সিজেন। এ পর্যায়ে তারাদের বাইরের স্তর আস্তে আস্তে উড়ে যায় স্টেলার উইন্ডের মাধ্যমে আর এভাবেই তারাটির প্রায় ৫০% ভর নিয়ে তৈরি হয় প্ল্যানেটরি নেবুলা! আর তার ছোট্ট কেন্দ্র বাকি ৫০% ভর নিয়ে শ্বেত বামন হিসেবে জীবন কাটাতে থাকে। শ্বেত বামন আকারে খুব ছোটো কিন্তু তার ঘনত্ব যে বেশি তা বুঝতেই পারছেন। বিষয়টিকে আমাদের চারপাশের জগতের সাথে একবার তুলনা করা যাক। মনে করি, আমরা শ্বেত বামন তারার পৃষ্ঠ থেকে ১ চামচ পদার্থ নিয়ে আসলাম। এর ভর কীরূপ হতে পারে কেউ কি আন্দাজ করতে পারছেন? আশা করি সবাই জানেন, তারপরও যারা জানেন না তাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, এর ভর প্রায় একটি গাড়ির সমান হবে!

শ্বেত বামন তারারা সাধারণত নতুন মৌল তৈরি করে না। তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। বাইনারি স্টার সিস্টেমের কোনো তারা যদি শ্বেত বামনে পরিণত হয়, সেখানে কখনো কখনো একটি আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে তার মহাকর্ষ বল দিয়ে অন্য তারাটির কাছ থেকে পদার্থ কেড়ে নিতে থাকে। একপর্যায়ে এই লুণ্ঠিত পদার্থের পরিমাণ এত বেশি হয়ে যায় যে তারাটি আর তা ধরে রাখতে পারে না। শ্বেত বামন তারাটি সংকুচিত হতে শুরু করে আর একটি বিস্ফোরণ ঘটে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, তার মধ্যে সঞ্চিত সকল পদার্থ থাকে। এই বিস্ফোরণ হলো একধরনের সুপারনোভা, আরও বিস্তারিত বললে বলতে হবে টাইপ ওয়ান সুপারনোভা।

এবারে আসি বড়ো তারাদের কথায়। আমাদের সূর্যের চেয়ে কমপক্ষে ৮.৪গুণ ভারী তারাদের বলা হয় বড়ো নক্ষত্র। বড়ো তারাগুলোও তাদের জীবন শুরু করে হাইড্রোজেনকে ফিউজ করে হিলিয়াম তৈরির মাধ্যমে। এরাও জায়ান্ট ফেইজের মধ্য দিয়ে যায়, তবে আরও বড়ো রেড সুপার জায়ান্ট ফেইজ। এরা ছোটো কিংবা মাঝারি তারাদের মতো কার্বন-অক্সিজেন তৈরি করেই ক্ষান্ত হয় না, কার্বন আর অক্সিজেনেরও ফিউশন শুরু করে! কেন? ছোটো তারাদের ভর কম, মহাকর্ষ বলও তাই তুলনামূলকভাবে কম। এজন্য সে নক্ষত্রের ভেতরে কার্বন ফিউজ করার মতো তাপ-চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু বড়ো তারাগুলোর ভর যেমন বেশি,

তেমনি মহাকর্ষ বলও প্রচণ্ড। আর এই প্রচণ্ড মহাকর্ষ বল দিয়ে নিজেকে সংকুচিত করার চেষ্টা করে মারাত্মকভাবে, যা কার্বনের ফিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় চাপ আর তাপ সহজেই যোগান দিতে পারে। একটা জ্বালানি থেকে আরেকটি জ্বালানি তৈরির কাজ চলতেই থাকে, যতক্ষণ না লোহা তৈরি হয়। তবে মনে রাখা ভালো, জায়ান্ট ফেইজে নক্ষত্রের পুরোটা জুড়েই কিন্তু হিলিয়ামের ফিউশন, কার্বনের ফিউশন ঘটে না। নক্ষত্রের এক এক স্তরে তাপ আর চাপ এক এক রকম, ভেতর থেকে বাইরের দিকে ক্রমাগত কমতে থাকে। তাই এক এক স্তরে প্রয়োজনীয় তাপ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মৌলের ফিউশন ঘটে। বাইরের শেলে হাইড্রোজেন, ভেতরে হিলিয়াম এভাবে এগিয়ে যেতে যেতে সব শেষে কেন্দ্রে ঘটে সিলিকন থেকে লোহা তৈরির প্রক্রিয়া। ব্যাপারটাকে অনেকটা পেঁয়াজের স্তরগুলোর সাথে তুলনা করা যায়। বড়ো নক্ষত্রগুলোর মাঝে এভাবেই তৈরি হয় হিলিয়াম থেকে লোহা পর্যন্ত মৌলগুলোর নিউক্লিয়াস, তবে ফিউশনের সময় বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে কাছাকাছি পারমাণবিক সংখ্যাযুক্ত কিছু নিউক্লিয়াসও অল্প পরিমাণে তৈরি হয় (ছক ৬ এ দেখানো হয়েছে) ।
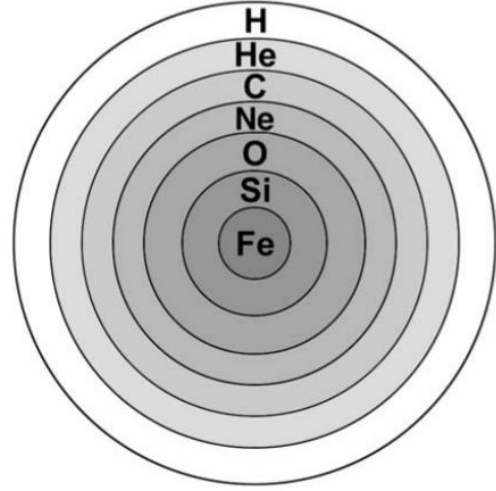
চিত্র: বড় তারাদের রেড সুপার জায়ান্ট ফেইজ চলাকালীন ওনিয়ন শেল মডেল।

Fuel	Main Product	Secondary Products	Temperature (billion kelvins)	Duration (years)
H	He	N	0.03	1×10^7
He	C, O	Ne	0.2	1×10^6
C	Ne, Mg	Na	0.8	1×10^3
Ne	O, Mg	Al, P	1.5	0.1
O	Si, S	Cl, Ar, K, Ca	2.0	2
Si	Fe	Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni	3.3	0.01

ছক৬: বড় তারাদের মাঝে চলা নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মৌল,বিক্রিয়া চলার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা এবং একটি জ্বালানির ফিউশন কতক্ষণ চলে তা ছকে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে ফিউশনই একমাত্র পথ নয়। ছোটো বড়ো সব তারকাই নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেসের মাধ্যমেও বিভিন্ন মৌল তৈরি করতে সক্ষম, এমনকি লোহা থেকেও ভারী মৌলও তারার মাঝে এভাবে তৈরি হতে পারে। নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেসটা আসলে কী সেটা আগে দেখে নেওয়া যাক। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা নিউট্রনকে ক্যাপচার করার অর্থাৎ ধরে ফেলার। হ্যাঁ, সহজ করে বলতে গেলে এটাই এই প্রক্রিয়ার মূল বিষয়! একটি নিউট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ঢুকে গিয়ে ওই মৌলের একটি আইসোটোপ তৈরি করে। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না মৌলটার আইসোটোপ অস্থিতিশীল হয়ে যায়। অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসের অতিরিক্ত নিউট্রনটি বিটা রেডিয়েশনের মাধ্যমে একটা ইলেকট্রন আর প্রোটনে রূপ নেয়। ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরতে থাকে আর প্রোটন থেকে যায় নিউক্লিয়াসে, যেমনটা তাদের থাকার কথা। এভাবে তৈরি হয় নতুন মৌল।

পুরো ব্যাপারটি খোলাসা করবার জন্য লোহার নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেসের মাধ্যমে নতুন মৌল তৈরির ব্যাপারটা দেখে নিই। $_{26}$Fe-56 পরমাণুটি একটি নিউট্রন ক্যাপচার করে পরিণত হয় Fe-57 আইসোটোপে। এভাবে একটা একটা করে নিউট্রন ক্যাপচার

প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় লোহার আরেক আইসোটোপ Fe-59। তবে এ আইসোটোপের নিউক্লিয়াস আবার অস্থিতিশীল। তার একটা নিউট্রন এসময় বিকিরণের মাধ্যমে ইলেকট্রন আর প্রোটনে রূপ নেয়। পরমাণুটির পারমাণবিক সংখ্যা এক ঘর বেড়ে যায়। তাই তখন সে আর লোহার পরমাণু থাকে না, সে হয়ে যায় কোবাল্ট। তারাদের জীবনকালে তাদেরই মাঝে লোহা থেকে ভারী

মৌলগুলো নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেসের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। তবে প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে নতুন মৌল বা এক আইসোটোপ থেকে আরেক আইসোটোপে পরিণত হতে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। যেমন Fe-56 থেকে Fe-57 হওয়ার পর আরেকটি নিউট্রন ক্যাপচার করে Fe-58 হওয়ার জন্য পরমাণুটাকে প্রায় হাজারখানেক বছর অপেক্ষা করতে হয়!

৩.

তারাদের জন্ম থেকে যেমন বিভিন্ন মৌল সৃষ্টি হয়, তেমনি তাদের মৃত্যুও নতুন মৌল সৃজনে অংশীদার। তবে এবার ফিউশনে মৌল তৈরি হয় না, পদ্ধতিটা কিছুটা ভিন্ন।

ছোটো আর মাঝারি নক্ষত্রদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। তাই এবার কথা হবে শুধুমাত্র বড়ো নক্ষত্রদের বিষয়ে। এজন্য আমরা ফিরে যাব তাদের কেন্দ্রে লোহা তৈরির কথায়। লোহার কিন্তু ফিউশন সম্ভব নয়। কারণ লোহার নিউক্লিয়াস এ জগতে সবচেয়ে স্থিতিশীল (তবে এর কিছু আইসোটোপের কথা আলাদা)। এখন প্রশ্ন হলো, নিউক্লিয়াস স্থিতিশীল হলে কেন ফিউশন হবে না? আসলে ফিউশনের মূলকথার মাঝে এর উত্তর লুকিয়ে আছে। ফিউশনে হালকা মৌলের নিউক্লিয়াস জুড়ে ভারী মৌল তৈরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসগুলো সবসময় একটা বেশি স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসে পরিণতি লাভ করতে চায়। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস হিলিয়ামের চেয়ে কম স্থিতিশীল, তাই হাইড্রোজেন ফিউজ হয়ে তৈরি হয় হিলিয়াম। হিলিয়ামের পর আরও স্থিতিশীল কার্বন, তাই হিলিয়ামের ফিউশনে তৈরি হয় কার্বন (এজন্য তারাদের মাঝে বেশি একটা লিথিয়াম, বেরিলিয়াম পাওয়া যায় না; তবে এরাও মাঝে মাঝে তৈরি হয় ফিউশনের মাধ্যমে)। কিন্তু লোহার চেয়ে ভারী মৌলগুলো লোহার নিউক্লিয়াসের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল নয়। তাই লোহার ফিউশন আর সম্ভব হয় না!
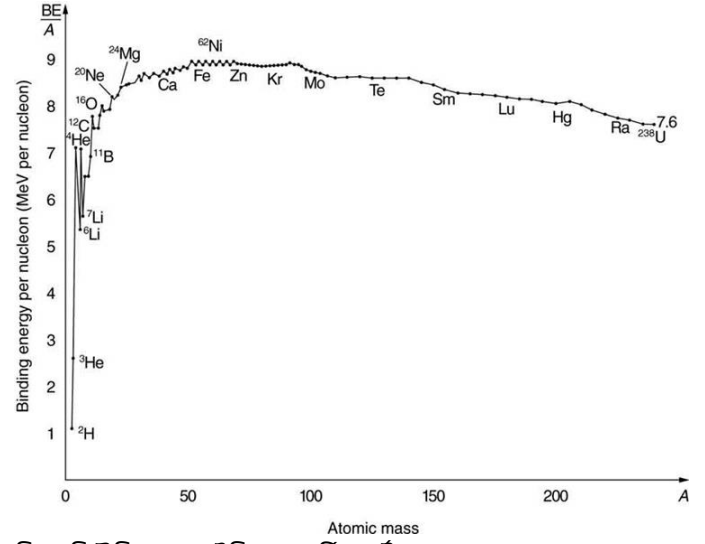
চিত্র: নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি চার্ট

বড়ো তারাদের কেন্দ্রে যখন সব মৌল লোহায় পরিণত হয়ে যায়, তখন আর লোহার ফিউশন হয় না, কমে যায় তাপীয় চাপ। তাপীয় চাপ আর মহাকর্ষের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, আবার জয় হয় মহাকর্ষের। আলোর প্রায় ২৫ শতাংশ গতিতে তারকাটি সংকুচিত হয়ে তার মৃত্যুপথে যাত্রা শুরু করে। এই সংকোচনের সময়ই চলে মৌল তৈরির খেলা! র‍্যাপিড নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি হয় আয়োডিন, জেনন, গোল্ড, ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়ামের মতো সব ভারী ভারী মৌল। তাও মুহূর্তের মধ্যে, কারণ এটা র‍্যাপিড নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেস। তারাদের জীবনকালে ঘটা সাধারণ নিউট্রন ক্যাপচার নয়। এবারে আর হাজার হাজার বছর অপেক্ষা করার কোনো বালাই নেই।

অন্যদিকে মহাকর্ষ তারাটির লৌহপূর্ণ কেন্দ্রের প্লাজমাকে এমন চাপ দেয় যে ইলেকট্রন-প্রোটন এক হয়ে নিউট্রন হয়ে যায়,যেটা মূলত হওয়ার কথা না। এভাবেই বড়ো তারাদের কেন্দ্র নিউট্রন স্টারের রূপ ধরে! তারাটির আউটার শেলগুলো যখন এই কেন্দ্রকে আঘাত করে তখন এই শক্তির বিপরীতমুখী প্রভাব তারাটির বাইরের স্তরকেই পুরো বিস্ফোরিত করে। আর আমরা দেখতে পাই সুপারনোভার মতো একটা ভয়ংকর সুন্দর ঘটনা। তবে বড়ো তারাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সুপারনোভাকে বলে টাইপ টু সুপারনোভা।

কিন্তু সকল বড়ো তারাই সুপারনোভার পর নিউট্রন স্টার রূপে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে না। আমাদের সূর্যের থেকে প্রায় ৩গুণ বা তার চেয়ে বেশি ভারী তারাদের মহাকর্ষ এত বেশি হয় যে, পুরো

কেন্দ্রটা পরিণত হয় অসীম ঘনত্বের একটা বিন্দুতে, যাকে বলে ব্ল্যাকহোল। বৈজ্ঞানিক মহলে শোনা যাচ্ছে যে, ব্ল্যাক হোলের অ্যাক্রেশন ডিস্কেও নিউক্লিওসিনথেসিসের মাধ্যমে ভারী মৌল তৈরি হতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনো আরও গবেষণা ও প্রমাণ প্রয়োজন।

৪.

চলুন এবার পাড়ি দিই কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি বাইনারি স্টার সিস্টেমে। তবে যে-কোনো বাইনারি স্টার সিস্টেমে গেলে হবে না, যেতে হবে এমন একটা স্টার সিস্টেমে যেখানে দুটি তারাই নিউট্রন স্টার! নিউট্রন স্টার দুটো ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করতে থাকে, তাদের কক্ষপথেরও পরিবর্তন হতে থাকে। একসময় তারা আঁছড়ে পড়ে একে অপরের ওপর! এই দুই তারার সংঘর্ষে একটি বিস্ফোরণ ঘটে, যাকে বলা হয় কিলোনোভা। সুপারনোভার পর তারাদের পুনর্জন্মের মতো ব্যাপার-স্যাপার কিলোনোভার ক্ষেত্রেও ঘটে কি না তা এখনো আমাদের কাছে অজানা। কিলোনোভায় তারাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, না কি ব্ল্যাকহোলের জন্ম হয় এসব নিয়ে আরও পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা প্রয়োজন। তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, তারা দুটির বিভিন্ন উপাদান ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে আর তৈরি হয় ভারী ভারী সব মৌল। কেমন করে? এটার রহস্য লুকিয়ে আছে নিউট্রন স্টারের আউটার শেল আর সেই র‍্যাপিড নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেসের কাছে। নিউট্রন স্টারের অধিকাংশই শুধু নিউট্রন দিয়ে তৈরি হলেও বাইরের শেল লোহার নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত। এখানে র‍্যাপিড নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেস চলতে থাকে কিলোনোভার সময়। এক একটি নিউক্লিয়াস অনেকগুলো নিউট্রন নিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে আর নিউক্লিয়াসের মাঝে এই অতিরিক্ত নিউট্রনের ইলেকট্রন ও প্রোটনে রূপান্তর সৃষ্টি করে নতুন নতুন মৌল। আর জন্ম নেয় ইউরেনিয়াম, সোনা, প্লাটিনামের মতো ভারী ভারী মৌল। এখন থেকে প্রায় ৬০০ বছর আগেই বিজ্ঞানীরা কিলোনোভা সম্পর্কে আন্দাজ করেছিলেন। তবে বছর তিনেক আগেও কিলোনোভায় মৌল তৈরি হয় কি না দূরে থাক, কিলোনোভার মতো ঘটনা ঘটে কি না তাই নিয়ে ব্যাপক সন্দেহ ছিল। কেউ কোনো প্রমাণ পাননি। কিন্তু এখন এর প্রমাণ মিলেছে। ২০৬৭ সালের ৬৭ই আগস্ট LIGO, VIRGO এবং আরও কয়েকটি অবজারভেটেরি প্রায় ৬৩ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে আসা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ GW170817 শনাক্ত করে। সাথে অবশ্য বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গেরও দেখা মেলে। বিচার-বিশ্লেষণ শেষে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হলেন এটি নিশ্চয়ই কোনো বাইনারি নিউট্রন স্টার সিস্টেমের দুটি নিউট্রন স্টারের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট কিলোনোভার শকওয়েভ। বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বিশ্লেষণ করে কিলোনোভার ৬ মিনিটের মাঝে স্ট্রনশিয়াম তৈরি হবার প্রমাণ পেয়েছেন। আর পরে পাওয়া গেছে আরও ভারী মৌলের সন্ধান, যা কিলোনোভায় মৌল সৃষ্টির বিষয়টির সত্যতার জানান দেয়।

৫.

এবারে আলোচনা হবে মৌল সৃজনে নিউক্লিয় বিকিরণের ভূমিকা নিয়ে। কিন্তু তার আগে নিউক্লিয় বিকিরণের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটু জেনে নিতে হবে। প্রকারভেদ বুঝতে পারলেই মৌল সৃষ্টির রহস্যটা বোঝা যাবে। নিউক্লিয় বিকিরণের রয়েছে তিনটি ধরন- আলফা, বিটা আর গামা বিকিরণ। প্রথমেই বলে রাখি গামা বিকিরণে সরাসরি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের তেমন একটা পরিবর্তন হয় না, শুধু বাড়তি শক্তি বেরিয়ে যায়। তবে আলফা আর বিটা বিকিরণ তেমন ধারার নয়।
সহজ করে বলতে আলফা বিকিরণে একটা নিউক্লিয়াস থেকে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস বেরিয়ে যায় আর পারমাণবিক সংখ্যা কমে দুই ঘর!

আর বিটা বিকিরণে নিউট্রন কিংবা প্রোটনের পরিবর্তন হয়। একটি নিউট্রন ভেঙে একটি করে প্রোটন, নিউট্রন এবং এন্টি-নিউট্রিনো বের হয়। অর্থাৎ পরমাণুর প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা বেড়ে যায় আর নতুন পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট একটি মৌল তৈরি হয়। আবার প্রোটন ভেঙে নিউট্রন, পজিট্রন আর নিউট্রিনো তৈরি হয়। পজিট্রন ইলেকট্রনের সাথে মিলে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রোটন সংখ্যা একঘর কমে যায়, আর নতুন একটা মৌল সৃষ্টি হয়।

ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়ামের মতো ভারী ভারী মৌল কিংবা হালকা মৌলের ভারী আইসোটোপগুলোর নিউক্লিয়াস সাধারণত অস্থিতিশীল হয়। এদের নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটে নতুন মৌল সৃষ্টি হয়। সময়ের আবর্তনে এসব মৌলের নিউক্লিয়াস নানা ধরনের বিকিরণ করতে করতে স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসযুক্ত মৌলে পরিণত হয়। তারপর বিকিরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়।

চিত্র: সময়ের আবর্তনে এভাবেই ইউরেনিয়াম-238 নিউক্লিয় বিকিরণের মাধ্যমে পরিণত হয় সীসায়।

৬.

কসমিক রে! নাম শুনেই মনে হচ্ছে এটা বুঝি কোনো এক ধরনের রশ্মি। আদতে তা সত্য নয়। তবে ভুল ভাবলেও সমস্যা নেই। কারণ ১৯২৯ সালে প্রথম যখন এদের শনাক্ত করা হয়, বিজ্ঞানীরাও এমন ভুল করেছিলেন। তারা কসমিক রশ্মিকে উচ্চ শক্তির ফোটন ভেবেছিলেন। পরে অবশ্য তারা বুঝতে পারেন এই রশ্মি কোনো ফোটন-মোটন না। কসমিক রে আসলে নিউক্লিয়াস, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন কিংবা আস্ত পরমাণু (কসমিক রে এর কেবল ১০% ইলেকট্রন), যাদের গতি প্রায় আলোর কাছাকাছি! এসব কণা প্রথমে তারার ভেতরে কিংবা তার আশেপাশে অবস্থান করত। কিন্তু সুপারনোভা কিংবা কিলোনোভার ফলে তৈরি হওয়া শকওয়েভ এদের আলোর কাছাকাছি গতি দেয়, যা এদের বানিয়ে দেয় কসমিক রে!

এখন প্রশ্ন হলো, আলোচনা হচ্ছিল মৌল সৃষ্টির ব্যাপারে, তার মাঝে কসমিক রে ঢুকে পড়ল কেন? কারণ মৌল সৃষ্টিতে এদেরও প্রভাব রয়েছে। তবে কসমিক রে এর মাধ্যমে মৌল সৃষ্টির ব্যাপারটা অনেকটা দুর্ঘটনাময়। মহাশূন্যে চলার পথে কসমিক রে যদি কোনো একটি পরমাণুতে আঘাত হানে, তখন কসমিক রশ্মিতে থাকা মৌল বা নিউক্লিয়াস দু টুকরা হয়ে যায় আর তৈরি হয় নতুন মৌল। তবে একথা প্রযোজ্য কেবল এমন কসমিক রে এর ক্ষেত্রে, যাতে থাকে শুধু নিউক্লিয়াস কিংবা পরমাণু। কিন্তু কসমিক রে যদি শুধু প্রোটন বা নিউট্রন দিয়ে গঠিত হয় আর সেটি যদি কোনো পরমাণুকে আঘাত করে সেক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন বা নিউট্রন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমেও নতুন মৌল বা আইসোটোপ তৈরি হতে পারে।

ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য নিচের উদাহরণ দুটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। প্রথমে কসমিক রে হিসেবে একটা কার্বন পরমাণুকে বিবেচনা করি। একটা কার্বন (কসমিক রে) যখন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করে তখন কার্বনের নিউক্লিয়াস ভেঙে তৈরি হয় হিলিয়াম, লিথিয়াম আর নিউট্রন। এবারে কসমিক রে হিসেবে চিন্তা করি একটি প্রোটনের কথা। মনে করি, সে আঘাত হানতে চলেছে পৃথিবীতে থাকা একটি কার্বন-14 পরমাণুকে। সে আঘাত হেনে একটি নিউট্রনকে যদি সরিয়ে ফেলে জায়গা দখল করতে পারে, তাহলেই হলো! পরমাণুটির পারমাণবিক সংখ্যা একঘর বেড়ে হবে 7। আর আমরা পাবো নাইট্রোজেন-14 এর পরমাণু! কসমিক রশ্মির মাধ্যমেই লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন ছাড়াও আরো অনেকগুলো মৌল সৃষ্টি হয়েছিল।

৭.

প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন ৯৪ টি মৌলের উৎপত্তি রহস্যের সমাধান তো হলো। এবার দেখতে হবে বাকি ২৪টি মৌল বিজ্ঞানীরা কেমন করে তৈরি করলেন। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, কৃত্রিম ভাবে মৌল তৈরির ইতিহাস কিন্তু খুব বেশি নতুন নয়, এখনো ১০০ বছরও হয়নি। ১৯৩৭ সালে টেকনিশিয়াম তৈরির মাধ্যমে শুরু হয় বিজ্ঞানীদের মৌল সৃষ্টির যাত্রা। সর্বশেষ ২০০২ সালে রাশিয়ার ডাবনায় তৈরি হয় ওগানেসন, যার পারমাণবিক সংখ্যা ১১৮। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন ল্যাবে চলছে মৌল তৈরির চেষ্টা, ওগানেসনের চেয়েও বেশি পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট পরমাণু তৈরির চেষ্টা! দেখা যাক ভবিষ্যতে আর কোনো পরমাণু তৈরি হয় কিনা! IUPAC অবশ্য ইতোমধ্যেই এদের জন্য সাময়িক কিছু নাম ঠিক করে রেখেছে। তবে Ununennium, Unbinilium নামগুলো আমার কাছে বেশ বিদঘুটে মনে হয়। হয়তো অনেকেরই একই অভিমত।

কৃত্রিম মৌল তৈরি করা হয় পার্টিকেল এক্সিলারেটর, নিউক্লিয়ার রিএক্টর কিংবা সাইক্লোট্রনে। এর মধ্যে দুটি পরমাণুকে এক করে নতুন মৌল তৈরির চেষ্টা করা হয়। তবে একটা জিনিস এখানে বুঝতে হবে যে, এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু ফিউশন কিংবা নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেস নয়, বোম্বার্ডিং বলা চলে! দুটো অ্যাটমকে প্রচণ্ড গতি দিয়ে একে অপরের সাথে অনেকটা ধাক্কা দিয়ে নতুন মৌল তৈরি করা হয়। তবে নতুন মৌলের সাথে কিছু মুক্ত নিউট্রনও তৈরি হয়।

আমরা এখন ওগানেসন তৈরির পদ্ধতি দেখব। ওগানেসন তৈরির ক্ষেত্রেই আমাদের চোখে পড়বে আরও বেশ কয়টি কৃত্রিম মৌল।

ওগানেসন তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় ক্যালিফোর্নিয়াম-249। কিন্তু এই ক্যালিফোর্নিয়াম তৈরি করা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। এজন্য প্রথমে আমরা নেব ইউরেনিয়াম-238। এটি একটি নিউট্রন ক্যাপচার করে (পার্টিকেল এক্সিলারেটরের ভেতরে) ইউরেনিয়াম-239 আইসোটোপে পরিণত হয় যা বিটা বিকিরণের মাধ্যমে রূপ নেয় নেপচুনিয়াম-239 এ। আর নেপচুনিয়াম বিকিরণ করে পরিণত হয় প্লুটোনিয়ামে। এ পর্যন্ত আসবার জন্য ইউরেনিয়ামের পক্ষে একটি নিউট্রন ক্যাপচার করাই যথেষ্ট। কিন্তু সবশেষে ক্যালিফোর্নিয়াম পেতে হলে এবার আর একটা দিয়ে কাজ হবে না। প্লুটোনিয়াম আর নিউট্রনের বোম্বার্ডিং এর সময় প্লুটোনিয়াম-239 কে এবার চার-চারটি নিউট্রন ক্যাপচার করতে হবে। তবেই সে পরিণত হবে প্লুটোনিয়াম-243 এ। এরপর আবার বিটা বিকিরণ আর নিউট্রন ক্যাপচারের মাধ্যমে আমরা আমেরিনিশিয়াম, কিউরিয়াম, বার্কেলিয়াম হয়ে পাবো কাঙ্খিত সেই ক্যালিফোর্নিয়াম-249।

$$^{238}_{92}U \xrightarrow{(n,\gamma)} {}^{239}_{92}U \xrightarrow{\beta} {}^{239}_{93}Np \xrightarrow{\beta} {}^{239}_{94}Pu \xrightarrow{4(n,\gamma)} {}^{243}_{94}Pu \xrightarrow{\beta} {}^{243}_{95}Am \xrightarrow{(n,\gamma)} {}^{244}_{95}Am \xrightarrow{\beta} {}^{244}_{96}Cm \xrightarrow{5(n,\gamma)} {}^{249}_{96}Cm \xrightarrow{\beta} {}^{249}_{97}Bk \xrightarrow{\beta} {}^{249}_{98}Cf$$
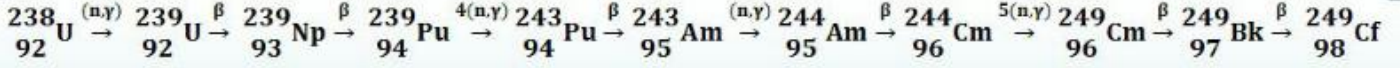
এখানে (n, γ) দিয়ে নিউট্রন ক্যাপচার প্রসেস ও β দিয়ে বিটা বিকিরণ বোঝানো হয়েছে।

ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে ক্যালিফোর্নিয়াম-২৪৯ তৈরির ধাপসমূহে সংগঠিত নিউক্লিয় বিক্রিয়া

পার্টিকেল এক্সিলারেটরে এই ক্যালিফোর্নিয়াম আর ক্যালসিয়াম আয়নের বোম্বার্ডিং এর মাধ্যমে পাওয়া যায় ওগানেসন।

$$^{249}_{96}Cf + {}^{48}_{20}Ca^{++} \rightarrow {}^{294}_{118}Og + 3n$$
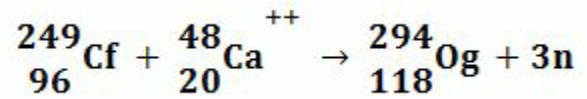
কিন্তু ওগানেসনের সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস রয়েছে বলে কী হয়েছে? তার নিউক্লিয়াস প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়, অর্ধায়ু মাত্র ০.৮৯ মিলিসেকেন্ড! সে আলফা বিকিরণের মাধ্যমে লিভারমোরিয়াম, ফ্লোরোভিয়াম, কোপারনিশিয়ামে রূপ নিতে নিতে একটা স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসের খোঁজ করতে থাকে।

$$^{294}_{118}Og \xrightarrow{\alpha} {}^{290}_{116}Lv \xrightarrow{\alpha} {}^{286}_{114}Fl \xrightarrow{\alpha} {}^{282}_{112}Cn \rightarrow$$ এর পর α(আলফা) বা β বিকিরণ হয়ে অন্য মৌলে পরিণত হয়
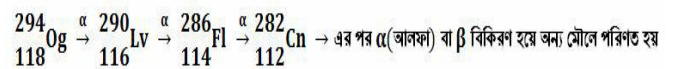
এবার আমরা দেখব সেই ১৯৩৭ সালে তৈরি প্রথম কৃত্রিমভাবে তৈরি মৌল টেকনিশিয়াম তৈরির পদ্ধতি। প্রথম টেকনিশিয়াম তৈরি করা হয়েছিল সাইক্লোট্রনে। মোলিবডেনাম আর নিউট্রনের বোম্বার্ডিং এর মাধ্যমে। মোলিবডেনাম-98 একটি নিউট্রন ক্যাপচার করে পরিণত হয় মোলিবডেনাম-99 আইসোটোপে, যা অতিরিক্ত নিউট্রনের বিটা রেডিয়েশনের মাধ্যমে রূপ নেয় টেকনিশিয়াম-99।

$$^{98}_{42}\text{Mo} \xrightarrow{(n,\gamma)} {}^{99}_{42}\text{Mo} \xrightarrow{\beta} {}^{99}_{43}\text{Tc}$$
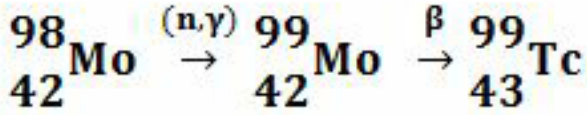
এ তো গেল টেকনিশিয়াম কৃত্রিমভাবে তৈরি করার কথা। তবে মনে রাখতে হবে যে, টেকনিশিয়াম হলো প্রাকৃতিক মৌল। অবশ্য টেকনিশিয়াম, নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম এদেরকে অনেকেই প্রাকৃতিক মৌল হিসেবে মর্যাদা না দিয়ে কৃত্রিম মৌলের মর্যাদা দিতেই ভালোবাসেন। তাদের যুক্তি এটি পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, ল্যাবে বানানো হয়, তাই কৃত্রিম মৌল। তবে একেবারে যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, তা নয়। পৃথিবীতেও খুব অল্প পরিমাণে এদের পাওয়া যায়, বিশেষ করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্রমণ্ডলে। আর পাওয়া যায় দূর আকাশের তারাদের মাঝে। কিন্তু প্রায়শই বিভিন্ন কাজে আমাদের এসব মৌল প্রয়োজন হয়। এখন তারাদের থেকেই বা এদের কীভাবে আনব? সেরকম দ্রুত ও উন্নত প্রযুক্তি যে এখনও আমাদের হাতে আসেনি। তাছাড়া পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলে গিয়ে সংগ্রহ করাও অসম্ভব। একারণে এদের ল্যাবে তৈরি করা হয়। তবে এসব মৌল কৃত্রিম না প্রাকৃতিক তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কারণ আলাদা। এদের প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়ার আগেই বিজ্ঞানীরা তৈরি করেন কৃত্রিমভাবে। এই ঘটনা প্রোএক্টিনিয়াম, এক্টিনিয়াম, ফ্রান্সিয়াম, এস্টেটিন, পোলোনিয়াম, প্রোমিথিয়াম এই ৬টি মৌলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য! এরাও অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক মৌলের বদলে শুধু কৃত্রিম মৌল হিসেবেই পরিচিতি পায়।
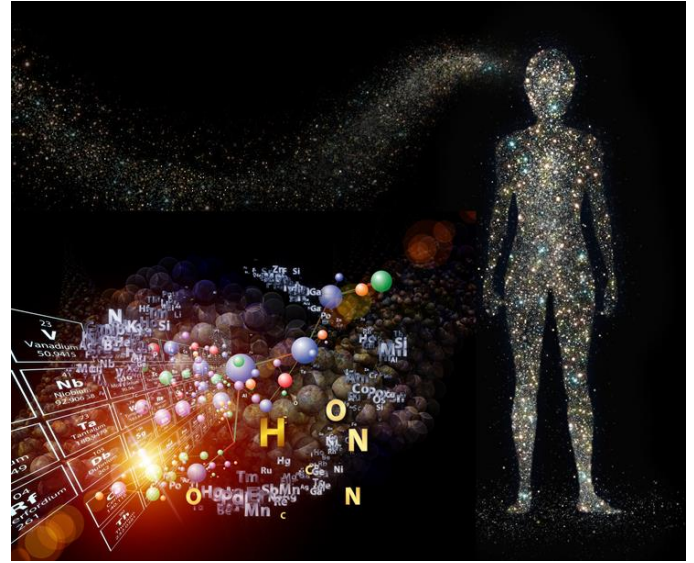
৮.

আমাদের এই জগত সংসারের সকল বস্তুই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মৌলের সমন্বয়ে। আমাদের এই মানবদেহও এর ব্যতিক্রম নয়। এটি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মৌল দিয়ে। আমাদের দেহের প্রধান গঠন উপাদানের মধ্যে রয়েছে জল, প্রোটিন, ফ্যাট, গ্লুকোজ ইত্যাদি। এদের থেকেই আমরা প্রাথমিকভাবে আন্দাজ করে বের করতে পারি কী কী মৌলের পরমাণু রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে। জলে রয়েছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন; গ্লুকোজ আর চর্বিতে পাচ্ছি কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। এক প্রোটিনেই রয়েছে সাতটি মৌল- কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস ও আয়রন। আমাদের দেহের হাড়, দাঁতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ফ্লোরিন ইত্যাদি; রক্তে হিমোগ্লোবিনে রয়েছে লোহা। মানবদেহে পারমাণবিক পর্যায়ে চিরুনি তল্লাশি করলে সোনা, রুপা, ইউরেনিয়ামের মতো মৌলও পাওয়া যাবে (এসব ট্রেস এলিমেন্টগুলোর ভর সব মিলিয়ে একজন মানুষের দেহে প্রায় ১০ গ্রাম!) এসবেরই উৎপত্তি বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে, তারার মাঝে, সুপারনোভা সহ আরো বিভিন্ন উপায়ে এবং কীভাবে এদের সৃষ্টি তা আমরা দেখে এসেছি। জাফর ইকবাল স্যারের বইয়ে প্রথম পড়েছিলাম যে, আমরা সকলেই নক্ষত্রের সন্তান। পাঠ্যবইয়েও বোধ হয় এরকম একটা কথা পড়েছিলাম। ছোটোবেলায় বুঝতামই না কীভাবে আমাদের মধ্যে নক্ষত্রে সৃষ্ট উপাদান রয়েছে। এখন আমি বিষয়টি বুঝেছি। আশা করি আপনারাও বুঝেছেন।

গল্প আর ইন্টারস্টেলার ভ্রমণ

কাইফ রহমান

"নিয়ন, স্পেইসক্রাফট ব্যবহার কইরা অনেক হইছে সৌরজগৎ দেহন। এবার চল একটু চিন্তা করা যাক কেমনে প্রক্সিমা সেন্টরাই নক্ষত্রের গ্রহ- প্রক্সিমা সেন্টরাই-বি দেহন যায়।"

"মিওন ভাই, আপনার মাথা ঠিক আছে? প্রক্সিমা সেন্টরাই সৌরজগৎ থাইক্কা ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে। আমগো সবচেয়ে দ্রুতগতির স্পেইসক্রাফট পার্কার সোলার প্রোব ঘন্টায় ৪,৩০,০০০ মাইল বেগে যায়। তাইলে..."

"তাইলে প্রায় ৬,২৫০ বছর লাগব ওইহানে যাইতে... এইটাই তো কইবি?"

"জি, ভাই।"

"ওইটা আমিও জানি। এহন চিন্তা কর কেমনে এই কাম আমগো জীবদ্দশায় খতম করন যায়। দেখ, আমরা যদি এমন একটা স্পেইসক্রাফট তৈরি করতে পারি যেটা আলোর ২০% বেগে চলব তাইলে ২০ বছরেই ওইহানে যাওন সম্ভব।"

"ভাই, সূর্যের আলোর ২০% করার জন্য যে পরিমাণ জ্বালানি লাগব তা কইষা দেখলে ৭.৫×১০^{১৭} জুল হয়! এত জ্বালানি তো জীবনেও যোগান দিতে পারুম না।"

"যোগানও দিতে পারুম না, আবার যোগান দিলেও এই পরিমাণ জ্বালানি পুরা অবজারভেবল মহাবিশ্ব দখল কইরা রাখব। একটা কাম কর, বাড়ি গিয়া এ বিষয় নিয়া ভাবতে থাক। দুইদিন পর আমার লগে দেখা কর। আমিও একটু ভাবি।"

"আইচ্ছা ভাই।"

২ দিন পর.....

"ভাই, আমি অনেক চিন্তা করসি কিন্তু কোনো উপায় পাইলাম না। আপনি কিসু পাইলেন?"

"হ কিসুটা"

"কী পাইলেন?"

"দেখ, স্পেইসক্রাফটের স্পিড ২ভাবে বাড়ান যায়। অতিরিক্ত জ্বালানির ব্যবহার কইরা অথবা স্পেইসক্রাফটের ভর কমাইয়া দিয়া জোরে ধাক্কা দেওন। যেহেতু অতিরিক্ত জ্বালানির ব্যবহার করন যাইব না, তাই সেকেন্ড পদ্ধতিই ব্যবহার করতে হইব।"

"ভাই, একটু খুইলা কন।"

"দেখ, আমরা প্রথমে একটা ন্যানো স্পেইসক্রাফট বানামু, যার ভর মাত্র কয়েক গ্রাম হইব। তারপর একটা মাদারশিপ দিয়া ন্যানো স্পেইসক্রাফটরে পৃথিবীর কক্ষপথের অনেক ওপরে নিয়া যামু। এরপর Ground based array-এর লেজার দিয়া জোরে ধাক্কা দিমু। দেখ, মহাশূন্যে কিন্তু কোনো ঘর্ষণ নাই। তাই ন্যানো স্পেইসক্রাফটরে যে খুব একটা ত্বরণ দিতে হইব, তা নিয়া চিন্তা করন লাগব না। খালি খুব জোরে ধাক্কা দেওন লাগব। এই জন্য পৃথিবী থাইক্কা ১০kW-এর অনেকগুলা লেজার বিম ফোকাস কইরা একলগে ১০০ গিগাওয়াটের শক্তি দিতে পারলেই আলোর ২০% বেগে চলতে পারব।"

"ভাই, ন্যানো স্পেইসক্রাফট কেমন হইব?"

"এর দুইটা অংশ। স্টারচিপ আর সোলার সেল। স্টার চিপের ভর কয়েক গ্রাম হইব। ধর ৪–৫ গ্রাম। এর মধ্যেই ছবি তোলার জন্য ৪টা ২মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, কমিউনিকেশন, ন্যাভিগেশন, ড্যাটা ট্রান্সফারের জন্য রিট্র্যাক্টটেবল মিটার লং অ্যান্টেনা থাকব। সোলার সেলের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ৪ মিটার করন হইব। এটা পুরুত্বের দিক থিকা ১০০টা পরমাণুর বেশী হইব না।"

"ভাই, সোলার সেল কী?"

"শিপের মধ্যে সেল দেখসোস না?"

"হ, বাতাসের ধাক্কায় গতি পায়।"

"ঠিক তেমনই সোলার সেলের ওপর লাইট বিমের ধাক্কা দিয়া ন্যানো স্পেইসক্রাফটরে আলোর ২০% বেগ দিমু।"

"ভাই, আপনি একখান জিনিস। এত সুন্দর কইরা সমস্যা সমাধান কইরা দিলেন। কোনো জ্বালানিই লাগল না। সময়ও খুব কম লাগব।স্যালুট ভাই।"

"রোশো, বৎস। তুই যতটা সহজ ভাবসোস ততটা সহজ নয়।"

"কেন ভাই?"

"দেখ, সোলার সেলের পুরুত্ব এতই কম যে এর ডিউরেবিলিটি ধরে রাখা খুব কষ্টকর। আর যহন ন্যানো স্পেইসক্রাফটটা এত গতি পাইব, তহন যদি স্পেইস ডাস্টের লগে এর সংঘর্ষ হয়, তাইলে এটা ধ্বংস হইয়া যাইব। এজন্য অবশ্য কয়েক হাজার ন্যানো স্পেইসক্রাফট ব্যবহার করন হইব, যাতে কোনো একটা সফল হয় পৌঁছাইতে। একটার পর একটারে লেজার বিম দিয়া ধাক্কা দেওন হইব। কিন্তু দেখ প্রায় ২০ বছর লাগব ডেস্টিনেশনে পৌঁছাইতে। এই ২০ বছর ধইরা ন্যানো স্পেইসক্রাফটের অক্ষত থাকা খুবই অনিশ্চিত।"

"তাইলে ভাই এহন করার কী আছে?"

"এই যে সমস্যাগুলা কইলাম, এর সমাধান বাইর করন।"

"আশা করি ভাই আমরা একদিন এ সমস্যার সমাধান কইরা ফেলুম।"

"হ।"

মহাবিশ্ব, এই যাত্রার শেষ কোথায়?

এ. আর. মুবিন

মেঠোপথ ছেড়ে হাইওয়েতে উঠে এলো এক নিঃসঙ্গ মুসাফির। দুদিকের প্রান্তহীন সড়ক যেন দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। মুসাফিরের ক্লান্ত শ্রান্ত চোখে মুহূর্তেই মলিনতা ছাপিয়ে ফুটে উঠল বিস্ময়। হাঁটতে হবে বহুদূর। মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এলো স্বগতোক্তি–এই যাত্রার শেষ কোথায়?

জগৎ চলছে আপনতালে, পৃথিবী ঘুরছে, সূর্য কিরণ দিচ্ছে, চাঁদ হাসছে। আর আমরা ভাবছি। আমাদের মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলছে আদিম বংশধরদের কাছ থেকে পরম্পরায় বয়ে আসা এক অদ্ভুত কার্যকরী বৈশিষ্ট্য - কৌতূহল। এই কৌতূহলের বদান্যতায় জীবনের কোনো না কোনো বাঁকে পৌঁছে আমরাও আপনমনে স্বগতোক্তি করে উঠি–এই যাত্রার শেষ কোথায়?

মানবজাতির উদ্ভাবিত সবচেয়ে উপকারী, সবচেয়ে নিখুঁত, সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাতিয়ারের নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। যার বিপুল অবদানে আমরা মোহিত, চকিত আর সমৃদ্ধ। তো, বিজ্ঞানকে যদি প্রশ্ন করি - এই যাত্রার শেষ কোথায়? বিজ্ঞান কি পারবে সঠিক উত্তর দিতে? দেখা যাক...

- বিজ্ঞান, এই যাত্রার শেষ কোথায়?

- কোন যাত্রার?

- মানে আমাদের অন্তিম পরিণতি কী?

- তার আগে আপনি ক্লিয়ার করুন, এই ‘আমাদের’ বলতে আপনি কাদের বোঝাচ্ছেন? শুধুই মনুষ্যসম্প্রদায়? পৃথিবী? নাকি এই পুরো মহাবিশ্বটাই?

- আচ্ছা ধরো আমি পুরো মহাবিশ্বটাকেই বোঝাচ্ছি!

- তাহলে এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা প্রশ্নের মতো এত সহজ না!

- কেন?

০ কারণ, মহাবিশ্ব সম্পর্কে এখনো অনেক কিছুই আমরা জানি না, কোনোকিছুর পরিণতি সম্পর্কে জানতে হলে এর উদ্ভব এবং বর্তমান প্রসেস সম্পর্কে জানতে হয়।

- ওহ আচ্ছা। আমরা কি তাহলে মহাবিশ্বের পরিণতি জানি না? যেহেতু মহাবিশ্বের পরিণতির ওপর আমাদের পরিণতিও নির্ভর করে। তাই এটা না জানাটা খুবই হতাশাজনক।

- হতাশ হবেন না, বিজ্ঞান কখনো থেমে থাকে না, অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যায়। আমরা মহাবিশ্বের যতটুকু জানি তার ওপর ভিত্তি করেই মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতির কিছু মডেল তৈরি করেছি। এবং মডেলগুলো বেশ গ্রহণযোগ্যও বটে!

- তাই নাকি? তাহলে বলা যায় আমরা মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতি জানি?

- হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দুটো শাখা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি ও কসমোলজি। বিগত কয়েক দশকে এই দুটো শাখা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আমরা এই দুইয়ের ওপর ভর করে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দেখতে পাই!

- এটা শুনে খুব ইন্টারেস্ট পাচ্ছি, আমাকে কি বিস্তারিত খুলে বলা যাবে? একেবারে প্রথম থেকে?

- হ্যাঁ প্রথম থেকেই শুরু করছি। মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি জানতে হলে আগে এর গঠনপ্রকৃতি এবং কীভাবে মহাবিশ্ব এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেটা জানতে হবে। সংক্ষেপে বলি তাহলে?

- হুম।

- মহাবিশ্বের মৌলিক অংশ হিসেবে, আমরা যদি বিশাল পরিসর থেকে চিন্তা করি, তাহলে প্রথমেই চলে আসে গ্যালাক্সিগুলোর কথা। একেকটা গ্যালাক্সি যেন নক্ষত্রে ঠাসা জ্বলজ্বলে দ্বীপ। যেন নিকষ মহাশূন্যের বিশাল বুক চিরে মাথা তুলে জেগে আছে। একেকটি সাধারণ গ্যালাক্সিতে গ্র্যাভিটির বন্ধনে যুক্ত প্রায় ৬০০ বিলিয়ন নক্ষত্র বসবাস করে। আমরাও এরকম একটি গ্যালাক্সির বাসিন্দা, সূর্য হলো এই গ্যালাক্সির ৬০০ বিলিয়ন নক্ষত্রের মাঝে মধ্যবিত্ত এক নক্ষত্র। এই সূর্যের চারপাশে আমাদের পৃথিবী ছাড়াও আরও আটটি গ্রহ চক্কর দিচ্ছে, যাকে সৌরজগৎ বলে। আর আমাদের এই গ্যালাক্সির আমরা নাম দিয়েছি 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'।

- ঠিক, এগুলো মোটামুটি জানতাম, কন্টিনিউ...

- তো, আমাদের জানা অজানা গ্যালাক্সিগুলো নিয়েই আমাদের এই মহাবিশ্ব। গ্যালাক্সিগুলো পুরো মহাবিশ্বে মোটামুটি সমানভাবে ছড়িয়ে আছে এবং দিন দিন এগুলোর মধ্যকার স্পেইস বড়ো হচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায় মহাবিশ্ব স্থির নয়, বরং ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই দূরে সরে যাওয়ার হারকে হিসেব কষে বিজ্ঞানীরা বলে দিয়েছেন–প্রায় ১৩.৭৭ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের প্রাথমিক উপাদানগুলো খুব ঘন এবং উচ্চ তাপমাত্রায় একসাথে এঁটে ছিল। তারপর যখন সময়ের সাথে সাথে স্পেইস বড়ো হয়, তখন বাড়তে থাকে উপাদানগুলির মধ্যকার দূরত্ব। এর অনেক পরে এসব পদার্থ জায়গায় জায়গায় ঘনীভূত হয়ে গঠিত হয় একেকটি গ্যালাক্সি। আর স্পেইসের এই সম্প্রসারণের সূচনাকে বলা হয় 'বিগ ব্যাং'। নামে বিগ ব্যাং হলেও আদতে সেখানে কোনো বিস্ফোরণ হয়নি। স্পেইস প্রসারিত হয়েছে, উপাদানগুলো দূরে সরে গেছে, এটাই।

- আচ্ছা তার মানে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত বড়ো হচ্ছে, এর কি কোনো শেষ নেই? এভাবে কি অনন্তকাল ধরে বড়ো হতেই থাকবে?

- আসলেই, মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ কি চিরকাল অব্যাহত থাকবে? নাকি একপর্যায়ে থেমে গিয়ে আবার উলটো সংকুচিত হতে শুরু করবে? এটি কিন্তু কসমোলজির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন, তবে দুঃখের বিষয় হলো, আমরা এখনো এর সঠিক উত্তর জানি না! তাই এখানে কয়েকটি মডেলের অবতারণা করা হয়েছে। আমি আপাতত দুটো মডেল নিয়েই বলি - যে মডেলে মহাবিশ্ব অনন্তকাল সম্প্রসারিত হতে থাকবে সেই মহাবিশ্বের মডেলকে "Open Universe" মডেল বলা হয়। এবং যে মডেলে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের শেষ পর্যায়ে গিয়ে আবার উলটো সংকুচিত হতে শুরু করবে সেই মহাবিশ্বের মডেলকে "Close Universe" মডেল বলা হয়। এখন কোটি টাকার প্রশ্ন হলো–আমরা কোন মডেলের মহাবিশ্বে আছি? উন্মুক্তটায়? নাকি বদ্ধটায়? এর উত্তরের ওপরই মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ভর করছে। তবে মহাবিশ্বটা উন্মুক্ত হবার ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিত অবশ্যি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এখনই চূড়ান্ত করে কিছু বলার সময় আসেনি। যাই হোক, চলুন উন্মুক্ত মহাবিশ্বের মডেলটা দেখে আসি -

Open universe model-

মহাবিশ্বটা যদি উন্মুক্ত হয় তাহলে এর কপালে কী পরিণতি অপেক্ষা করছে? আগেই বলেছি, যেহেতু গ্যালাক্সিগুলোর সমষ্টিই মহাবিশ্ব, তাই আগে গ্যালাক্সির দিকে আলোকপাত করি, হাঁড়ির এক ভাত টিপলে খবর মিলবে বাকি সব ভাতের। ধরি, একটি সাধারণ ছিমছাম গ্যালাক্সি, তার ভেতর অনেকগুলো নক্ষত্র। এই নক্ষত্রদের জন্ম-মৃত্যু আছে, নক্ষত্ররা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয় আবার মারাও যায়। সময়ের পাল্লায় মাপলে একেকটা নক্ষত্রের জীবনকাল প্রায় ৬০ বিলিয়ন বছর। ৬০ বিলিয়ন বছর মানে হচ্ছে ৬ হাজার কোটি বছর। একটা নক্ষত্র ৬০ বিলিয়ন বছর পেরিয়ে যখন জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছে, তখন তার ভাগ্যে

তিন ক্যাটাগরির যে-কোনো একটি পরিণতি অপেক্ষা করে। তার কপালে কী পরিণতি অপেক্ষা করছে সেটা নির্ভর করে নক্ষত্রের ভরের ওপর। তো, এই তিন ক্যাটাগরির যে-কোনো একটিতে পরিণত হলে তাকে আমরা মৃত নক্ষত্র বলতে পারি। এই তিনটি ক্যাটাগরি হলো -

• White dwarf (সাদা বামন)
• Neutron star (নিউট্রন তারা)
• Black hole (কৃষ্ণগহ্বর)

এই ক্যাটাগরিগুলো নিয়ে বিস্তারিত সামনে আলোচনা করব, এখন জাস্ট নোট করে রাখেন–এই মৃত নক্ষত্রগুলোর উপাদান অত্যন্ত চাপ এবং তাপে খুব ঘন অবস্থায় থাকে। সবচেয়ে ঘন উপাদান থাকে ব্ল্যাকহোলে। তো কমনসেন্স বলে, ভবিষ্যতে একটা গ্যালাক্সির সবগুলো নক্ষত্রের কপালে এই তিনটি ক্যাটাগরির যে-কোনো একটা অপেক্ষা করছে। এভাবে একটা গ্যালাক্সির সবগুলো নক্ষত্র মারা যেতে ১০০ বিলিয়ন থেকে হাজার বিলিয়ন বছর বা আরো বেশি সময় লেগে যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমান গ্যালাক্সিগুলো লক্ষকোটি বছর পর অগণিত মৃত নক্ষত্র দিয়ে ঠাসা থাকবে। যারা গ্র্যাভিটির পারষ্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। এই নক্ষত্রদের কোনো উত্তাপ না থাকার কারণে পুরো গ্যালাক্সিজুড়ে তীব্র শীতল অবস্থা বিরাজ করবে। গ্র্যাভিটির আকর্ষণ তখনও গ্রহ উপগ্রহগুলোকে ধরে রাখবে। কিন্তু মহাবিশ্ব উন্মুক্ত হবার কারণে গ্যালাক্সিগুলোর মাঝের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

- তারপর? তারপর কী হবে?

- তারপর গ্যালাক্সিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন ঘটবে আরও অনেক বড়ো পরিসরে। অনেক বড়ো সময়জুড়ে। কিছু মৃত নক্ষত্র অন্য নক্ষত্রের সাথে প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়ে গ্যালাক্সি থেকে বের হয়ে যাবে। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর (10^{18}, অর্থাৎ ১ এর পর ১৮ টা শূন্য!) বা বিলিয়ন বিলিয়ন বছরে (10^{27}) এভাবে একটা গ্যালাক্সি থেকে প্রায় ৯৯% নক্ষত্র বের হয়ে যেতে পারে। বাকি ১% মৃত নক্ষত্রগুলো একত্র হয়ে খুব ঘন একটি কোর গঠন করবে, যা একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলে পরিণত হবে। এই ব্ল্যাকহোলের ভর হবে প্রায় এক বিলিয়ন সৌর ভরের সমান। আমরা এটাকে তখন ডাকব (যদি টিকে থাকি আর কী!) 'গ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোল'। আর গ্যালাক্সির এই যে পরিবর্তনের কথা বলছি এটাকে বলে Dynamical evolution of galaxy বা "গ্যালাক্সির পরিবর্তন গতিবিদ্যা"।

- ও মাই গড! মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে!

এখানেই শেষ নয়! আমি নক্ষত্রের তিনটি চূড়ান্ত পরিণতির কথা বলছিলাম না? ধরেন একটি নক্ষত্র চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে গেল, সুবিধার জন্য ধরে নিই সর্বগ্রাসী ব্ল্যাকহোলে রূপান্তরিত হলো। আগেই বলেছি এতেই প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর লেগে যাবে। তো, ব্ল্যাকহোল কিন্তু বিকিরণের মাধ্যমে খুব ধীরে ধীরে তার ভর হারায়। তখন যদি আরও বিলিয়ন বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করি, দেখা যাবে এই ব্ল্যাকহোলটিও বিকিরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার ভর হারাচ্ছে। এইভাবে প্রায় 10^{65} বছরে সৌরভরের সমান একটি ব্ল্যাকহোল (সৌরভরের সমান নক্ষত্র কখনো ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয় না, হিসেবের সুবিধার জন্য ধরা হয়েছে আরকি!) বিকিরণের মাধ্যমে ভর হারিয়ে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে! পুরো গ্যালাক্সির সব নক্ষত্র গ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোলের পেটে গিয়ে আস্ত গ্যালাক্সিটা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে যত সময় লাগবে, সৌরভরের সমান একটি ব্ল্যাকহোল বিকিরণ করে মিলিয়ে যেতে তারচেয়েও বেশি সময় লাগবে। কারণ ব্ল্যাকহোলের ভর যত কম, তার বিকিরণের পরিমাণও তত অল্প।

- আচ্ছা একবার যদি গ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোল তৈরি হয়ে যায়। তাহলে কী ঘটবে? এটা কি চিরস্থায়ী হবে?

- সুন্দর প্রশ্ন, এই প্রশ্নটা মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। আসলে, এটারও ক্ষয় আছে! এই দানবীয় গ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোল পুরোপুরি ক্ষয় হতে প্রায় 10^{90} বিলিয়ন বছর লাগবে।

- শেষ?

- নাহ, এত সহজে গল্প ফুরোচ্ছে না!
এরচেয়েও বড়ো পরিসর নিয়ে গঠিত হয় সুপারগ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোল। অনেকগুলো গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত হয় একেকটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টার। আর এই গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের সবগুলো গ্যালাক্সিকে গ্রাস করে যে ব্ল্যাকহোল জন্ম নেয় সেটাকেই সুপারগ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোল বলে। সুপারগ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোল বিকিরণ করে পুরোপুরি ক্ষয় হতে সময় লাগে প্রায় 10^{100} বছর। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি 10^{100} বছরে সব গ্যালাক্সি ক্লাস্টারগুলো সুপারগ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়ে যাবে। মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি নামে আর কিছু থাকবে না। শুধু অবশিষ্ট থাকবে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকা কতিপয় নিউট্রন তারা, সাদা বামন এবং অতীতে গ্যালাক্সি থেকে প্রবল সংঘর্ষে বেরিয়ে আসা ছোটোখাটো পদার্থের টুকরোগুলি। এই মৃত নক্ষত্র এবং পদার্থের টুকরোগুলো অনন্ত মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

- তারপর?

- তারপর আরো 10^{100} সময়ের বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে এই মৃত নক্ষত্র এবং পদার্থগুলোতে খুব ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটবে। আসলে কী পরিণতি ঘটবে এগুলোর কপালে? এর উত্তর দিতে গিয়ে একটি বিষয় চলে আসে,

আর সেটা হলো–এই পদার্থগুলোর স্থায়িত্বকাল আসলে কত সময়? যদিও এটা কেউই শিওর করে বলতে পারে না। তবুও এটার কয়েকটা সম্ভাবনা নিয়ে সামনে বিস্তারিত আলাপ করব। এখন শুধু একটা সম্ভাবনার কথা বলি-

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কিছু সূত্র অনুযায়ী একটি সম্ভাবনা আছে এই মৃত নক্ষত্র এবং পদার্থগুলি শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাকহোলেই ঠাঁই নিবে, এবং বিকিরণ করে শেষমেশ ক্ষয় হয়ে যাবে। সময়ের ব্যাপ্তিতে এটা ঘটতে $10*10^{76}$ বছর লাগবে।

- এটা ঠিক কত বছর?

- আমি যদি 'বিলিয়ন' শব্দটা এক বিলিয়ন বার লিখি, তারপরও আমার লেখা সংখ্যাটা এই $10*10^{76}$ এর তুলনায় কিছুই না! এবার ভাবতে থাকুন!

এবার আসি, একটি উন্মুক্ত মহাবিশ্বে সভ্যতা বা প্রাণ কতদিন টিকে থাকতে পারে? আসলে কোন টাইপের সভ্যতা বা প্রাণ দীর্ঘসময় ধরে টিকতে পারবে এটা ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। তবে সভ্যতা বা প্রাণের টিকে থাকাটা নির্ভর করে শক্তির উৎসের সহজলভ্যতার ওপর। যেমন আমরা টিকে আছি সৌরশক্তির ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শক্তির উৎসের মেয়াদও কিন্তু ওই 10^{100} বছর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাই এই সময়ের পর মহাবিশ্বে প্রাণ থাকার ব্যাপারে কোনো আশা করা যায় না। তবে এগুলোর ব্যাপারে কিছু হাইপোথিসিস আছে, সেগুলো নিয়ে আরেকদিন বিস্তারিত আলোচনা করব।

Close universe model:

তো মহাবিশ্বটা উন্মুক্ত হলে এতক্ষণ যা যা বললাম মোটামুটি তাই তা-ই ঘটবে। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি বদ্ধ হয় তখন কী হতে পারে? এক্ষেত্রে মহাবিশ্ব তার প্রসারণের সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে থেমে যাবে। তখন গ্যালাক্সিগুলো বর্তমান সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ দূরত্বে অবস্থান করবে। গ্যালাক্সিগুলো ওই অবস্থায় ৪০ থেকে ৫০ বিলিয়ন বছর সময় স্থবির থাকতে পারে। তারপর এটি আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে। ৯০-৬৬০ বিলিয়ন বছর পর মহাবিশ্বের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা খুবই বেড়ে যাবে এবং শুরু হবে 'বিগ ক্রাঞ্চ' বা মহা-সংকোচন। মহাবিশ্বের সব পদার্থ উত্তপ্ত হয়ে একসাথে একাকার হয়ে যাবে। মহাবিশ্বের এই দশায় কোনোরূপ প্রাণ টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই। এই বিগ ক্রাঞ্চের পর কী ঘটবে? সত্যিই কি তখন 'এরপর' বলতে কিছু থাকবে? মহাবিশ্বের এক কোনার সাধারণ একটা গ্যালাক্সির মধ্যবিত্ত এক নক্ষত্রের চারপাশে অবিরাম ছুটে চলা ছোট্ট একটা গ্রহের বাসিন্দা হয়ে আমরা সেটা জানি না। কিন্তু তাতে কী? যতটুকু জানি সেটাই বা কম কীসে?

- প্রচণ্ড ইমোশনাল হয়ে গেলাম! কাঠখোট্টা বিজ্ঞান শুনে এত আবেগতাড়িত হবো ভাবতেই পারিনি!

- পুরো শোনার জন্য ধন্যবাদ, আশা করি বিজ্ঞানের সাথেই থাকবেন।

(অনুদিত, "The Ultimate Fate of the Universe" অবলম্বনে।)

যুক্তরাজ্যের নতুন জাতের করোনাভাইরাস

হাসান-উজ-জামান শ্যামল

বিলেতে যে নতুন এক করোনাভাইরাস নিয়ে শোরগোল শোনা যাচ্ছে সেটা মনে হয় জানেন। লেখাকালীন সময় বাংলাদেশে ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ, সময় রাত এগারোটা দশ। লেখার বিষয়বস্তু হলো বাইশে ডিসেম্বর এগারোটা দশ পর্যন্ত এই নতুন জাতের করোনাভাইরাস সম্পর্কে আমাদের যতখানি জ্ঞান। এগারোটা এগারোতে আমাদের জানা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে, আগেই বলে রাখা ভালো।

ভাইরাসের জাত

আপনি হচ্ছেন আন্টি এবং আঙ্কেলের বংশবিস্তারের ফলাফল; বাংলা সিনেমায় যাকে বলে ভালোবাসার ফসল। কিন্তু আপনার চেহারা হুবহু আন্টির মতো নয়, আবার হুবহু আঙ্কেলের মতোও নয়। বংশবিস্তার প্রক্রিয়ায় তাদের জীবন নকশার– যাকে বলে জেনেটিক্সের মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। জীব মাত্রই বংশবিস্তারের সময় এ ধরনের পরিবর্তন হয়।

করোনাভাইরাসও এক ধরনের জৈবিক প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে, কাজেই সেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যেক দফা বংশবিস্তারের সময় তার বাচ্চাকাচ্চার মধ্যে খানিকটা করে পার্থক্য তৈরি হয়। পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের ফুসফুসের মধ্যে এই বজ্জাতটা বিপুল বিক্রমে বংশবিস্তার করে যাচ্ছে। বংশবিস্তার করতে করতে প্রতিনিয়তই তার বাচ্চাকাচ্চার মধ্যে একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ এখনকার পৃথিবীতে প্রতি মিনিটেই নতুন চেহারার করোনাভাইরাস তৈরি হচ্ছে।

এই যে এরকম বংশবিস্তারের সাথে সাথে ভাইরাসের চেহারায় পরিবর্তন আসে– এই ব্যাপারটাকেই বইয়ের ভাষায় বলে মিউটেশন। আশা করি বুঝতে পারছেন, ভাইরাসের মধ্যে মিউটেশন হওয়া এমনিতে ভয়ের কিছু নয়। এটা নিতান্তই একটা দৈনন্দিন জৈবিক প্রক্রিয়া। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বা গাছের

সালোকসংশ্লেষণের মতো। প্রত্যেকটা নিশ্বাস নিয়ে যেমন আমাদের চিন্তা করতে হয় না, একইভাবে পৃথিবীময় কোটি কোটি করোনাভাইরাসের অর্বুদ-নির্বুদ নতুন চেহারা নিয়েও আমাদের ভাবতে বসার দরকার নেই।

চিন্তার কথাটা তখনই আসে যখন এরকম কোনো 'মিউটেশন'-এর ফলে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। ধরুন, এরকম কোনো মিউটেশনের ফলে ভাইরাসটা আরো দ্রুত ছড়াতে শিখে গেল, তখন হর্তাকর্তাদের হাসপাতালের বিছানা বা আইসিইউয়ের সংখ্যা নিয়ে ভাবতে হয়। সেটা সিরিয়াস।

কাজেই যুক্তরাজ্যে যে নতুন চেহারার একটা ভাইরাস দেখা যাচ্ছে, সেটা এমনিতে দুশ্চিন্তার নয়- নতুন চেহারার ভাইরাস প্রতিনিয়তই তৈরি হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এই নতুন চেহারার ভাইরাসের কি সেরকম কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে?

এটাই আসল প্রশ্ন।

নতুন জাত=নতুন বৈশিষ্ট্য?

এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর হলো– এখন পর্যন্ত এই মর্মে আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।

ভুলে যাবেন না, আমরা কিন্তু কথা বলছি বাইশে ডিসেম্বর এগারোটা দশ মিনিটে। এগারোটা এগারোতে নতুন প্রমাণ হাজির হবে কি না জানি না। কিন্তু এগারোটা দশের হিসেব অনুসারে নতুন চেহারার করোনাভাইরাস নিয়ে দুশ্চিন্তার আলাদা কারণ নেই।

কাহিনি খোলাসা করা যাক।

বিগত কয়েক দিন ধরে যুক্তরাজ্যের গবেষকেরা লক্ষ করলেন, দেশের দক্ষিণে একটা বিশেষ চেহারার করোনাভাইরাস রোগীদের মধ্যে একটু বেশি বেশি দেখা যাচ্ছে। এটা দেখে তাঁদের খানিকটা সন্দেহ হলো- তাঁরা এর নকশার ওপর অস্ত্রোপচার চালিয়ে- যেটাকে বলে আরএনএ সিকোয়েন্সিং করে বুঝলেন, এর গায়ে বেশ কিছু নতুন পরিবর্তন এসেছে।

তো এরকম একটা নির্দিষ্ট চেহারার ভাইরাস এত বেশি রোগীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে কেন? এখান থেকেই দুশ্চিন্তার শুরু।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি দুশ্চিন্তা করার সেরকম কারণ নেই। একটা চেহারার ভাইরাস রোগীদের মধ্যে বেশি বেশি দেখা গেলেই যে সেটা বেশি ছড়াতে পারে– এরকম সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা ফাঁক আছে। ফাঁকটা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ চিন্তা করুন।

ধরুন, আপনার ফুসফুসের মধ্যে এক জাতের করোনাভাইরাস বাসা বেঁধেছে। গল্পের সুবিধায় ধরে নিলাম এই ভাইরাসটার গায়ে একটা রং আছে। ধরে নিন রংটা গোলাপি। আসলে এসব নিতান্তই অবাস্তব, ভাইরাসের অত রংঢং থাকে না। কিন্তু এই গাঁজাখুরি গল্পটার মধ্যে আপনি গোলাপি ভাইরাস বুকের মধ্যে নিয়ে দিন পার করছেন।

এর মধ্যে একদিন ফেইসবুকে দেখলেন, সামনে আপনার এক ক্লাসমেটের বিয়ে। বন্ধুর বিয়েতে যাওয়া ইমানি দায়িত্ব মনে করে আপনি অনুষ্ঠানে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে কমিউনিটি সেন্টার ভর্তি মানুষের সাথে কোলাকুলি, খানাপিনা, সেলফি কিছুই করতে বাকি রাখলেন না। আপনার ভেতরে যে গোলাপি করোনা বাস করছে, সেদিকে কোনো খবর নেই।

কিছুদিন পর চাউর হয়ে গেল, দেশের একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে একটা অদ্ভুত চেহারার করোনাভাইরাস অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ভাইরাসটার রং কোনো কারণে গোলাপি। এত এত রোগীর মধ্যে যেহেতু গোলাপি করোনা দেখা যাচ্ছে, তার মানে নিশ্চয়ই এটা বেশ দ্রুত ছড়ায়। না হলে এত মানুষের মধ্যে একই জিনিস দেখা যাবে কেন?

আসল ঘটনা কিন্তু আমরা জানি। আপনি সেদিন সেই কমিউনিটি সেন্টারে গিয়েছিলেন এবং হলসুদ্ধ মানুষের মধ্যে মহানন্দে আপনার ভাইরাসটা ছড়িয়ে এসেছিলেন। তারা বাসায় গিয়ে তাদের পরিবার-প্রতিবেশীর মধ্যে গোলাপি ভাইরাস ছড়িয়েছে। কাজেই আপনার থেকে শুরু হয়ে মোটামুটি পুরো এলাকাতেই গোলাপির রাজত্ব কায়েম হয়ে গেছে।

লক্ষ করুন, এখানে কিন্তু গোলাপির কোনো কৃতিত্ব নেই, কৃতিত্ব আপনার। গোলাপি যে এত মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তার কারণ

তারা দুর্ভাগ্যবশত আপনার কাছ থেকে এই বিশেষ চেহারার ভাইরাসটা পেয়েছে। এর সাথে ভাইরাস দ্রুত ছড়ানোর সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে স্থান-কাল-পাত্রের।

বিবর্তনশাস্ত্রে এই ঘটনার একটা নাম আছে– ফাউন্ডার ইফেক্ট। এই ফাউন্ডার ইফেক্টের কারণে কোনো বিশেষ চেহারার ভাইরাসকে অনেক বেশি 'ছড়াতে' দেখা যেতে পারে, যদিও এখানে ভাইরাসের নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই।

এজন্যই যুক্তরাজ্যের এত মানুষের মধ্যে ঐ বিশেষ চেহারার ভাইরাস দেখে এখনো বলার সুযোগ নেই যে, এই ভাইরাসটা দ্রুত ছড়ায়। এটার ওই বিয়েবাড়ি জাতীয় ব্যাখ্যাই থাকতে পারে। হয়তো এই বিশেষ চেহারার ভাইরাসওয়ালা রোগীরা ইচ্ছামতো ছড়াতে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে, কিছু গবেষণায় দেখা গেছে অধিকাংশ করোনা কেইসের জন্য দায়ী হলো এই বিয়েবাড়ি বা ভিড়ভাট্টা জাতীয় জায়গায় দু-একজন অতি উৎসাহী করোনাওয়ালার আনাগোনা (তথ্যসূত্র দেখুন)।

এই গেল সন্দেহের প্রথম কারণ। ভাইরাসটা যে দ্রুত ছড়াতে পারে, এটা ভাবার অবশ্য আরো দুয়েকটা কারণ আছে।

যুক্তরাজ্যের এই ভাইরাসটার মধ্যে কয়েকটা পরিবর্তন হয়েছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। ভাইরাসকে যদি অসুখ বাঁধাতে হয়, তাহলে প্রথমে তাকে আমাদের দেহকোষের তালা খুলে ভেতরে ঢুকতে হবে। এই তালাগুলো খোলার জন্য তার গায়ে একটা বিশেষ গঠন আছে। গবেষণাপত্রে সেটাকে বলে স্পাইক (বাংলায় গজাল) প্রোটিন। জিনিসটা দেখতে তিনকোণা এবং একমাথা গজালের মতো সরু হয়ে গেছে বলেই এরকম নাম।

তো করোনা যখন রোগ সৃষ্টি করে, তখন সে এই গজাল প্রোটিনের একটা নির্দিষ্ট জায়গা কোষের গায়ে ঠেকায়। এর ফলে জায়গাটাতে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় এবং আমাদের কোষের খানিকটা জায়গা খুলে যায়। সেই খোলা জায়গা দিয়ে হতচ্ছাড়া কোষের ভেতরে ঢুকে সর্বনাশ করে।

যুক্তরাজ্যে করোনার যে নতুন চেহারাটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে একটা পরিবর্তন হয়েছে ঠিক এই চাবিটার মুখে। এটা দেখেই বিজ্ঞানীরা একটু অস্বস্তিতে ভোগেন। ভাইরাস ব্যাটা কি চাবিতে পরিবর্তন করে আরো পাকা চোর হয়ে উঠছে নাকি? পরিবর্তিত চাবি দিয়ে কি সে আমাদের কোষে আরো সহজে ঢুকতে পারবে?

কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা নেহায়েতই একটা সন্দেহ। পরিবর্তনটার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা এরকম উতলা হয়েছেন। আসলেই যে এই পরিবর্তনের ফলে ব্যাটা আরো চটপটে হয়, এই মর্মে কোনো প্রমাণ নেই।

মজার ব্যাপার হলো, এই নতুন চেহারার ভাইরাসের মধ্যে অন্য আরেকটা পরিবর্তনও এসেছে, যেটার ফলে এর তৎপরতা একটু কমে যায়। সিঙ্গাপুরের ভাইরাসের মধ্যে এই একই বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। সেটা হলে যুক্তরাজ্যের ভাইরাসটা নিয়ে চিন্তা দূরে থাক, বরং আমাদের খুশি হওয়া উচিত।

তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব ভাইরাসটা আসলেই চিন্তার বিষয় কিনা?

এর জন্য গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের সন্দেহের কারণ হলো রোগীদের মধ্যে ভাইরাসের উপস্থিতির হার, আর ভাইরাসের মধ্যে এই পরিবর্তনগুলোর সন্দেহজনক অবস্থান (আরো দুয়েকটা কারণ আছে- পরিশিষ্ট দেখুন)। এগুলো কোনোটাই আসলে দুশ্চিন্তার খুব শক্ত ভিত্তি নয়। ভাইরাসটা আসলেই দ্রুত ছড়ায় কি না সেটা বের করার জন্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে কিছু কোষ নিয়ে তাদের মধ্যে দুজাতের ভাইরাস ছেড়ে দিতে হবে। এক হচ্ছে পুরোনো, চেনা বান্দা, আরেক হচ্ছে এই নতুন যুক্তরাজ্যের বান্দা। এরপর যদি দেখা যায় পুরোনোটার চেয়ে নতুন বজ্জাতটার ছড়ানোর হার বেশি, তখন বিজ্ঞানীদের সন্দেহ আরেকটু পোক্ত হবে। শুনে জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের পরীক্ষা বিজ্ঞানীরা হরহামেশাই করে থাকেন। এই করোনাভাইরাসেরই আরেক জাতের ক্ষেত্রে তারা এই পদ্ধতিতে ব্যাটাদের বাজিয়ে দেখেছেন।

তার আগ পর্যন্ত অন্তত এগারোটা দশ পর্যন্ত, এই নতুন চেহারার বিলেতি শয়তান নিয়ে আমাদের আলাদা করে চিন্তিত হবার কারণ নেই।

তাহলে এটা নিয়ে এত হইচই কেন?

আপনাদের মনে আছে কি না জানি না– করোনা মহামারিটা যখন প্রথম শুরু হলো, তখন কিন্তু দুনিয়ার তাবৎ বিশেষজ্ঞরা আমাদের

পই পই করে বলছিলেন, মাস্ক পরে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনো লাভ হবে না। খামাখা মাস্ক কিনে লাভ নেই। কিন্তু তার মাস তিনেক পেরোতেই তারা বলা শুরু করলেন, মাস্ক পড়লে করোনার বিরুদ্ধে অবশ্যই লাভ হয়। মাস্কের ব্যবহার অতি জরুরি। মাস্ক না পরনেওয়ালারা দেশ ও জাতির শত্রু।

এই বিপরীতমুখী কথার কারণ কী?

এক কথায় বলতে গেলে, এটা এক ধরনের তথ্যরাজনীতি। মাস্ক পরে যে করোনাভাইরাস এবং শ্বাসযন্ত্রের যেকোনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লাভ হয় তা বিজ্ঞানীরা গোড়া থেকেই জানতেন। এমনকি মহামারির অনেক আগে থেকেই। কিন্তু প্রথমদিকে তাদের ভয় হচ্ছিল, সাধারণ মানুষ যদি গণহারে মাস্ক কেনা শুরু করে, তাহলে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাস্কের অভাব হতে পারে। এনাদের তো মাস্কের দরকার সবচেয়ে বেশি। কাজেই সাধারণ মানুষকে মাস্ক কেনা থেকে দূরে রাখা দরকার। তার মাস তিনেক পরে যখন যথেষ্ট পরিমাণে মাস্ক সহজলভ্য হয়ে গেল তখন তারা সত্যিটা বলা শুরু করলেন।

করোনা মৌসুমে এই তথ্যরাজনীতি অনেক বেশি চলে। বিশেষজ্ঞরা কথা বলার সময় সত্য-মিথ্যা ভাবার আগে চিন্তা করেন। কোন কথাটা কীভাবে বললে জনগণের লাভ হবে। এখানেও তাই হয়েছে। যুক্তরাজ্যে এটা বড়োদিনের মৌসুম। কিছুদিন পর দেশময় মানুষ প্লেন-বাসে যাত্রা করে তাদের প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হবে। এটা ভাইরাস ছড়ানোর খুব ভালো সময়। এর আগে গত ক'মাসে যতবারই কোনো উৎসব হয়েছে, তার পরপরই ভাইরাস ছড়ানোর একটা উঠতি দেখা গেছে। বড়োদিন উপলক্ষেও সেরকমটাই আশা করা উচিত। এর ওপর যদি আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো করোনা নতুন ভয়াবহ কোনো চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়, তাহলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে যাবে। কাজেই অত প্রমাণ-টমাণের অপেক্ষা করার দরকার নেই। এই যে নতুন চেহারার ভাইরাসকে নিয়ে একটু সন্দেহ হচ্ছে, সেই সন্দেহটাকেই আমরা সিরিয়াসলি নেওয়া শুরু করি। পরে যেন প্রমাণের অপেক্ষায় বসে থাকার জন্য আবার প্রমাদ গুনতে না হয়।

আমার ব্যক্তিগত মতামত– এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্তৃপক্ষ খুব একটা ভুল করেননি। বাস্তবতা যাই হোক, প্রমাণপত্র আসতে যতদিনই লাগুক, সাবধানের তো মার নেই। কাজেই নতুন জাতের ভাইরাসের কথা শুনে মানুষ যদি ঘরে আরেকটু বেশি থাকে, তাহলে লাভ বই ক্ষতি নেই।

বাইশে ডিসেম্বর রাত এগারোটা দশ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের "নতুন" করোনাভাইরাস সম্পর্কে আমাদের গম্যি এটুকুই।
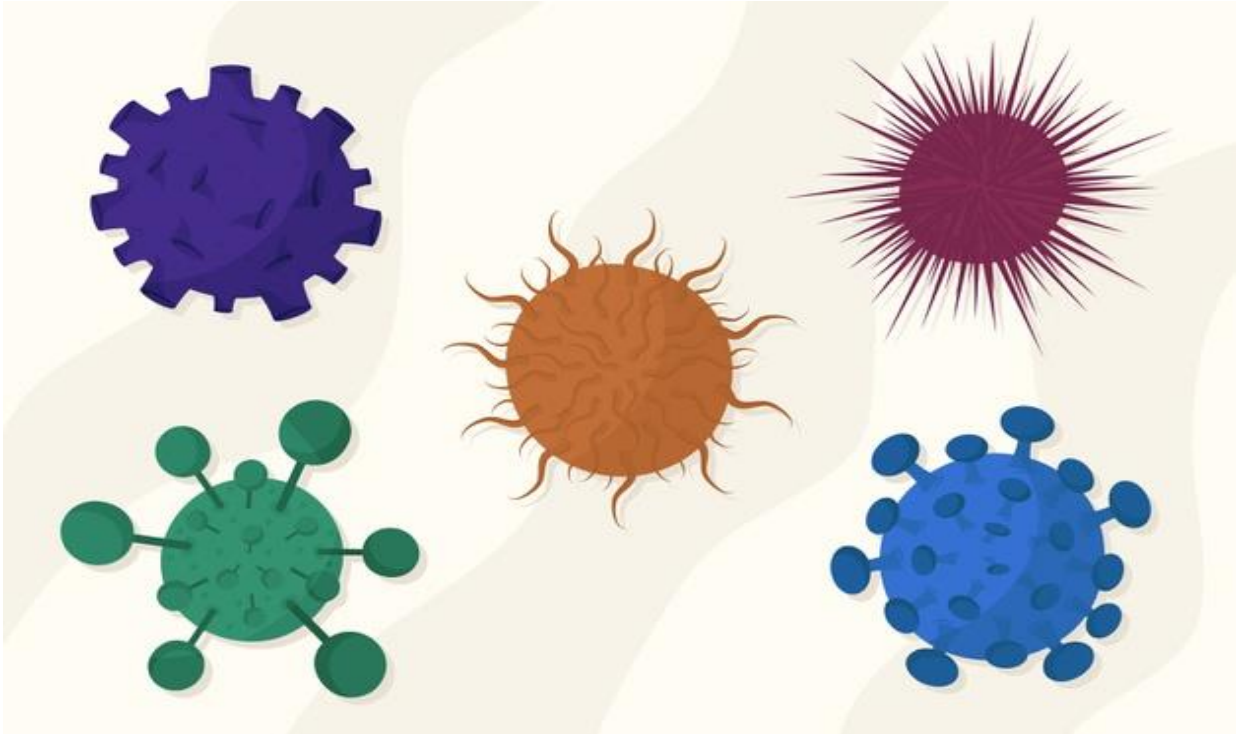
মেগাক্রায়োমিটিওর

এম হোসাইন

চমৎকার আবহাওয়া, পরিষ্কার আকাশ। ছুটির দিনে পরিবারের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন। হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখলেন আপনার বাসার পাশে ওপর থেকে কী যেন এসে পড়ল। সাথে বিকট একটা শব্দ। দ্রুত সবাই ছুটে গেলেন এর কাছে, দেখলেন ইয়া বড়ো এক বরফের টুকরো। সবাই অবাক! বয়স্করা একে নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা শুরু করলেন। লেখাপড়া জানা দুয়েকজন বলে বসলেন, "আসলে এগুলো প্লেন থেকে পড়েছে।" ইত্যাদি। আমরা এখন জানব এই অদ্ভুত জিনিসটা আসলে কী হতে পারে।

এর নাম মেগাক্রায়োমিটিওর (Megacryometeor)। এই বিদঘুটে নাম দিয়েছেন স্পেনের গ্রহ-ভূতত্ত্ববিদ Jesús Martínez-Frías। এদের ভর আধা কেজি থেকে কয়েকশ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ব্রাজিলে একবার ৫০ কেজি ভরের এবং স্কটল্যান্ডে ২ মিটার লম্বা মেগাক্রায়োমিটিওর পড়েছিল।

এগুলো কি বিমান থেকে লিক হওয়া পানি ঠান্ডা বায়ুস্তরে জমাট বেঁধে নিচে পড়েছে? এটা সবক্ষেত্রে নাও হতে পারে। কারণ বিমান থেকে এভাবে পানি ফেলে দেওয়া বা লিক হওয়া খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এছাড়া এগুলো কাউকে মেরে ফেললে বা সম্পত্তির ক্ষতি করলে, কারো ঘরবাড়ি ভেঙে ফেললে, ওই বিমানওয়ালারা আইনি ঝামেলায় পড়বেন। তবে অনেকে দাবি করেছেন বিমানের টয়লেটের পানি নাকি কোনো কারণে লিক হয়েছে। কেউবা এর সমর্থনে বরফের মধ্যে টয়লেট পরিষ্কার করার লিকুইডের অস্তিত্বও নাকি পেয়েছেন। কোথাও কোথাও এর রং দেখা গেছে নীলাভ। এতে মনে হয় যেগুলোকে মেগাক্রায়োমিটিওর বলে দাবি করা হয় এর অন্তত কিছু অংশের উৎস বিমান, তবে এগুলোকে সঙ্গত কারণেই মেগাক্রায়োমিটিওর বলব না। কেননা আসল মেগাক্রায়োমিটিওরগুলো বিমান থেকে আসেনি। এমন অনেক জায়গায় এসব বরফখণ্ড পড়েছে যেখানে ওই সময় বিমান চলাচল করেনি। আবার বিমান চালু হওয়ার আগেও এরকম বরফখণ্ড পড়ার ঘটনা ঘটেছে। তাহলে ওগুলো কোথা থেকে এলো?

এগুলো উল্কা নয় সেটা কীভাবে বোঝা গেল? উল্কা এরকম বরফ হলে অনেক আগেই বাষ্প হয়ে যাওয়ার কথা। এছাড়া এটি

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্রই বায়ুর ঘর্ষণে উবে যাওয়ার কথা। তবে একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা কিন্তু আছে। বরফের খণ্ড উল্কা আকারে সৌরজগতের অভ্যন্তরের কোনো গ্রহ বা বিশেষ করে উপগ্রহ থেকে আসতে পারে, ক্ষয় হয়ে গিয়ে কিছু অংশ পতিত হতে পারে পৃথিবীতে।

সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে ব্যাখ্যা তাতে চলে যাই। আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার ওপরে উঠে গেলে অতি ঠান্ডা বায়ুর অস্তিত্ব টের পাব। সমুদ্রপৃষ্ঠের ২০ কিলোমিটার ওপরে তাপমাত্রা শূন্যেরও ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে চলে যেতে পারে। তার মানে হচ্ছে, কয়েক কিলোমিটার ওপরে যেখানে তাপমাত্রা খুবই কম সেখান থেকে বিভিন্ন কারণে পানি জমে বড়ো আকারের বরফখণ্ডে পরিণত হয়ে মাটিতে এসে পড়তে পারে।

তথ্যসূত্র

ধূমকেতুর গল্প

1.The nature of comet, N.B Richter
2.মহাবিস্ময় ধূমকেতু : নাসরীন মুস্তাফা
3.আকাশ চেনো : অরূপরতন ভট্টাচার্য
4.Wikipedia

ধূমকেতুতে অবতরণ

1–DK The Astronomy Book: Big Ideas Simply Explained
2–DK Universe: The Definitive Visual Guide
3–মহাকাশের কথা, ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী
4–Wikipedia
5–https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Rosetta/ESA_s_sleeping_beauty_wakes_up_from_deep_space_hibernation

মহাবিশ্বের বয়স

https://www.space.com/24054-how-old-is-the-universe.html
https://wmap.gsfc.nasa.gov/universe/uni_age.html
https://www.loc.gov/everyday-mysteries/item/what-does-it-mean-when-they-say-the-universe-is-expanding/
https://skyandtelescope.org/astronomy-news/planck-best-map-yet-of-cosmic-creation/

অভিযাত্রা: জীবনের খোঁজে

1. জীবনের খোঁজে- https://exoplanets.nasa.gov/search-for-life/can-we-find-life/
2. তেজষ্ক্রিয় প্রাণ- https://astrobiology.nasa.gov/news/how-radioactivite-elements-may-make-planets-suitable-or-hostile-to-life/
3. https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(12)00327-2.pdf
4. https://www.scientificamerican.com/article/searching-for-life-on-other-planets/
5. কোন গ্রহে খুঁজব? - https://astronomy.com/magazine/2020/09/planets-and-life
6. জীবন যৌগের অন্য ভার্সন- https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-11/tiot-dio103119.php
7. Supercritical CO_2- https://www.mdpi.com/2075-1729/4/3/331

রেড শিফট

১) https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
২) https://www.space.com/25732-redshift-blueshift.html
৩) https://www.youtube.com/watch?v=FhfnqboacV0

মহাবিশ্বের শেষ তারাটি

https://rb.gy/pdczlg

https://rb.gy/6y89dh

https://rb.gy/3vsh4g

নক্ষত্রের জীবন

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Star_formation

2.http://abyss.uoregon.edu/~js/ast122/lectures/lec13.html

3.https://en.wikipedia.org/wiki/White_dwarf

4.https://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/science/neutron_stars.html

5.https://www.nasa.gov/vision/universe/starsgalaxies/black_hole_description.html

6.https://en.wikipedia.org/wiki/Chandrasekhar_limit

মানমন্দির

https://samakal.com/bangladesh/article/19062093
https://en.wikipedia.org/wiki/Observatory
https://en.wikipedia.org/wiki/Lowell_Observatory
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulkovo_Observatory
https://en.wikipedia.org/wiki/LIGO

পির, শিষ্য আর কোয়াসার

https://en.wikipedia.org/wiki/Quasar এবং তার রেফারেন্সসমূহ

কিউরিওসিটি মার্স রোভার

https://rb.gy/8dspyk

https://rb.gy/pc3unp

https://rb.gy/vrptyc

https://rb.gy/omuisn

এইচ-আর ডায়াগ্রাম

https://rb.gy/9blj9d

https://rb.gy/tgxf1e

https://rb.gy/m6wlg8

স্পেইস টেলিস্কোপ

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Observatory

https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-space-telescope-science-instruments

https://www.space.com/amp/6716-major-space-telescopes.html

https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/astronomy/index.html
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-history-timeline
https://fermi.gsfc.nasa.gov/
https://lco.global/spacebook/telescopes/space-telescopes/
https://history.amazingspace.org/resources/explorations/groundup/lesson/eras/space/page2.php

SpaceX
https://www.discovery.com/technology/Reusable-Rockets
https://www.theverge.com/platform/amp/2020/5/30/21269703/spacex-launch-crew-dragon-nasa-orbit-successful
https://www.theguardian.com/science/2020/may/30/spacex-nasa-crewed-spaceflight-launch-dragon-capsule-elon-musk-trump
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-astronauts-launch-from-america-in-historic-test-flight-of-spacex-crew-dragon
https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX
https://www.theverge.com/platform/amp/2020/8/2/21350663/nasa-spacex-crew-dragon-astronauts-bob-behnken-doug-hurley-splash-down

আরেসিবো টেলিস্কোপ: ভেঙে পড়া এক মহাজাগতিক স্বপ্ন
১. https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_Observatory
২. https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_Telescope
৩. https://www.prothomalo.com/amp/story/world/usa/%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AA
৪. https://www.nature.com/articles/d41586-020-03421-y

নিউট্রন স্টার
১. https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_star
২. নবম দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান বই, পৃষ্ঠা-১৩৩
৩. https://en.wikipedia.org/wiki/PSR_J1748%E2%88%922446ad
৪. https://www.nasa.gov/missions/deepspace/f_magnetars.html
৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_star
৬. https://www.researchgate.net/post/What-is-the-origin-of-the-magnetic-field-of-a-neutron-star

৭. https://www.space.com/1321-biggest-starquake.html
৮. https://www.nasa.gov/missions/deepspace/f_magnetars.html

৯. https://imagine.gsfc.nasa.gov/ask_astro/neutron_star.html
যেসকল ভিডিও থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে-
১. https://youtu.be/udFxKZRyQt4
২. https://youtu.be/fFeV8WxIZLk
৩. https://youtu.be/RrMvUL8HFlM

সমুদ্রের চেয়েও বেশি পানি আছে যে পাথরের মধ্যে

https://en.wikipedia.org/wiki/Enstatite_chondrite
https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aba1948

মৌলের নামকরণের গল্প

https://qz.com/585741/the-strange-rules-that-dictate-how-new-elements-get-their-names/ https://www.bbc.com/news/amp/magazine-35225788

রক্তদানে আত্নীয়দের নিষেধাজ্ঞা

https://rb.gy/fdsnha

জিন রিপ্রোগ্রামিং ও দেহঘড়ির প্রতিবিম্ব

1) https://www.nature.com/articles/d41586-020-03403-0
2) এপিজেনেটিক্স: কিছু সাম্প্রতিক ধারণা
bigganblog.org
3) "Gene reprogramming restores vision in mice"
The-scientist.com

বাবার সাথে কসমিক ডাস্ট

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cosmic_dust
ছবি- https://www.facebook.com/groups/bcb.science/permalink/3495555777194733/

ক্রপ সার্কেল

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Crop_circle
2.https://www.livescience.com/amp/26540-crop-circles.html
3.https://youtu.be/3pDmrWwPhpg

ছায়াপথের গল্প

1.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy

2.https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/S/spiral+galaxy

3.https://earthsky.org/space/what-are-elliptical-galaxies

4.https://en.wikipedia.org/wiki/Irregular_galaxy

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Lenticular_printin g

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_sequence

মৌল সৃষ্টির গল্প

NASA

Physics Today

Wikipedia

Space.com

Sciencelearn.org

Kurzgesagt

Royal Society of Chemistry

education.jlab.org

পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ-মুহম্মদ জাফর ইকবাল

গুপ্ত মহাবিশ্বের খোঁজে-আবদুল গাফফার

গল্প আর ইন্টারস্টেলার ভ্রমণ

১.https://youtu.be/JYW1GJrfB8w

২.https://youtu.be/EzZGPCyrpSU

৩.https://youtu.be/3zMUJwGrn6Q

৪.https://www.inverse.com/article/14246-5-big-questions-about-the-starshot-nanocraft-technology/